প্লাবন

শিশির পাবলিশিং [redacted]

২২।১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাত[redacted]

শিশিরকুমার মিত্র, বি, এ
২২।১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ
পাব্লিশিং হাউস হইতে
শিশির প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
হইতে মুদ্রিত।

আশ্বিন, ১৩৪৬.

ি সারাজীবন, অনাড়ম্বরে ও নীরবে

স্বদেশ ও সাহিত্যের পূজা করেন ;

আচারে, ব্যবহারে, যাঁহার কৃত্রিমতার

লেশমাত্র নাই, আমার অকৃত্রিম সুহৃদ

শ্রদ্ধেয়

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের

করকমলে এই গ্রন্থ অর্পণ করিলাম।

প্রীতিমুগ্ধ

গ্রন্থকার

ভূমিকা

এই উপন্যাসটি "বঙ্গশ্রী" পত্রিকায় ধারাবাহিক হইয়াছিল। এক্ষণে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম

বাংলা-ভবন
বালিগঞ্জ, কলিকাতা
আশ্বিন, ১৩৪৬

শ্রীবিজয়র[illegible]

প্লাবন

—◌—

প্রথম পরিচ্ছেদ

"আমি আর এখানে আসব না, ইন্দু।"

"কেন?"

"না।"

কলিকাতার উপকণ্ঠে, এক বৃহৎ অট্টালিকা-সংলগ্ন উদ্যান-পার্শ্বস্থিত লতামণ্ডপের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একটি যুবক ও একটি তরুণীতে উক্তরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল। অপরাহ্ন অবসানপ্রায়, সন্ধ্যা আসন্ন। উদ্যান-সজ্জাকরগণ আশেপাশে কাজ করিতেছে, কেহ বা বৃক্ষলতামূলে জল-সেচন করিতেছে, কেহ মাটীর কেয়ারী করিতেছে, কেহ পুষ্পস্তবক রচনায় ব্যাপৃত। যুবক যুবতী যেখানে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছে, সেখানে কেহ নাই। তরুণী গৃহস্বামীর কন্যা, যুবক সকলের পরিচিত এবং সর্ব্বজন আদৃত। তরুণীর নাম, ইন্দুপ্রভা; যুবক—সুবিমল।

ইন্দু কিয়ৎক্ষণ অবনতমুখে, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল; তারপর আস্তে আস্তে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আসবে না কেন?

সুবিমল বলিল, আমার ভাল লাগে না।

ইন্দু একটিবার মাত্র বিমলের মুখের পানে চাহিয়া চক্ষু নামাইয়া লইল। দিনের আলো যদি অস্পষ্ট না হইত এবং বিমল ইন্দুর মুখে দৃষ্টি ফেলিত, তাহা হইলে, তাহার কথাগুলি ইন্দুর প্রাণে বাজিয়াছে বুঝিতে পারিত। বিমল নিজের ঝোঁকে বলিতে লাগিল, চেষ্টা করতে কসুর করি-নি ইন্দু, কিন্তু কোথাও কোন পারছি না।

ইন্দু গাঢ়স্বরে প্রশ্ন করিল, কিন্তু আমাদের বাড়ী আসবে?

বিমল বলিল, কি করতে আসব? ভাল কাজকর্ম না পাব না; কাজকর্ম কবে জুটবে, জুটবে কিনা তা' জ এসে কি ক'রব বল?

এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিল; তারপর বলিল, তুমি এলে ভাল থাকি, আমার শরীর ও মন ভাল থাকে, তা তুমি জান!

—জানি।

—তবে?

বিমল বলিতে লাগিল, দেখ, শীগ্‌গির যদি কিছু হবার তা হ'লে আসিতে আমার কোন বাধা ছিল না; খুব কম।

ইন্দু কহিল, কিন্তু কোন-না-কোনদিন হবে ত! সক তোমারই বা না হবে কেন?

বিমল কথা বলিল না।

ইন্দু বলিল, সময় পালাচ্ছে না; আমিও পালাচ্ছি হোক্ না, তাতে ক্ষতি কি।

বিমল বলিল, কিন্তু তোমার বাপ-মা কি অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্যে চুপ ক'রে ব'সে থাকবেন?

না থেকে কি করবেন?

বিমল জবাব দিল না।

ইন্দু দৃঢ়স্বরে আবার বলিল, না থেকে কি করবেন? আর বিয়ে দিতে ত পারবেন না।

বিমল গভীর কণ্ঠে কহিল, তুমিই বা কত দিন হতভাগার আশায় বসে থাকবে ইন্দু?

ইন্দু হাসিল; বলিল, ব'সেই যে ঠিক থাকব, তা নয়; যেমন আছি তেমনই থাকব। কখনও ব'সব, কখনও দাঁড়াব, কখনও বা [illegible] রকম আর কি?

—কিন্তু কত কাল?

—তা কেমন ক'রে বলব? হয় ত জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত।

অন্ধকার ধরিত্রীকে গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। বিমল ইন্দুর মুখখানি দেখিবার চেষ্টা করিল। মুখ দেখিতে পাইল, কিন্তু মুখের রেখা পাঠ করিতে পারিল না।

এই মাত্র ইন্দু যে কথাগুলি কহিল, সেগুলি নূতন কথা নহে। এরূপ কথা আগেও হইয়াছে, আগেও সে বলিয়াছে, এ দেহে, এ জীবনে ই ভালবাসিয়াছি, তোমাকেই ভালবাসিব! তোমার আশাতেই রাখিব। তবু, আজ একটু বিভিন্নতা আছে। আগে যাহাকে গুলি সে বলিত, শুনিতে শুনিতে সে তন্ময় হইয়া যাইত, পাগল ঠত; আজ তাহাকেই এই কথা সে বলিল বটে, কিন্তু তাহার

কোনরূপ ভাব-প্রবণতা দেখা গেল না। যেন অতি সহজ, অতি সাধারণ, বিশেষত্ববর্জ্জিত কথা। এই তারতম্য তরুণী লক্ষ্য করিল এবং তাহার ভিতরটা যেন ফুঁপাইয়া উঠিল। ক্ষণকাল পরে বলিল, তুমি উপরে যাবে ত ?

—না।

—সে কি ? মা'র সঙ্গে দেখা করবে না ?

—না।

ইন্দু বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে অন্ধকারে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, মা কিন্তু কি মনে করবেন ?

বিমল দুঃখের সহিত বলিল, নিত্য যা মনে করেন, তাই মনে করবেন।

একটু থামিয়া, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পূর্ব্বের মতই হতাশাম্লান কণ্ঠে কহিল, অপদার্থ লোককে যা মনে করা যায়, তাই মনে করবেন।

ইন্দুর মনটিও হতাশায় ভরিয়া গেল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, কিন্তু দেখা না করলে মা কি সব ভাববেন। বসতে না পার না-ই বসলে, একটিবার দেখা ক'রে যাবে চল !

বিমল বলিল, বলছ চল ; কিন্তু তাঁর সামনে গেলেই আমি যে কত বড় অপদার্থ, তা এত বেশী ক'রে মনে পড়ে যে যেতে ইচ্ছে হয় না।

—তবে থাক্। কিন্তু বল, পরে, মাঝে মাঝে আসবে ?

—তোমার মা'র সঙ্গে দেখা করতে সাহস হবে না, তা সত্ত্বেও তোমাদের এখানে আসা কি উচিত হবে ?

ইন্দু নীরব।

—আমার মনে হয়, না আসাই ঠিক।

ইন্দু নীরব।

—কি বল, তাই ঠিক নয় কি ?

এবার ইন্দু কথা কহিল ; বলিল, তাই ঠিক।

বলিতে বলিতেই তাহার গলা ধরিয়া আসিল। বাষ্পোচ্ছ্বাস তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া ফেলিতেছিল। অতি কষ্টে আবার বলিল, তা হ'লে তোমায় আর দেখতে পাব না ?—অন্ধকার তাই দেখা গেল না, নহিলে বড় বড় মুক্তাসম অশ্রুবিন্দুগুলি বিমল দেখিতে পাইত।

বিমল বলিল, আপাততঃ তাই। কিন্তু আর নয়, আমি যাই।

ইন্দু মুখ তুলিল ; প্রিয়তমকে দেখিতে চাহিল ; দেখিল। অন্ধকারে যতখানি দেখা যায় তাহা দেখিল, মন দিয়া আরও অনেকখানি দেখিয়া লইল। তারপর, মাটীতে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল ; পা দু'টিতে হাত দিয়া সেই হাত মাথায়, বুকে ঠেকাইল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, একটি কথা রাখবে ?

বিমল স্নেহস্নিগ্ধ স্বরে বলিল, নিশ্চয় রাখব, বল।

ইন্দু বলিল, আমাদের বাড়ীতে আসবে না বলছ, আমিও আসতে বলব না ; কিন্তু এই পথ দিয়ে একবার ক'রে যেতে পারবে কি ?

বিমল চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

ইন্দু বলিতেছিল, বিকেলের দিকে, যখন সময় পাবে, একবার ক'রে এই রাস্তাটা দিয়ে যেও।

বিমল খুব জোরে একটি নিশ্বাস ফেলিল।

ইন্দু মিনতিভরা কণ্ঠে বলিল, বল।

—আসব।

—আমি ঐ বারান্দায় ব'সে থাকব। একবার ক'রে দেখতে ত পাব। আমার পক্ষে সেই কি কম লাভ!

—তা' হ'লে যাই?

—এস।

বিমল 'যাই' বলিয়াও দাঁড়াইল। একটু যেন ভাবিল, তারপর বলিল, না।

ইন্দু সাগ্রহে জিজ্ঞাসিল, 'না' কি?

বিমল কহিল, শুনে কাজ নেই, ইন্দু।

ইন্দু আর আগ্রহ দেখাইল না, যদিও কথাটা জানিবার জন্য তাহার দেহ অধীর আগ্রহে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। হায়, এই বিদায়ের করুণক্ষণে সেই অব্যক্ত কথাটি জানিবার আগ্রহ কি কম? কে জানে, এই বিদায়—কত দিনের জন্য, কত কালের জন্য বিদায়! কে জানে ইহাই চিরবিদায় কি-না! কথা কি, আজ জানা না হইলে, আর কোনও দিন জানিবার অবসর হইবে ত?

বিমল ম্লানকণ্ঠে বলিল, যাই ইন্দু।

ইন্দু নতমুখে বলিল, এসো।

বিমল চলিয়া গেল। যাইবার আগে, ইন্দুর ডান হাতখানি ধরিয়া বিদায় লইবার জন্য তাহার দেহ ও মন দুইই কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। প্রবল ইচ্ছা প্রবল সংযমের বলে দমন করিয়া লতামণ্ডপের পাশ দিয়া যে সরু পথটি ফটকের দিকে চলিয়া গিয়াছে, সেইটি ধরিয়া সে অগ্রসর হইল। ইন্দু সেইখানেই দাঁড়াইয়া ছিল। ফটকের সম্মুখীন হইতে যখন আর দেরী নাই, এক মিনিট পরে যখন আর তাহাকে দেখাও যাইবে না, তখন ক্ষিপ্রপদে অগ্রসর হইয়া আসিয়া ডাকিল, শোন।

বিমল দাঁড়াইল।

ইন্দু কাছে আসিয়া তাহার গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল; নতমুখে বলিল, আবার কবে দেখা হবে, কথা হবে, জানি না; যাবার সময়—কথাটা তাহার ঠোঁটে আসিয়া বাধিয়া গেল।

বিমল বুঝিল কিম্বা বুঝিল না—জানি না; নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ইন্দুর অভিমান গর্জ্জিয়া উঠিল। হায়, মানুষ কথা বুঝিতে পারে না কেন?

দরোয়ান, চাকর, মালী ফটকের আশে-পাশে অনেকেই আনাগোনা ও অবস্থিতি করিতেছে, এখানে এভাবে দাঁড়াইয়া থাকা নিরাপদও নয়, উচিতও নয়—বিমল মনে মনে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া, এদিক-ওদিক চাহিতেছিল।

ইন্দুরও সংযম কম নয়। ভাবপ্রবণতা দূর করিয়া, স্মিতমুখে বলিল, একটি কথা ব'লে যাও—তুমি আমার?

বিমলের অজ্ঞাতসারে তাহার বুকের ভিতর হইতে দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। বলিল, আমি তোমার!

ইন্দু একটি প্রশ্নের প্রত্যাশা করিতেছিল, কিন্তু বৃথা আশা; সে প্রশ্ন আসিল না। তখন সে নিজেই বলিল, আমি তোমারই।—বলিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

নীচের তল হল-ঘরে ইন্দুর মাতা বসিয়া ইন্দুর ছোট বোন ক্ষণপ্রভাকে পিক্টোগ্রাফ শিখাইতেছিলেন। হলের মধ্য দিয়াই ইন্দু নিজের ঘরে ঢুকিয়া সশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

মা ত অবাক্। মেয়েটির মেজাজের অন্ত তিনি কোনও দিনই পাইতেন

না বটে ; কিন্তু আজ আবার নূতন করিয়া কি হইল ভাবিয়া সারা হইতে লাগিলেন।

ক্ষণপ্রভা নিতান্ত ছেলেমানুষটি নয় ; আট পার হইয়া ন'এ পড়িয়াছে ; বোধশক্তিও জন্মিয়াছে। সুবিমলকে আসিতে এবং বাগানে দিদির সঙ্গে কথা বলিতে দেখিয়াছিল। ঐ দুইয়ের সহিত কোন-না-কোন সম্পর্ক আছে স্থির করিয়া লইয়া গভীরভাবে বলিল, বিমলদা' এসেছিলেন।

মা'র মুখ গম্ভীর হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কলিকাতার যে অংশের সঙ্গে সর্ব্বজীবে সুমদয়াসম্পন্ন ভগবানের আলো এবং বাতাসের বিশেষ বিরোধ, সেই অংশে পাশাপাশি দুইটি বাড়ীর পরিজনদিগের মধ্যে এক সময়ে অন্তরঙ্গতা এতই গভীর ও নিবিড় হইয়া উঠিয়াছিল যে, বহিরঙ্গ ব্যক্তিরা দুই পরিবারকে একান্নভুক্ত বলিয়া মনে করিতেও দ্বিধা করিত না। উভয়েই কায়স্থ ; মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক। দুই বাড়ীর ছেলেমেয়েরা এক সঙ্গে এ-বাড়ীতে একদিন, ও-বাড়ীতে একদিন খাইত, এক সঙ্গে খেলিত ; এক সঙ্গে বিদেশে হাওয়া খাইতেও যাইত।

হেরম্ববাবু শেয়ার-মার্কেটে দালালী করেন। তাঁহার পুত্র কন্যা অনেক-গুলি ছিল। যমরাজ একটির পর একটি সরাইয়া মাত্র কন্যা দুটিকে রাখিয়াছেন,—ইন্দুপ্রভা ও ক্ষণপ্রভা।

নিশানাথ দেওয়ানী আদালতের সেরেস্তাদার। তাঁহার একমাত্র

পুত্র, সুবিমল। নিশানাথ যা রোজগার করিতেন, খরচ করিতেন তার চেয়ে অনেক বেশী। বেশী রোজগারের অনেক পথ—বিশেষ করিয়া আদালতে - মুক্ত থাকিলেও অধিক রোজগারের দিকে তাঁহার মন বা দৃষ্টি ছিল না; কিন্তু বেশী খরচের যত কম পথ আছে, সে সকলে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল।

উভয়ে বন্ধু। সাংসারিক ব্যাপারে উভয়ে উভয়ের মত অমতে শ্রদ্ধাশীল। দু'জনে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা দিতে হইবে। ছেলেরা উচ্চ শিক্ষা ত পায়ই, মেয়েরাও যাহাতে বঞ্চিত না হয়, তাহা করিতে হইবে। বাড়ীর গৃহিণীদের অমত কর্ত্তাদের মতের স্রোতের বেগে ভাসিয়া গেল।

নিশানাথের পুত্র সুবিমল যখন হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম হইয়া পাস করিয়া প্রেসিডেন্সীতে ভর্ত্তি হইল, হেরম্ব-দুহিতা ইন্দুপ্রভা সেই সময় বেণীতে লাল ফিতা ঝুলাইয়া ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের গাড়ী চড়িয়া স্কুলে যাওয়া সুরু করিল।

অপরাহ্নে একজন আসিয়া কলেজের গল্প, প্রোফেসারদের গল্প, সহপাঠীদের গল্প বলিত, অপরে স্কুলের কথা, লেডীস পার্কের খেলনাসমূহের কথা, দিদিমণিদের কথা বলিয়া আসর জমাইত। তারপর এমন সময় আসিল, যখন ঐ দুই ব্যক্তির নিকট কলেজ স্কুলের কথা, প্রোফেসার দিদিমণিদের কথা অরুচিকর হইয়া পড়িল। তখন তাহারা অধীত পুস্তকের গল্পে, দৃষ্ট ও শ্রুত সিনেমা-বায়স্কোপের গল্পে মন দিয়াছিল। তারও পরে চন্দ্রশেখরের প্রতাপ ও শৈবলিনীর কথা, রোমিও জুলিয়েটের কথা, হ্যাম্‌লেটের ওথেলিয়ার কথায় আনন্দ পাইতে লাগিল।

হেরম্ববাবু নিশানাথ ও পাড়ার আরও কয়েকজন ভদ্রলোককে লইয়া পাশা খেলিতে বসিয়াছেন, হেরম্ববাবুর বাড়ীর দ্বিতলের বারান্দায় বসিয়া বিমল হ্যামলেটের গল্প শেষ করিয়া রাজা ও রাণীর গল্প সুরু করিয়াছে। ইন্দুর মার হাতে কোন কাজকর্ম্ম না থাকায় পাশের ঘরটায় বসিয়া তিনি কি একটা বই, বোধ হয় রামায়ণ, পড়িতেছিলেন, মাঝে মাঝে উৎকর্ণ হইয়া ইহাদের গল্পও শুনিতেছিলেন। বিমল সংক্ষেপে রাজা ও রাণীর গল্প শেষ করিল। ইলার দুঃখের কথায় ইন্দুর চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল। সুমিত্রা কুমারসেনের ছিন্ন মুণ্ড আনিতেছে শুনিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল। বিমল তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। ইন্দু বলিল, মাগো ইলার কি দুঃখ!

সেই রাত্রে হেরম্বজায়া হেরম্বকে জানাইলেন, যা হইয়াছে তা হইয়াছে আর লেখাপড়া করিবার দরকার তাঁহার কন্যার নাই।

হেরম্ব হাসিয়া বলিলেন, তা কি হয়? আমি কথা দিয়েছি।

—ভারি ত কথা, তা'র আবার দেওয়া!

—কথাই সব। যা'র কথার ঠিক নেই সে মানুষ নয়।

গৃহিণী বলিলেন, কিন্তু মেয়ে ত বড় হচ্ছে, সকলের সঙ্গে মেশা কি ভাল?

হেরম্ব চট্ করিয়া কহিলেন, সেটা অবশ্য ভাল নয়। কার সঙ্গে মেশে? বন্ধ করে দিলেই ত পার।

—তা কি পারি! তোমার বন্ধুর ছেলে যে! তারপর তুমি যদি বলে বস, আমি কথা দিয়েছি, তখন আমার মুখটি কোথায় থাকবে?

—ওঃ, বিমল! হ্যাঁ! বিমল কি সকলের মধ্যে নাকি! হ্যাঁ!

—কিন্তু বিমল পুরুষ, আর তোমার মেয়ে, মেয়ে।

হেরম্ব দৃঢ়স্বরে বলিলেন, নিশ্চয়ই। তা'তে সন্দেহ কি!—বলিয়া নিজের মনে হাসিতে লাগিলেন।

গৃহিণী বলিলেন, ছেলেমেয়ের বয়স হ'লে বাপ মাকে সাবধান হতে হয়!

হেরম্ব পূর্ব্ববৎ বলিলেন, নিশ্চয়; তাতে সন্দেহ আছে!

তাহ'লে বিমলকে একটু সাবধান করে দিও, বুঝলে?

—আরে রামঃ, সে যে বিমল! বড় ভাল ছেলে, তা'কে সাবধান ক'রে দিতে হবে না।

—কেন, এও তোমার কথা দেওয়া আছে না কি?

—দেওয়া নেই বটে, দিলে মন্দ হয় না।

গৃহিণী নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। আদালতের পেস্কার তাঁহার বেয়াই হইবে ইহা কল্পনা করিতেও লজ্জা হয়।

বিমলকে সাবধান করা হইল না। তাহার ফল ফলিতে সুরু করিল। সে কথা পরে বলিতেছি।

শেয়ারের বাজারে গোটাকত বড় দাঁও মারিয়া হেরম্ব লক্ষপতি হইলেন। ভাড়াটে বাড়ী ত্যাগ করিয়া ভবানীপুরে নতুন পাড়ায় প্রকাণ্ড অট্টালিকা প্রস্তুত করিলেন ও সপরিবারে তথায় উঠিয়া গেলেন। নিশানাথ ভাড়া বাড়ীতেই রহিয়া গেলেন। রবিবারে রবিবারে বন্ধুর বাড়ীতে পাশা খেলিতে যান। তিনি সপ্তাহান্তে একটিবার যান বটে, তাঁহার পুত্রটি নিত্য নিয়মিত যাওয়া আসা করে।

[illegible] তিনি আজও দেখা করিয়াছে। বিমল [illegible], পাশার আড্ডা।

।লিয়া তাহাকে গিলাইয়া খাওয়াইয়া দিয়াছে। দিন রাত তাহার পরি-
।মের অন্ত ছিল না। ইন্দু প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া তাহার শ্রম সার্থক
।রিয়াছে, মুখ রাখিয়াছে। পাশের খবর বাহির হইবার কয়েকদিন পরেই
ন্দুর বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে আরম্ভ করিল। পাত্রপক্ষ দেখিতে আসিবার
ন ধার্য্য করিয়া খবর দিতেই ইন্দু মা'কে বলিল, সে বিবাহ করিবে না।

অনেক বাদানুবাদের পরও মেয়ের যে গোঁ বজায় রহিল, তাহা এই
ন্য যে. মনে মনে সে বিমলকে বিবাহ করিয়াছে। বিবাহ যখন একবারই
য়, তখন সেই বিবাহই প্রথম ও শেষ বিবাহ।

কথাটা সালঙ্কারে হেরম্বের কানে উঠিল। ইহা যে তাঁহারই ...মৃষ্য-
।রিতার ফল, তাহাও পুনঃ পুনঃ শুনিতে হইল। কিন্তু এই অদ্ভুত
।াকটি বলিলেন, তা মন্দ কি!

গৃহিণী অনর্থ করিতে লাগিলেন। মেয়ে ও মেয়ের পিতা নীরব।

যখন কিছুতেই কিছু হইল না, তখন গৃহিণী নিজের হাতে সকল ভার
।লিয়া লইলেন। বিমলকে অপরিসীম স্নেহ বিজ্ঞাপিত করিয়া যত আশী-
।াদ করিলেন, তত বক্তৃতা দিলেন। মোদ্দা কথা এই দাঁড়াইয়া রহিল,
দ যদি ন্যূন পক্ষে দুই তিন শত টাকা বেতনের একটি চাকরী সংগ্রহ
।রিতে পারে, ইন্দু-লাভ তাহার পক্ষে সুলভ হইতে পারে।

তাহার পর এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। দুই তিন শত টাকার চাকরী
। দূরের কথা, বিমল একটা চল্লিশ টাকার চাকরীও জোগাড় করিতে
।ারে নাই।

... আখ্যায়িকার আরম্ভ এইখানে।

—ওঃ, বি...র কথা বলিয়া আমরা ...লের মধ্যে ...র পরী...

লইতে বসিব না। আর তাহার কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়াও আমরা মনে করি না। বাঙ্গালার কোন্ গৃহস্থের ঘর বেকারভারে ভারী নয়? অন্ন-সমস্যা জটিল নয় কোন্ গৃহস্থের সংসারে?

সুবিমলের পিতা আশা করিয়াছিলেন, জজ সাহেবদের ধরিয়া কাঁদিয়া ছেলেটিকে আদালতের কোন দপ্তরে ঢুকাইয়া লইবেন। কিন্তু পুত্রটি বৃত্তির পর বৃত্তি পাইয়া, একরকম বিনা খরচেই যখন উচ্চতর পরীক্ষা-বৈতরণী পার হইয়া যাইতে লাগিল, তখন আর তাহাকে আদালতের ঐ কাজে ঢুকাইতে মন সরিল না। বন্ধুবান্ধবও নিষেধ করিয়াছিলেন। সকলেই বলিয়াছিলেন, বিমলের জন্য ভাবিতে হইবে না; বিশ্ববিদ্যালয়ই উহার জন্য ভাবিতেছেন। তিনিই উহার উপায় করিবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চিন্তাশক্তির কোন সংবাদ আমরা জানি না; বিমলের জন্য তিনি চিন্তা করিয়াছেন কিনা তাহাও আমাদের জানা নাই; তবে উপায় যে কিছু করেন নাই তাহা ত প্রত্যক্ষই করিতেছি। বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়িগণের নিষেধ সত্ত্বেও বৃদ্ধ নিশানাথকে পুত্রের জন্য যথেষ্ট চিন্তা করিতে হইল এবং হঠাৎ একদিন পরলোকের আহ্বানে চিন্তাসূত্রটি ছিন্ন হইয়া গেল।

শ্রাদ্ধের দিনে পিতৃবন্ধু হেরম্বনাথ মুণ্ডিতমস্তক বিমলকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া আবেগভরে বলিয়াছিলেন, কিছু ভয় নেই বাবা, আমি আছি।

তিনি ছিলেন এবং আছেন ইহা সত্য; ভগবান করুন, তিনি সুদীর্ঘকাল থাকুন। কিন্তু তিনি যে আছেন, বিমলের জীবনে এই অনুভূতির কোন সুযোগ তিনি আজও দেন নাই। শেয়ার-মার্কেট, পাশার আড্ডা,

গার্ডেন-পার্টি, যাত্রার আসর, এই সকল বন্ধনের দৈবাৎ কোনও ফাঁকে যদি কোন দিন সুবিমলের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিত, মামুলী প্রশ্ন ছাড়া কোনও কথাই উঠিত না। প্রশ্ন এতই মামুলী, উত্তরও এত পুরাতন যে তাহার উল্লেখ করিতেও ইচ্ছা হয় না।

বিমল যখন শুষ্কমুখে বলে, কোথাও কোন সুবিধা হয় নাই, তখন অধিক শুষ্কমুখে একটি 'তাইত' বলিয়া গভীর চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়িতে হেরম্বনাথের যেমন বাধে না, পাঁচ মিনিট পরে 'কচে বারো'র রবে বৈঠকখানা বিদীর্ণ করিতেও দ্বিধা জাগে না। তাঁহার নিকট কোনরূপ আশা করা সুবিমল সযত্নে পরিহার করিয়াছে। আশা যে একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহা নহে। একটি বিষয়ে তিনি ইহাদের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন, পরেও করিবেন এরূপ ভরসা করা যায়।

গৃহিণীর মাসতুতো বোন্ বেড়াইতে আসিয়া ইন্দুকে দেখিয়া চোখ কপালে তুলিলেন। তাঁহার একটি অল্পবয়সে-বিপত্নীক হাকিম দেবরের হাতে অবিলম্বে কন্যাদান করিয়া মোক্ষলাভের সহজ ও সরল পন্থা বাৎলাইয়া দিয়া গেলেন।

সে রাত্রে হেরম্বনাথের বিনিদ্র কাটিল। হেরম্বনাথ কোন যুক্তিতর্কের ধার ধারেন না, তাঁহার সেই এক কথা, "আহা, কথা দেওয়া হইয়া গিয়াছে যে!" কাহাকে কথা দেওয়া হইয়াছে, কি কথা, কে দিয়াছে, কোন প্রশ্নের সদুত্তর দিতে তিনি অক্ষম হইলেও কথা যে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার তিলমাত্র সন্দেহ নাই।

ভোরের দিকে গৃহিণী বলিলেন, তোমার 'কথা'র নিকুচি করেছে,

আমি কালই আবুদির হাকিম-দেবরকে দেখে, আশীর্ব্বাদ করে আসব, তবে ছাড়ব।

হেরম্বনাথ মনে মনে অত্যন্ত শঙ্কিত রহিলেন। তাঁহার ক্ষ্যাপা, অবুঝ পাগল মেয়েটার জন্যই ভয়! মেয়েটা কি কম পাগল? সুবিমল জামাই হইবে, কিন্তু একটি রৌপ্যমুদ্রা পর্য্যন্ত যৌতুক দিতে পারা যাইবে না, এই অঙ্গীকার ইন্দু করাইয়া লইয়াছে। পাগলামী ছাড়া আর কি! পাঁচটা নয়, সাতটা নয়, ঐ দু'টি কন্যা, দুই জামাতাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা! তিনি ত তাহাদিগকে দাসত্বের শৃঙ্খল হইতে চিরমুক্তি দিতে পারিতেন, কিন্তু মেয়ের ধনুর্ভঙ্গ পণ! তাঁহারও মুস্কিল, কথা যখন দেওয়া হইয়া গিয়াছে, তখন আর কি হইবে।

কিন্তু দোষটা কাহার? গৃহিণী যদি ইন্দুকে শুনাইয়া শুনাইয়া সুবিমলের অর্থহীনতা ও অক্ষমতার কথা রূঢ়ভাষায় প্রচার না করিতেন, তাহা হইলে ইন্দুরও এত জেদ বাড়িত না, তাঁহাকেও এমন একটা কঠিন পণে আবদ্ধ হইতে হইত না। এম-এ পাশ করিয়াছে, একদিন না একদিন তাহার পুরস্কার পাইবই—লেখাপড়া কি আর বিফলে যায়? গৃহিণী ত তাহা বুঝিলেন না, বলিয়া বসিলেন, একটি পয়সা রোজগারের যার মুরোদ নেই, বিয়ে করবার আস্পর্দ্ধা তার হয় কেন? ইন্দু প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, বিমল যতদিন উপার্জ্জনক্ষম না হইবে, তাহাদের বিবাহ স্থগিত থাকিবে। যদি এ-জীবনে সে শুভদিন না'ও আসে, ইন্দু পরজীবন পর্য্যন্ত তাহারই প্রতীক্ষায় থাকিবে।

গৃহিণীর গন্তব্য স্থান ও সময়ের কথা সকালেই বিঘোষিত হইল;

গমনের উদ্দেশ্যও অপ্রকাশ রহিল না। শুনিয়া নিজের ঘরে ইন্দু, বাহিরের ঘরে ইন্দুর পিতা প্রমাদ গণিলেন।

ইন্দু বাহিরের ঘরে আসিতেই পিতা সস্নেহে বলিলেন, কিছু ভয় নেই মা, আমি আছি।

আমি আছি-তে ইন্দুর আস্থা কমিয়া গিয়াছিল। বলিল, মা'কে যদি তুমি না থামাও বাবা, আমি আত্মহত্যা করে বাঁচব।

হেরম্বনাথ হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন, সেই এক কথা বলিলেন, আমি আছি মা, আমি আছি।

কন্যা অশ্রুপূরিত নেত্রে চলিয়া গেল। হেরম্বনাথ অন্তঃপুরে আসিয়া ভৃত্যকে বিদেশযাত্রার আয়োজন করিতে আদেশ দিলেন। এক মুহূর্ত্তে জানাজানি হইয়া গেল, কর্ত্তা আজই অপরাহ্নের গাড়ীতে বিদেশ যাইতেছেন, সঙ্গে ইন্দু ও দুইজন ভৃত্য যাইবে।

গৃহিণী রন্ধনশালায় ঠাকুরকে দৈনিক কার্য্য বিষয়ে উপদেশাদি দিতেছিলেন, হুড়িতে পুড়িতে আসিয়া বলিলেন, আমি মলেই তুমি বাঁচ, না ?

হেরম্বনাথ বলিলেন, এই বুড় বয়সে ?

গৃহিণী বলিলেন, সারাজীবন আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ করলে, মেয়েটার গলায় দুঃখের বোঝা চাপিয়ে না দিলে হচ্ছে না, না ? একটা অথদো, অবদ্যো, হা-ভেতে ছোঁড়ার হাতে অমন সোনার প্রতিমা তুলে দিতে তুমি ছাড়া কোনও বাপ পারবে না। না, কোন বাপ না, কোন বাপ না, কোন বাপ না, আমি এই তিন সত্যি করে বলছি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, আক্কেল বুদ্ধির মাথা কি একেবারে খেয়ে বসে আছ ? বেশ ত নিজে তাস পাশা পাঁচালী নিয়ে ব্যোমভোলা হয়ে বসে আছ; থাক চুপ

করে—থাক, আমি ত মা, আমার ওপরই না হয় ভারটা দাও, দেখ আমি কি করতে পারি ! তা নয়, বাপ বেটীতে সল্লা করে—হেরম্বনাথ প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইলেন. গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, থাম থাম, আর নাক নেড়ে কথা বলতে হবে না। আমি যেন কিছু বুঝি নে, কচি খুকী আর কি ! বাপ বেটীতে সল্লা করে আমার উপর জেদ্‌ করে বিদেশ যাওয়া হচ্ছে ! যাও-না যাও, আমারও যেদিকে চক্ষু যায়, আমিও চলে যাই।

স্বর অনুনাসিক হইয়া আসিতেই হেরম্ব প্রমাদ গণিলেন। একেবারে গলিয়া গিয়া গৃহিণীর একখানা হাত ধরিয়া ফেলিলেন ও আদর করিয়া বলিলেন, ঐ তোমার কেমন দোষ লাবু ! একটুতেই বাড়াবাড়ি করে বস।

শেষ পর্য্যন্ত হেরম্বনাথের সেই মিনতিপূর্ণ স্বর—আমি যে কথা দিয়েছি।

—কাকে কথা দিয়েছ শুনি ?

ইন্দুর নামটা হেরম্বনাথ সহসা বলিতে পারিলেন না। বলিলেও ফল যে বিপরীত ঘটিবে তাহা তিনি জানিতেন।

গৃহিণী বলিলেন, আমি জানি তুমি কাউকে কথা দাও নি। তোমার কিছু করতে হবে না, তুমি চুপ করে বসে থাক, যা করবার আমি সব করছি।

দুর্ব্বল প্রকৃতির লোকের যা স্বভাব. এক্ষেত্রেও তাহাই হইল—হেরম্ব-নাথ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

পরদিন সুবিমল যথানিয়মে আসিলে গৃহিণী পরুষ কণ্ঠে কহিলেন. কাজকর্ম্ম একটা জোটাতে পারলে ?

সুবিমলের মুখ দিয়া শব্দ বাহির হইল না ; অভ্যাসমত মাথাটি নড়িল। গৃহিণী বলিলেন, পারবেও না কোনদিন।

ধরিত্রী যদি কথা শুনিতেন, আর সে যদি ডাকের মত ডাকিতে পারিত, তাহা হইলে সুবিমল এই মুহূর্ত্তে মাটিতে মিশিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত।

গৃহিণী আর একটি শব্দও উচ্চারণ করিলেন না। তাহার প্রয়োজনও ছিল না। আগের বলা সেই সামান্য কথা কয়টাই বেড়া আগুনের মত সুবিমলকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। গৃহিণী নিজের মনে রেশমের গলাবন্ধ বুনিতে লাগিলেন ; আর সামনে বসিয়া ধিক্কারের আগুনে সুবিমল বিদগ্ধ হইতে লাগিল। কিয়ৎ পরে, ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া সুবিমল চলিয়া গেল।

এ জীবনে আর কোনদিন এ গৃহের ছায়া মাড়াইতে সাহস তাহার হইবে না ইহাই সে জানিত ; কিন্তু রাত্রির অন্ধকার ভেদ করিয়া একখানি স্নিগ্ধ মুখ, ততোধিক স্নিগ্ধ দুইটি নয়নের কাতর আহ্বান সে উপেক্ষা করিতে পারিল না। কাল তাহার নিকট বিদায় লওয়া হয় নাই, সেই নির্দ্দোষ, নির্ম্মল, প্রেমে পবিত্র, স্নেহে সমৃদ্ধ হৃদয়রাণীর নিকট বিদায়—চিরবিদায় লইবার জন্যই আজ আবার সেই ভয়াবহ গৃহের চৌকাঠ মাড়াইয়াছিল। তাহার পর কি ঘটিয়াছে, পাঠক পাঠিকা তাহা দেখিয়াছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কোনও দিন যাহা ঘটে না, ঘটা একরকম অসম্ভব বলিয়াই সকলের ধারণা, সেদিন সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে তাহাই ঘটিল। তাস-পাশার আড্ডা, বন্ধু-বান্ধবের মজলিশ, সবের মায়া ও মোহ ত্যাগ করিয়া হেরম্বনাথ সন্ধ্যার পরেই গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। পরিচিত মোটরের পরিচিত হর্ণের শব্দে চকিত হইয়া গৃহিণী সেলাই ফেলিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার শঙ্কা হইয়াছিল, কর্ত্তা হয়ত অসুস্থ হইয়া এই অসময়ে গৃহে ফিরিলেন। রাত্রি দশটার পূর্ব্বে দুই একবার তিনি যে বিকালে উঠিয়াছেন তাহা অসুস্থ হইয়াই। আজও তাই মনে হইয়াছিল। তাঁহাকে সুস্থ শরীরে উপরে আসিতে দেখিয়া গৃহিণীর মুখে হাসি ফুটিল। ক্ষণপ্রভা কাজকর্ম্ম তুলিয়া রাখিয়া এক দৌড়ে নীচে নামিয়া গেল। ড্রাইভারের সঙ্গে ভাব করিয়া খানিকটা গাড়ী চড়িয়া বেড়াইয়া আসিবার ইচ্ছা। ইন্দু তখনও নিজের শয়ন-কক্ষে, দ্বার বন্ধ!

হেরম্বনাথ হল-ঘরের সোফায় গৃহিণীর পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন।

গৃহিণী বলিলেন, আজ পূবের সূর্য্য পশ্চিমে উঠল, না ইয়ার-বন্ধুরা বয়কট্ করলে, না তাস-পাশার দুর্ভিক্ষ হলো? আমার তো ভয়েই প্রাণ উড়ে গেছল; ভাবলুম, অসুখ-বিসুখ হয়ে ফিরলে নাকি! ব্যাপার কি বল দিকিন?

হেরম্বনাথের বয়সটা হঠাৎ যেন ত্রিশ বৎসর কমিয়া গেল; সোফাটা টানিয়া গৃহিণীর সোফার গায়ে লাগাইয়া, এক গাল হাসিয়া বলিলেন,

তোমার সঙ্গে গল্প করতে এলুম।—বলিয়া লাবুর বাম হাতখানি ধরিয়া ঈষৎ আকর্ষণ করিলেন।

হাতটি মুক্ত করিয়া লইয়া লাবু বলিলেন, ত্রিশ বছরের মধ্যে, একটি দিনও সে কাজ করবার ফুরসৎ হলো না, আজ হঠাৎ সেই কাজ করতে এসেছ, এই কথা আমি বিশ্বাস করছি আর কি!

—বিশ্বাস না কর ত আর কি করছি বল। কিন্তু সত্যি আজ সবাইকে আসতে বারণ করে দিয়ে এলুম।—বলিয়া প্রৌঢ়বয়স্ক হেরম্বনাথ যুবক-হেরম্বনাথ হইয়া দ্বিতীয় বার লাবুর কর ধারণ করিলেন।

কৈফিয়ৎটি তবুও গৃহিণীর মনঃপূত হয় নাই। না হইবারই কথা। যে লোককে কোনও কাজের কথা শুনাইতে হইলে, পাঁচ সাতদিন ধরিয়া অবসর খুঁজিতে হয়; যে লোকের কথা বলিবার অবকাশের নিদারুণ অভাব, সেই লোক গল্প করিতে অথবা গল্প শুনিতে বসিবে! গৃহিণী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে, আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তবে, কৈফিয়তে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট না হইলেও, খোস খবরের ঝুটাও ভাল হিসাবে মনটি যে প্রফুল্ল হয় নাই, এমন কথা বলা যায় না।

হেরম্বনাথ প্রেমিকের মত, জিজ্ঞাসা করিলেন, কি দেখছ?

দেখছি - বলিয়া গৃহিণী হাসিয়া ফেলিলেন। তারপর বলিলেন, কৈ, গল্প করছ না?

হেরম্বনাথ সাশ্চর্য্যে কহিলেন, বাঃ, গল্প আমি করব, না তুমি করবে? আমি ত শুনব।

গৃহিণী মৃদুমন্দ হাসিতে হাসিতে কহিলেন, তবে যে ঘরে ঢুকেই বলে গল্প করতে এলুম।

—তাই বললুম না কি! তবেই ত।

বেচারা সত্যই মুস্কিলে পড়িয়াছেন; গল্প করার অভ্যাস ত নাই-ই, কেমন করিয়া বলিতে হয় বা কেমন করিয়া শুনিতে হয়, সে সম্বন্ধেও এই ব্যক্তির কোনরূপ অভিজ্ঞতা ছিল না। ওয়েলিংটন জুট, বরাকর কোল্, হিমালয়ান্ রেল প্রভৃতির শেয়ার কিরূপ চড়-চড় উঠিতেছে ও তর তর নামিতেছে, সে বৃত্তান্ত কণ্ঠস্থ আছে; দাবার ছকে মন্ত্রিবরকে কি ভাবে সপ্তরথী পরিবৃত অভিমন্যু-বৎ বধ করা যায়, সে কৌশল সবিস্তারে বর্ণন করিবার শক্তিরও অভাব নাই। কিন্তু আর কোন গল্পের সহিত ভদ্রলোক এ জীবনে পরিচিত হইবার সুযোগ পান নাই। গৃহিণী তখনও তাঁহার পানে চাহিয়া মিটি-মিটি হাসিতেছিলেন, একটা কিছু না বলিলেও নয়। তাই চট করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, সোনার দামটা আবার চড়তে আরম্ভ করল—বুঝলে?

প্রাণপণ কষ্টে হাস্য গোপন করিয়া গৃহিণী বলিলেন, এখন কত হোল?

—প্রায় চৌত্রিশ! হবে না? জাহাজ ভরে ভরে সোনা বিলেত চলে গেল, দাম না চড়ে পারে?

গৃহিণী বলিলেন, সত্যই ত!

আবার সব চুপ। কর্ত্তা ঘড়িটার দিকে চাহিলেন, সাতটা বাজিতে দশ মিনিট; বোধ হয় দম ফুরাইয়া আসিয়াছে। পেণ্ডুলামটা বড় আস্তে আস্তে প্রাণহীনের মত দুলিতেছে। পাখার ব্লেডগুলায় ধূলা জমিয়াছে, চাকরগুলা করে কি? এঃ, কড়িকাঠে কুমীরকে পোকা বাসা বাঁধিয়াছে; নিজে না দেখিলে কিছু যদি হয়! হেরম্বনাথের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যখন এইরূপে দৃশ্যের পর দৃশ্য নিরীক্ষণ করিয়া, মনোমধ্যে ঘন ঘন চিন্তার

খোরাক যোগাইতেছিল, তখন অবরুদ্ধ হাস্যের চাপে তন্বী গৃহিণীর শরীরটা ফুলিয়া ফুলিয়া অবশেষে ফাটিয়া চৌচির হইবার উপক্রম করিতেছিল; শেষ পর্য্যন্ত হাসি আর চাপিতে পারিলেন না, বলিলেন, তারপর ?

হেরম্ব অপ্রতিভ হইয়া ঐ 'তারপর'টা উচ্চারণ করিয়া গৃহিণীর পানে চাহিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। পরমুহূর্ত্তেই ত্রুটী সারিয়া লইবার জন্য বলিলেন, দেখ, এবার হল-ঘরটা পেণ্ট করিয়ে নিতে হবে, কি বল ?

গৃহিণী তখনও হাসিতেছিলেন, বলিলেন, তারপর ?

হেরম্ব হাসিয়া বলিলেন, তারপর তুমি।

গৃহিণী পুনশ্চ কহিলেন, তারপর ?

—আবার তারপর ? তারপর আমি। মানে, তুমি আর আমি।

গৃহিণী বলিলেন, খুব গল্প করতে শিখেছ ত!—বলিয়া সোহাগভরে হেরম্বকে একটুখানি ঠেলিয়া দিলেন; গল্প করিতে জানেন না বলিয়া হেরম্বনাথ যে রসিকতার জবাব দিতেও অক্ষম তাহা নহে। ঢিলটি খাইয়া পাটকেলটি ফিরাইয়া দিতে একটি মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না। হঠাৎ মনে পড়িল, মেয়েরা কেহ কাছে-পিঠে নাই ত, চারিদিক দেখিতে দেখিতে বলিলেন, ইন্দু কোথা ? খনা ?

গৃহিণী বলিলেন, খনা ত এই ছিল, বোধ হয় গাড়ী পেয়ে বেড়াতে গেছে। তারপর, দক্ষিণ-পার্শ্বস্থ কক্ষটি দেখাইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, বড় রাণী বোধ হয় গোঁসা-ঘরে।

—কেন, কেন ? ইন্দু, ইন্দু!—বলিতে বলিতে তিনি রুদ্ধ কক্ষে

ঠেলা দিতেই দ্বার খুলিয়া গেল। কক্ষ অন্ধকার। হেরম্বনাথ ডাকিলেন, ইন্দু, কি করছিস্ রে ?

—শুয়ে আছি বাবা।

—অসময়ে শুয়ে কেন? উঠে আয়, উঠে আয়। আমি কোথায় তাস-টাস সব বারণ করে উপরে এলুম, তোদের সঙ্গে গল্প করব বলে! উঠে আয় মা, উঠে আয়।

—আসছি বাবা; তুমি বস।

পরমুহূর্ত্তে আলো জ্বলিয়া উঠিল এবং এক মিনিট পরে ধীর, মন্থর গমনে ইন্দু হল-ঘরে আসিয়া পিতার পার্শ্বের সেটি-টায় বসিল। মা'র পানে সে চাহে নাই; চাহিতে পারে নাই। মুখটি আড় করিয়াই ঘরের বাহির হইয়াছিল। এবং সেই ভাবেই আসিয়া বসিল।

হেরম্বনাথ কন্যার পিঠের উপর সস্নেহে হাত রাখিয়া, ব্যাকুল স্বরে প্রশ্ন করিলেন, শরীর ভাল আছে ত রে?

—আছে বলিয়া পার্শ্বের ক্ষুদ্র টেবিলের উপর হইতে একখানা ইংরাজী মাসিক পত্র তুলিয়া পাতা উল্টাইতে লাগিল। এক মিনিট; দুই মিনিট—এই রকম করিয়া সময় কাটিতে লাগিল, অথচ একটি কথাও নাই। গৃহিণী অন্যদিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন, ইন্দুর দৃষ্টি পুস্তকের পত্রে নিবদ্ধ, হেরম্বনাথ অবোধ শিশুর মত একবার কন্যার, আর একবার কন্যার জননীর পানে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছেন। বিস্ময়ের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছে।

ইন্দু মেয়েটির স্বভাবের স্বল্প পরিচয় দিতে হইতেছে। মেয়েটি বাচাল নয়, আবার ভিজা বিড়ালও নয়; কথা বলে না; তবে চুপ করিয়া বা গুম

হইয়া বসিয়া থাকিতেও পারে না। পিতামাতার সম্মুখে এমন ভাবে বসিয়া থাকিতে তাহাকে কখনও দেখা যায় নাই। একটা কিছু যে ঘটিয়াছে, অথবা মাতা ও দুহিতার মধ্যে মনান্তর ঘটিয়াছে, ইহা বুঝিতে, হেরম্বনাথের কিঞ্চিত বিলম্ব হইয়াছিল। সত্য কথা বলিতে কি, তাঁহার বিশেষ দোষও নাই। ইন্দু যে কাহারও উপর রাগ করিয়া মুখ গোমড়া করিতে পারে, ইহা তাহার পিতার একেবারেই অজ্ঞাত ও অপরিকল্পিত। কিন্তু যখন বুঝিলেন, সত্যই তাহাই, তখন ভদ্রলোকের ভিতরটা অস্বস্তিতে ভরিয়া গেল। ঘটনাটা কি ঘটিয়াছিল জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল জাগ্রত না হইল তাহা নহে, কিন্তু তাহা মুহূর্তের জন্য ; পরমুহূর্তেই তিনি তাহা বিস্মৃত হইলেন। প্রতীকারোপায়ও যেমন অজ্ঞাত, সামঞ্জস্যবিধানের পন্থাও তদ্রূপ অজ্ঞাত। তাঁহার কেবল মনে হইল, তাস-পাশাগুলা বাক্স করিয়া আসা উচিত হয় নাই। কেন যে বন্ধুবান্ধবকে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন ভাবিয়া মনস্তাপের সূচনা মাত্রেই মনে পড়িয়া গেল, ইন্দুর বিবাহ সম্পর্কে পরামর্শ করিবার জন্যই আজ আড্ডা স্থগিত রাখিয়া আসিয়াছেন। আসিয়া, এই বিভ্রাট!

দুহিতার সম্মুখে মাতা, অথবা মাতার সম্মুখে দুহিতা—আসল কথাটা যে কেহই বলিতে পারিবে না, কি করিয়া জানি না, এ বোধটুকু হেরম্বনাথের হঠাৎ জন্মিল। একজনকে সরাইতে না পারিলে কোন কথাই হওয়া সম্ভব নয়। হেরম্বনাথের মাথায় বুদ্ধি খেলিল ; গৃহিণীর দিকে চাহিয়া, বলিলেন, হ্যাঁগা, একটু চা খাব নাকি ?

গৃহিণী তাড়াতাড়ি আসন ত্যাগ করিতে করিতে বলিলেন—

খাবে? করতে বলি। আমি জানি তুমি 'মার্কেটে' চা খেয়েছ, তাই জিজ্ঞেস করিনি।

—'মার্কেটে' খেয়েছি বৈ কি। আর এক পেয়ালা হলে মন্দ হয় না।

—বেশ ত, মন্দ হবার দরকারই বা কি! ভালই হোক্। আমি চা করিয়ে আনছি, তার সঙ্গে আর কিছু খাবে?

—তা খেতে পারি।—বলিয়া হেরম্বনাথ হাসিলেন। গৃহিণী মনে মনে সবই বুঝিলেন। তবে তাঁহার মন নাকি দৃঢ়তায় পূর্ণ ছিল, তাঁহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও সন্দেহের তিলমাত্র অবকাশ ছিল না, তাই তিনি নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলেন।

হেরম্বনাথ বেশ করিয়া চারিদিকে দেখিয়া লইয়া ডাকিলেন, ইন্দু!

ইন্দু কাগজখানা বন্ধ করিল।

—কি হয়েছে বল্ ত মা?

নতমুখে ইন্দু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

হেরম্বনাথ বলিলেন, শীগ্গির বল্ মা, তোর মা হয় ত এখুনি এসে পড়বেন, আর আমার শোনা হবে না। কি হয়েছে বল্ ত?

—আমাদের বাড়ীতে আর আসবে না।

—আসবে না? কে আসবে না? বিমল? কেন, আসবে না …কেন? কে বললে আসবে না?

—আমায় বলে গেছে।

—বলে গেছে? আসবে না! তাই ত।

হেরম্বনাথের মনে হইল, সংসারের ঘটনাগুলা কেবলই জট্ পাকায়; তাস-পাশা ঢের সহজ সরল।

ইন্দু বলিল, মা এক রকম বারণই করে দিয়েছেন আসতে।

সমস্যা জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে তাহা অনুভব করিয়া হেরম্বনাথের মন কেবলই তাস-পাশার দিকে ছুটিতেছিল। পিতাকে নিরুত্তর দেখিয়া, ইন্দু অভিমানভরে কহিল, তার বড্ড লেগেছে বাবা।

—লাগবারই ত কথা।—বলিয়া ফেলিয়াই হেরম্বনাথ স্ব-প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, কিছু ভয় নেই মা, ও আমি ঠিক ক'রে দিচ্ছি। বিমল যে নিশানাথের ছেলে! আমার বাড়ী যে তারই বাড়ী।

কিন্তু বাবা, সে আর কোন দিন আসবে না।

—না, আসবে না! দেখ না, কালই আমি আনছি তাকে।

ইন্দু বলিল, না বাবা।

—না কি রে? নিশানাথের ছেলে! পাঠশালা থেকে বুড় বয়স পর্য্যন্ত নিশানাথ আর আমি—তোরা তার কি জানিস্? আজ নিশানাথ নেই, তার ছেলে আমার পর হয়ে যাবে! দূর পাগলী! আমি কালই ডেকে আনছি!

ইন্দু ধীর কণ্ঠে কহিল, না বাবা, তুমি ডাকতে পাবে না; আর সেও আসবে না।

হেরম্বনাথ রাগ করিয়া বলিলেন, আসব না বলবার যো কি! তার বাবা মরবার সময় আমার হাতেই না তাকে দিয়ে গেছে! আমার কথা ঠেলবে বিমল? পৃথিবী উল্টে যাবে রে, উল্টে যাবে।

ইন্দু বলিল, যতদিন কাজকর্ম্মের জোগাড় না হয়—

হেরম্বনাথ বলিলেন, চুলোয় যাক্ তার কাজকর্ম্ম! কালই আমি সব ব্যবস্থা করছি।

কন্যা সবিস্ময়ে পিতার মুখের দিকে চাহিল।

—তোর ও ছেলেমানুষী কথা আমি শুনব না, কিছুতেই না। নিশানাথ মরবার সময় ছেলেটাকে আমায় দিয়ে গেল, আমিও তাকে জামাই করব কথা দিলুম, আর একটা বছর কাটতে না কাটতে সব গোলমাল হয়ে যাবে! পাগল আর কি! কালই আমি পঁচিশ হাজার তার নামে ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে কাজ সুরু কর দিচ্ছি।

ইন্দুর বুক কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গেল; মুখচোখ বলিল, কিন্তু সে ত তোমার টাকা নেবে না দিয়েছ—

—তাইত! তা' আমি তাকে দান নিয়ে কাজ করুক, পরে শোধ বলিলেন, এ কিন্তু তোর বড় আমি যৌতুক দিতে পার কলেজের কোন বইয়ে

ইন্দু কথা বলিল মুখের প্রত্যেকটি নাই বুঝিয়া, বাড়ী যাচি

ই

সে

এ

— সে বলতে হবে না মা ; সে আমি ঠিক ক'রব কিন্তু আমি ভাবছিলুম কি, এই ফাগুনেই তোদের—

বাধা দিয়া ইন্দু বলিল, উপার্জ্জনক্ষম না হয়ে বিয়ে করা কি উচিত ?

জ্যাঠামশায়ের একটা ইন্সিওর ছিল, মা ছেলের তাই থেকে চলেছে কোন

সেটা ফুরুলে তারপর ?

কি বলিতেছিলেন, ইন্দু তার আগেই বলিল, মা

র্জ্জন না করলে বিয়ে করা উচিত নয়।

কথা। নাঃ—বিরক্তভাবে তিনি উঠিয়া

ড়িয়া পিতার পা'দুটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল,

তাড়াতাড়ি ক'রে—বলিতে বলিতে

টা শেষ করিল, তাহলে আমি

ন, সে হবে। কিন্তু

মা কিছুতেই

ইন্দু বলিল, আমার হাতে সংসারের সমস্ত ভার দাও বাবা, তাই নিয়ে আমি বেশ থাকব।

—আচ্ছা, না হয় তাই—বলিতে বলিতে অথবা ভাবিতে ভাবিতে হেরম্বনাথ নীচে নামিলেন এবং ক্ষণপ্রভাকে লইয়া মোটর সেই মাত্র গাড়ী বারান্দায় দাঁড়াইয়াছে দেখিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিয়া মহেন্দ্রবাবুর গৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন। মহেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে তাস-পাশা দাবা-সতরঞ্চের বারমাস রথদোল।

চা জলখাবার লইয়া গৃহিণী ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন—কর্ত্তা নাই। স্বামী বিবেকানন্দের জ্যোতিরুজ্জ্বল মূর্ত্তিখানির সম্মুখে দাঁড়াইয়া ইন্দু যেন সেই ত্রিদিবজয়ী সন্ন্যাসীর আনন-বিচ্ছুরিত তেজধারায় স্নান করিতেছিল। মাকে দেখিয়া তন্ময়ত্ব ঘুচিল; বলিল, বাবা ত নীচে গেলেন এই মাত্র!

—কৈ, নীচেও ত নেই!

ক্ষণপ্রভা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, বাবা মহেন্দ্রবাবুর বাড়ী চলে গেছেন।

মা হাসিলেন; মেয়েরাও হাসিল।

বোধ হয় মেঘ কাটিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নিশানাথের সহকর্ম্মী পশুপতি বাবু জজ-আদালতে সেরেস্তাদার। বিমল মধ্যে মধ্যে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিত। পশুপতি বাবু ভরসার কথা কোনও দিনই বলিতে পারেন নাই। একদিন হঠাৎ প্রফুল্লভাবে বলিলেন, আজই

তোমার কথা ভাবছিলুম, ভালই হয়েছে, এসে দাঁড়েছ। একটা টিউসনি করবে ?

টিউসনি শুনিয়া বিমল দমিয়া গেল। কিন্তু যাহা হউক একটা কিছু না করিলেও নয়। বলিল, করব।

পশুপতি বলিলেন, আমাদের জজ-সাহেবের মেয়েকে পড়াতে হবে। সাহেব আজই আমাকে বলছিলেন। বরিশালে ছিলেন, ক'বছর মেয়েটির লেখাপড়া ভাল হয় নি। এখন ভাল ক'রে পড়াতে চান। পঞ্চাশ টাকা দেবেন টিউটরকে। করবে ?

বিমল বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

পশুপতি বলিলেন, খুব ভাল কথা। তা' বেশ, তুমি কোথা থেকে একটু ঘুরে এস তিনটে নাগাদ এলেই হবে। আমি টিফিনের সময় সাহেবের চেয়ারে গিয়ে কথা পাকা ক'রে আসব

—যে আজ্ঞে, বলিয়া বিমল বাহির হইয়া গেল। কোথায় যাইবে! আদালতের হাতার মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। আদালতের ভিতর কি হয় সে তাহা দেখেও নাই, জানেও না, বাহিরে দেখিল যেন উৎসব ক্ষেত্র। চা-চপ-কাটলেটের দোকানে কি ভিড়! ময়রার দোকানেই বা কম কি! মুখ-কাটা ডাবের খোল পর্ব্বতের আকার ধারণ করিয়াছে। সোডা লেমনেডের দোকানের সম্মুখেও জনতা। সারি সারি কেরোসিন কাঠের বাক্স সাজাইয়া নানা বয়সের পান-ওয়ালী বসিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেককে ঘিরিয়া পাঁচ সাত জন লোক - শামলাপরা মোক্তার, তকমা-আঁটা পেয়াদা, টাইবাঁধা কোট পরা উকীল, ক্যাম্বিশের জুতা, ছিটের কোট গায়ে, চাদর গলায় মামলাবাজ। পানওয়ালী যেন হাকিম, এক হাতে পান

চুণ খয়ের দিতেছে, যেন র   লিখিতেছে, নথ নাড়িয়া ও অপাঙ্গে ভ্রুভঙ্গি করিয়া একটি একটি কথ বলিতেছে, যেন রায় দিতেছে, আর উকীল মোক্তার আমলা পেয়াদা আসামী ফরিয়াদী সেই রায় হাঁ করিয়া গিলিয়া খাইতেছে। দু একজন নব্য উকীলকেও এই হাকিমের এজলাসে সমাসীন দেখিয়া বিমল দ্রুতপদে সেস্থান ত্যাগ করিল।

বটবৃক্ষতলে দুই উকীলে বচসা লাগিয়া গিয়াছে। পরস্পরের অভিযোগ—একজন অপরের মক্কেল ভাঙাইয়া লইয়াছেন। অনেক বাকবিতণ্ডা-গালি গালাজের পর তাঁহাদের মধ্যে যদি বা আপোষ-নিষ্পত্তি হইল, মক্কেল পকেট দেখাইয়া মা-কালীর দিব্য করিয়া কহিল, আসছে দিনে বাবুদের পাওনাগণ্ডা নিশ্চয়ই মিটাইবে। মক্কেলের পকেট, কাছা, অবশেষে জুতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদারক করিয়া সহোদর-জ্ঞানে প্রিয়-সম্ভাষণে সম্ভাষিত করিয়া, দোকান হইতে ধারে দুইটি বিড়ি ক্রয় করি ধরাইয়া লইয়া নবাগত শিকারের লাগিলেন।

খুব শীঘ্রই তিনটা বাজিয়া গেল হইতেই, তিনি বলিলেন, এস এখনই কথা কইবেন।

কথায় খুব বেশী লই করিত, সেদিন শুনা নষ্ট হইয়া গিয় দিতে পারিবেই।

টিউটর পাওয়া যায়; তিনি সস্তার পক্ষপাতী হেন; পঞ্চাশ টাকার কম কোন ভদ্রলোককে বলা যায় না।

জজ-সাহেব বাঙ্গালী। কিন্তু বাঙ্গালীত্ব বড় কম। বাঙ্গলা কথা একটিও বলিলেন না। সিগারেট ধরাইবার সময় বিমলকেও অফার করিয়াছিলেন, খায় না শুনিয়া কৌটা পকেটে পুরিলেন: শেষকালে বলিলেন, আপনি সম্মত?

বিমল পশুপতি বাবুর পানে চাহিল। পশুপতিই বলিলেন, ইয়েস
'।

জ সন্ধ্যায় আসিতে বলিয়া জজ সাহেব কাগজ সই করিতে

বাহিরে আসিয়া পশুপতি সানন্দে কহিলেন, এতদিন পরে
লে চেয়েছেন বলতে হবে। জজ সাহেবকে যদি সন্তুষ্ট করতে
ার ভাবনা আর ভাবতে হবে না। কড়া জজ বলে মিঃ
াক গবর্ণমেণ্টের কাছে তেমনই প্রতিপত্তি। একখানি
ই সার্ভিস মারে কার সাধ্যি! তোমার বাবা
লেন বাবা, 'আমা হ'তে তোমার যে
 গেলুম বাবা। ভগবান করুন
নাথ দাদা যেন স্বর্গ থেকে
বা।

য় হইল। আজিকার
বে, তাহারই জ
রা জীবন কষ্টেই
স্ত কোন গতিকে

সংসারটি চলিত মাত্র ; অন্ধকারাচ্ছন্ন সারা জীবনের একমাত্র আশার প্রদীপটির পানে চাহিয়াই জীবন কাটিয়াছে। কিন্তু এমনই হতভাগ্য পুত্র সে, কোনদিনই প্রদীপে তৈল-সংযোগ করিতে পারে নাই। পিতার মৃত্যুর পর হইতে সংসার ক্রমেই অচল হইয়া আসিতেছিল। লেখাপড়া শিখিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিক্রির অধিকারী হইয়া কোথায় মাতার দুঃখের অবসান করিবে, তা নয়, হতাশার পীড়নে তাঁহাকে কেবলই পীড়ন করিয়া আসিতেছিল। দুটি প্রাণীর সংসার, পঞ্চাশ টাকায় একরূপ চলিয়া যাইবে, আপাততঃ ইহাই কি কম সান্ত্বনা! বিমলের মনে হইতেছিল, ট্রাম যথেষ্ট বেগে ছুটিতেছে না। কলিকাতা সহরের পথে পথে সহস্র সহস্র মোটর ছুটিতে দেখিয়া কোন দিন সে কিছু মনে করে নাই। অভাগার বুক ভাঙিয়া দিয়া, আজই প্রথম একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল।

জননীর পদতলে বসিয়া বিমল সংবাদ বিবৃত করিল ; মার দু'নয়নে জল আসিয়া পড়িল ; ছেলের চিবুক ধরিয়া মা আশীর্ব্বাদ করিলেন, ভগবান দুঃখিনীর বাছার উপর প্রসন্ন হইলে তিনি হাসিমুখে মরিতে পারেন।

শেষে বলিলেন, হ্যাঁ বাবা বিমু, তোর কাকাবাবুকে খবরটা দিবি নে ?

বিমল চুপ করিয়া রহিল।

মা বলিলেন, আমাকে যেমন খবরটি দিয়ে সুখী করলি, তাঁকেও তেমনই খবরটি দিয়ে আয় বাবা! তাঁরাও ত তোকে বড় কম ভালবাসেন না বাবা!

বিমল তথাপি নীরব। মা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, চুপ ক'রে রইলি কেন রে ? ঠাকুরপোদের বাড়ী যাস নে নাকি ? তাঁর যে বড় বন্ধু রে, তিনি যেতে না যেতে এক বছরের মধ্যে সম্পর্ক তুলে দিলি

বাবা।—মাতার চক্ষুদ্বয়ে জল টল টল করিতে লাগিল। বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন, শেষ দিনটিতেও বার বার করে ঠাকুরপোর কথাই বললেন। বললেন, আমি যাচ্ছি, হেরম্ব রইল। হেরম্ব বিমলকে দেখবে। দায়ে অদায়ে হেরম্বই বিমলের অভিভাবক রইল।—একটু থামিয়া তিনি আবার বলিলেন, তুইও ত যেতিস্ বাছা, কবে থেকে যাওয়া বন্ধ করলি? হ্যাঁরে বিমু, সত্যি করে বলবি, কাকাবাবু কাজ কর্ম্ম করে দেন নি বলে কাকাবাবুর ওপর অভিমান করেছিস বুঝি?

তবুও বিমল কথা বলিল না। মা পুনশ্চ বলিলেন, একটি কথা কোন-দিন মুখ ফুটে বলেন নি বটে, তবে ভাবে বুঝতুম, তাঁর বড্ড ইচ্ছে ছিল, ইন্দুকে বৌ ক'রে আনেন। সেই কালরাত্রির কথা তোর মনে আছে না? সেই যে আমার পানে চেয়ে বললেন, একটি সাধ পূর্ণ হোল না, আর বলতে পারলেন না, নিঃশ্বেসটি বেরিয়ে গেল, মনে আছে বাবা?

বিমল জননীর বুকের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া, বালকের মত কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, আছে মা।

আমার আজও মনে হয়, ঐ কথাটিই বলতে চেয়েছিলেন—তিনি আবার চক্ষু মুছিলেন। কিয়ৎপরে কহিলেন, 'কতদিন মনে করেছি ঠাকুরপোকে ডেকে কথাটা বলি। বলি নি তোর একটা কাজ কর্ম্ম হয় নি বলে। তোর গলায় গোড়া থেকেই একটি বোঝা চাপিয়ে দিতে আমার ভরসা হয় না বাবা! ইন্দু মেয়ে ভাল, বড়লোকের মেয়ে হলেও বড়লোকী চাল নেই তা আমি জানি! তবু, আমার নাইকো-ঘরে তাকে আনতে আমার সাহস হয় না। ভগবান যদি মুখ তুলে চান, সেই আশাতেই চুপ ক'রে আছি।

বিমল তাড়াতাড়ি বলিল, তাই চুপ করেই থাক মা।

—কিন্তু, একবার ঠাকুরপোর সঙ্গে কথাটা ক'য়ে রাখতে পারলে ভাল হয়।

—সে তখন একদিন হবে মা।

—আচ্ছা তাই। কিন্তু তুই একবার যা, বলে আয়।

সে যে যাইবে না, কাজেই বলাও হইবে না, এ কথাটা বিমল মা'কে বলিতে পারিল না। তাহার মনে হইতেছিল, এইমাত্র একটি ক্ষুদ্র সুসংবাদ দিয়া মাতাকে যতখানি আনন্দ দিয়াছে, এই কথায় তাঁহাকে তাহার চেয়ে অনেকখানি দুঃখ দিবে।

—মুখ হাত ধুয়ে ফেল্, আমি মোহনভোগ করে আনি, একটু জল খেয়ে ভবানীপুর বেড়িয়ে আয়। মা উঠিয়া গেলেন।

ভবানীপুর! জীবনের অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছে, ঐ নামধেয় পল্লীটি। কত সুখ-আশা, কত কামনা, কত বাসনা ঐ পল্লীর সঙ্গে জড়ীভূত হইয়া রহিয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে বিমল হাতের উপর মাথা রাখিয়া মাদুরটায় শুইয়া পড়িল।

যাইতে হইবেই; কিন্তু সংবাদ দিবার জন্য নয়; একবার চোখে দেখিয়া চলিয়া যাইবে। সংবাদটি ইন্দুকে দিতে পারিলে মন প্রসন্ন হয়, তাহা সত্য; কিন্তু দিবার উপায় নাই। যে গৃহে অসঙ্কোচে প্রবেশাধিকার নাই, সে গৃহের কাহাকেও পত্র লিখিবার দুরাকাঙ্ক্ষাও সে পোষণ করে না। আর সংবাদটিও এমন উজ্জ্বল নয় যে, ইন্দুর মাতা তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন।

জলযোগ করিয়া বিমল ভবানীপুরে গেল। পরিচিত পথ, পরিচিত

গৃহ, পরিচিত ফটকের সম্মুখ দিয়া চলিবার সময় নয়নদ্বয় মনের কড়া শাসন মানিল না। বারান্দার রেলিঙ ধরিয়া ইন্দু দাঁড়াইয়াছিল! এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে ইন্দু যেন একখানি বিষাদময়ী প্রতিচ্ছবির মত দাঁড়াইয়া ছিল. বিমলকে দেখিবা মাত্র তড়িতালোকে উদ্ভাসিত গৃহের মত. নিমিষে হাস্যময়ী প্রতিমা হইয়া উঠিল। বিমল চলিয়া গেল।

অনেকখানি পথ ঘুরিয়া সে যখন আলিপুরে জজ সাহেবের কুঠিতে পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। বেহারা তাহাকে ড্রয়িং-রূমে লইয়া গেল। সেখানে জজ-সাহেব, পত্নী, পুত্র-কন্যা সকলেই বসিয়া ছিলেন। মিঃ ঘোষ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বিমলকে অভ্যর্থনা করিয়া সকলের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। অবশেষে জ্যেষ্ঠা কন্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন. ছায়া, তোমার মাষ্টার মশাইকে তোমার পড়বার ঘরে নিয়ে যাও।

মিসেস্ ঘোষ বলিলেন, শুনুন সুবিমল বাবু আমার মেয়ে ছায়া অঙ্কে ভারী কাঁচা, অঙ্ক ওর মাথায় ঢুকতেই চায় না। অন্য সাবজেক্ট একরকম চালিয়ে নিতে পারে, কেবল অঙ্কটা পারে না। আপনাকে সেদিকে বিশেষ ক'রে অ্যাটেনসান দিতে হবে!

বিমল বলিল, যে আজ্ঞে।

আসুন মিঃ রায়—ছায়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া কথাগুলি বলিল।

মেয়েটিকে ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ হইবামাত্র বিমল দেখিল, মেয়েটি সুন্দরী, আদবকায়দাদুরস্ত এবং সে বিবাহিতা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সেদিন রবিবার। বেলা তিনটা বাজিয়াছে। হেরম্বনাথের বৈঠকখানা-ঘর কচে-বারোর হুঙ্কারে ঘন ঘন বিকম্পিত হইতেছে। গৃহিণী ইন্দুর মাথার বেতো চুল বাছিতেছিলেন, ক্ষণপ্রভা অনেকগুলা ছবির বইয়ের ছবি দেখিতে দেখিতে বইগুলির মধ্যে মাথা গুঁজিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ফটকে মোটর ঢুকিল। তাহাতে কৌতূহলের কোন কারণ ছিল না। ছুটীর দিনে আড্ডাধারীদের সংখ্যাধিক্য ঘটেই; আড্ডাধারীদের মোটর আছে। কিন্তু দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়িতে জুতার শব্দ হইতেই ইন্দু মায়ের কোলের উপর হইতে মাথাটা টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিল, কে আসছে!

এক মিনিট পরেই গৃহিণীর আবু-দি, তাঁহার জা', জায়ের কন্যা প্রভৃতি আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। আবু ও লাবু দুই বাল্য-বন্ধু। আভা দুই এক বৎসরের বড় বলিয়া ছেলেবেলা হইতে লাবণ্য তাহাকে দিদি বলিতেন। এক গ্রামের মেয়ে, দুই পরিবার মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্টতা ছিল। দূরসম্পর্কের আত্মীয়তাও ছিল।

গৃহিণী সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইতেছিলেন, আবু দি কহিলেন, বসলে হ'বে না, তোমাদের সব নিতে এসেছি। আমাদের বাড়ীর ছেলেরা ছেলেদের একটি নাটক অভিনয় করবে, আজ তার পোষাক-মহলা, তোমাদের যেতে হবে। আগে খবর দিতে পারি নি, কেন না ঠিক ছিল না। তাতে আর কি হয়েছে বল? কাপড় পরে নিতে কতক্ষণই বা সময় লাগবে! যা ইন্দু, চট করে কাপড়টা বদলে নে, তুইও ওঠ না ভাই লাবু।

—একটু আগে খবর দিলে ভাল হতো ভাই। বলিতে বলিতে গৃহিণী কাপড় বদলাইতে গেলেন।

ইন্দু অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল—করিয়াও ছিল, কিন্তু প্রবল স্রোতে তৃণখণ্ডের মত আপত্তি ভাসিয়া গেল। আবু-দি বলিলেন, আমি সব কাজ ফেলে ছুটে এসেছি, 'না' বললে শুনছে কে? শীগগির শীগগির নে ইন্দু। আমি না পৌছালে ছেলেরা সব হাত-পা গুটিয়ে বসে পড়বে!

ইহার পরে আর কোন কথাই চলিল না।

নীচে কর্ত্তাকে খবর পাঠান হইল। কর্ত্তা শশব্যস্তে কহিলেন, বাস্‌রে! মহেন্দ্র তিনবার আমায় মাৎ করেছে, আমার কি নড়বার যো আছে!

সংবাদ-বাহক নিবেদন করিল, মা ঠাকরুণরা যাচ্ছেন, আপনাকে তাই বলতে বললেন।

খুব ভাল।—বলিয়া তিনি গজ দিয়া মহেন্দ্রের নৌকাডুবি ঘটাইলেন।

আবু-দি'র বাড়ীর ছেলেরা সত্য সত্যই অনিন্দ্যসুন্দর অভিনয় করিল। বহু বিখ্যাত সমজদার ও গুণীজন অভিনয় স্থলে উপস্থিত ছিলেন; সকলেই অভিনয় ও নাটকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিলেন। নাটকটির নাম—"অদৃষ্টের পরিহাস" অল্প বয়স্ক বালকেরা সরস্বতী পূজার দিন সমবেত হইয়া তাহাদের স্ব স্ব ভবিষ্যৎ জীবনের কাল্পনিক চিত্রাঙ্কন করিতেছে. এই বিষয়ের ভিত্তির উপরে নাটকটি সুগঠিত। লেখক আবু-দির দেবর। তিনি আবার হাকিম।

অভিনয় সর্বেমাত্র শেষ হইয়াছে। রঙ্গপীঠের উপরে সভা বসিল। জনৈক প্রবীণ হাকিম ক্ষুদ্র একটি বক্তৃতা করিয়া নাটকের লেখককে

অভিনন্দিত ও বালক অভিনেতৃবর্গকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনেকে লেখককে মালাভূষিত করিলেন ; ছেলেদেরও নানা উপহার দান করিলেন।

সভান্তে সকলে যখন বিদায় হইতেছে, লেখক আসিয়া আবু-দির পার্শ্ববর্ত্তিনী তরুণীকে ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কেমন লাগল বলুন ?—এই তরুণী ইন্দু।

এত লোক থাকিতে লেখক তাঁহার অভিমত জানিতে চাওয়ায় ইন্দু অত্যন্ত বিস্মিত হইল ; পুলকিত যে না হইল তাহা নহে! তবে লজ্জাও বড় কম নয়। ইন্দু অতি কষ্টে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সুন্দর হয়েছে।

লেখক বলিলেন, আর একদিন অভিনয় হবে। সরস্বতী পূজার দিন সন্ধ্যায়। সেদিনও আসতে হবে।

আবু-দি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—নিশ্চয়ই আসবে। আমি লাবুকে বলে দিয়েছি।

ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, মা কোথায় ?

আবু-দি বলিলেন, বাড়ীর মধ্যে ওঁদের সঙ্গে দেখা ক'রে আসতে গেছেন। এলেন ব'লে। তা ঠাকুরপো, বড় গাড়ী ত সরযূদের নিয়ে বেলেঘাটা যাচ্ছে, আমি বলি কি, তোমার গাড়ীতে তুমি ইন্দুদের পৌঁছে দিয়ে এস না কেন!

—তা বেশ ত! আমার গাড়ী ত বাইরেই রয়েছে। চলুন আপনাদের রেখে আসি।

ইন্দু আবুদির পানে চাহিতেই তিনি বলিলেন, দাঁড়াও ভাই, আমি ওর মাকে ডেকে আনি।

আবু-দি অদৃশ্য হইতেই, লেখক ইন্দুকে বলিলেন, আসুন আমরা ততক্ষণ গাড়ীর কাছে যাই।

গাড়ীর কাছে আসিয়া লেখক জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি ড্রাইভ করেন ?

ইন্দু সলজ্জ হাস্যে কহিল, আমি শিখিনি। আমার ছোট বোন খনা চমৎকার ড্রাইভ করে। আমি বড্ড নার্ভাস, ভয় হয় তাই চেষ্টাও করিনি কখনও।

—নার্ভাস প্রথমটা সকলেই থাকে ; দুই একদিন অভ্যেস করলেই নার্ভাসনেস্ কেটে যায়। শিখে রাখা ভাল। অনেক মেয়েও ত আজকাল ড্রাইভ করেন।

এই সময়ে দেখা গেল, আবু-দি, তাঁহার স্বামী, ইন্দুর মা ও ক্ষণপ্রভা সেই দিকেই আসিতেছেন। লেখক বলিলেন, খুব সোজা ! একটু মনোযোগ দিলে দু'দিনও লাগে না।

—দুদিনও লাগে না ?

—না। আমি আপনাকে একদিনে শিখিয়ে দিতে পারি ; অবশ্য আপনি যদি রাজী হন। মনোযোগ দিতে হবে কিন্তু—

ইন্দুর মুখটি অকস্মাৎ ম্লান হইয়া আসিল ; মৃদুস্বরে বলিল, মনোযোগ দিতে পারব কি ! কে জানে !

যাঁহারা আসিতেছিলেন, তাঁহারা আসিয়া দাঁড়াইতেই, লেখক আবু-দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, তুমিও কেন চল না বৌদি, ওঁদের পৌঁছে দিয়ে আসবে।

আবু-দির স্বামী বলিলেন, যাও না. একটু বেড়ানও হবে'খন।

তাই চল।

প্রথমে লাবুকে উঠিতে হইল, আবু-দিও উঠিলেন। ক্ষণপ্রভাও উঠিল। ইন্দুও সেই দিকে আসিতেছিল, আবু-দির দেবর বলিলেন, ওখানে আর ভিড় বাড়িয়ে লাভ কি। আপনি এদিকে উঠে পড়ুন—ড্রাইভিংটা দেখা, শিক্ষার প্রথম সোপান।

ইন্দু বুঝি একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল, আবু-দি বলিলেন, দেরী করিস নে, উঠে পড় ইন্দু।

আবু-দির স্বামী ভ্রাতাকে বলিলেন, ওরে প্রণয়, ফেরবার সময় একটা দোকান থেকে একটিন সিগোরেট আনিস্ ত!

আনিবে, বলিয়া প্রণয় গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল। ছোট গাড়ীখানা, নূতন—তক্-তক্ ঝক্-ঝক্ করিতেছে। ড্যাস্ বোর্ডে আলো জ্বলিতেছে, চালক কোন্ কলটি কি কাজ করে, কোন্‌টি কি নির্দ্দেশ করে, কোন্‌টি স্বাধীন, কোন্‌টির উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়, এই সব তত্ত্ব ইন্দুকে বুঝাইতে বুঝাইতে চলিলেন। ভদ্রলোকটির বুঝাইবার ক্ষমতা ছিল। ইন্দুর মনে হইল এত সহজ জানিলে সে ত কবে শিখিয়া ফেলিতে পারিত! গাড়ীর কখনও গতি বৃদ্ধি পাইতেছে, আবার কখনও হ্রাস পাইতেছে, এবং কতটা বাড়িতেছে আর কতটা কমিতেছে এই সব দেখিতে দেখিতে ভবানীপুর আসিয়া পড়িল। আবু-দি রাস্তা নির্দ্দেশ করিলেন। বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া ইন্দু বলিল, ডানদিকে আমাদের গেট।

বাড়ীর সামনের রাস্তাটা অল্পপরিসর বলিয়া সকল গাড়ীকে এদিক-ওদিক করিয়া প্রবেশ করিতে হয়, প্রণয় এক ঝোঁকেই ভিতরে ঢুকিয়া বাগানের পাশ দিয়া গাড়ী-বারান্দার দিকে যাইতে যাইতে ইন্দুকে বলিল, শিখবেন ত?

—তা শিখলে হয়, বলিয়া ইন্দু হাসিল। হাসিটি অত্যন্ত ম্লান। কিন্তু সেই ম্লান হাসিটুকুও প্রণয় যেন প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিয়া লইল। বলিল, তাহ'লে কাল বিকেলে আসব ?

ইন্দু ত্রস্তচকিত ভাবে বলিয়া উঠিল, না, না, বিকেলে নয়, বিকেলে আমার সুবিধে হবে না। এইখানেই রাখুন।—যেন নামিতে পারিলে বাঁচে, এই ভাবে বাম হস্তে চলন্ত গাড়ীরই দ্বার খুলিয়া ফেলিল।

দ্বারবান্ বাগানের ও গাড়ী-বারান্দার সমস্ত আলো জ্বালিয়াছিল। উদ্যানের সে কি বিচিত্র শোভা! বিদ্যুতালোকে কালো কালো গাছগুলিতে নানা বর্ণের সজীব ফ্লাওয়ার ফুটিয়া বাগানটিকে যেন হাস্যপ্রফুল্ল করিয়া রাখিয়াছে। যেদিকে চক্ষু পড়ে, তরু, লতা ও ফুল। নিশীথিনীর স্নিগ্ধতা, বিদ্যুতালোকের ঔজ্জ্বল্য উভয়ে মিলিয়া উজ্জ্বলে-মধুরে গড়া এক মায়ালোকের সৃষ্টি করিয়াছে।

গৃহিণী বলিলেন, একটু বসলে হোত না।

আবু-দির আগেই প্রণয় বলিলেন, আজ আর নয়; রাত হয়ে গেছে অনেক; আর একদিন তখন আসব।

—নিশ্চয় আসবেন। গৃহিণী কন্যাদ্বয়কে বলিলেন, তোমরাও বল ওঁদের আসতে।

ক্ষণপ্রভার চোখে ও সেই সঙ্গে মাথায় নূতন মটরখানা ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, তাই ক্ষণপ্রভা সর্ব্বাগ্রে ও সাগ্রহে কহিল, কবে আসবেন? কাল?

ইন্দুও বলিল, আসবেন! আপনিও আসবেন মাসিমা।

আবু-দি কহিলেন, আচ্ছা গো আচ্ছা, আসব। আর তোমাকে খাতির

করে মাসিমা টাসিমা করতে হবে না। কাল যদি নাও পারি পরশু বিকেলে আসব। কি বল ঠাকুরপো, পরশু বিকেলে কোর্ট থেকে ফিরে তুমি আনতে পারবে না?

—তা পারব না কেন?—বলিয়া ফেলিয়াই প্রণয় ইন্দুর পানে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। না আসিবার জন্য বিস্ময়জনক মিনতি যেন দুইটি চোখে ভরিয়া রহিয়াছে। প্রণয় কিছু বুঝিল না!

দুই বাল্য সখিতে একান্তে কি কথা কহিতেছিলেন, সেই ফাঁকে প্রণয় বলিল, বিকেলে আসায় আপনার অমত আছে?

ইন্দু স্পষ্টকণ্ঠে কহিল, হ্যাঁ।

—তাহ'লে কখন আসব বলুন?

সন্ধ্যের পর।

বেশ—তাই।

ইন্দুর নয়নে আননে কৃতজ্ঞতা ফুটিয়া উঠিল। সে রাত্রে ইন্দু যখন বারান্দায় আসিয়া সামনের জনবিরল রাজপথটির পানে চাহিল, তখন তাহার মনে হইল, কাহার মুখ দেখিয়া আজ তাহার নিসাবশান হইয়াছিল, সমস্ত দিনটাই নষ্ট! সে যে এই পথ দিয়া গিয়াছে, ইহা মনে পড়িতে ইন্দুর মনখানি যেন দুমড়াইয়া মুচড়াইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ছায়ার পড়িবার ঘরটি বিলাতী ছাঁদে নয়নাভিরাম করিয়া সজ্জিত কক্ষের ভূষণে ছায়ার সৌন্দর্য্য ও রুচিজ্ঞানের পরিচয় সুপরিস্ফুট। ছায়া মেধাবিনী, বিমল মনে মনে ইহা বুঝিয়াছে, কিন্তু তাহার প্রকৃতির সঙ্গে মনোযোগিতা কোন সময়েই যেন খাপ খায় না। ছায়া যতটুকু পড়ে, সহজেই তাহা আয়ত্ত করে; কিন্তু পড়ায় মন বসাইতে তাহার আগ্রহের একান্ত অভাব। ছায়া স্পষ্টই বলে, লেখাপড়ায় তাহার মন বসে না; তাহার বাবা তাহাকে অব্যাহতি দিতে রাজী, কেবল মা'র জেদেই 'বুড়া বয়সে'ও তাহাকে ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য আবার এই বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইতেছে।

ছায়ার স্বামী অশোক বিলাতে। বিবাহের তিনদিন পরে, অর্থাৎ ফুলশয্যার পরদিন ব্যারিষ্টারী পড়িতে বিলাত গিয়াছে। তিন বৎসর অতীতপ্রায়, পড়া-শুনা কিরূপ করিতেছে তাহা জানিতে পারা যায় নাই; পাস যে করে নাই তাহা সকলেই জানে। প্রথম বৎসর অশোক প্রতি মেলে ছায়াকে দীর্ঘ পত্র লিখিত; দ্বিতীয় বৎসরে পত্র হ্রস্ব হইয়াছিল; তৃতীয় বৎসরের প্রারম্ভে পত্র-সংখ্যা কমিয়া যায়; কয়েক মাস হইতে অশোকের পত্র দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। ছায়ার পিতার আত্মীয়, বন্ধু ও বন্ধুপুত্র, যাঁহারা বিলাতে আছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে যে সমস্ত সংবাদ সংগৃহীত হইতেছে, তাহাতে সকলেই মর্ম্মাহত। অশোক সে দেশে আছে সত্য, কিন্তু কখন্ যে কোথায় থাকে, কোথায় তার বাসা, 'ইনে' আছে অথবা

'ইন্' ছাড়িয়াছে কোন খবর কাহারও জানা নাই। মাঝে মাঝে রাত্রে লণ্ডনের আলোকিত রাজপথে অশোককে দেখা যায় বটে, কিন্তু যে ভাবে দেখা যায় তাহা লিখিতে অনেকেরই প্রবৃত্তিতে বাধিয়াছে।

তাঁহাদের প্রবৃত্তিতে বাধিলেও এখানকার লোকের অনুমানে বাধা জন্মিল না। অশোকের আত্মীয়-স্বজন যেমন, ছায়ার আত্মীয়-স্বজনও তেমন সব কথাই বুঝিলেন। অশোকের বৃদ্ধ পিতা তদবধি শয্যা-গ্রহণ করিয়াছিলেন, উঠিবেন সে ভরসা নাই। তাঁহার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া ছায়া তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিল, বৃদ্ধ পুত্রবধূর মুখদর্শনেও অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা, ইহার বাপ-মা তাঁহার ছেলেটিকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করাইয়াই ক্ষান্ত হ'ন নাই, টাকা দিয়া বিলাত পাঠাইয়া তাহার ইহকাল ও সেই সঙ্গে পরকালের মাথাও খাইয়াছেন। এই কালেও তাঁহার বিশ্বাস, ব্রাহ্মরা ম্লেচ্ছ, তাহারা সকল জাতির ছোঁয়া খায় এবং গোমাংস ব্যতিরেকে তাহাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না। বৃদ্ধ পাড়াগাঁয়ের লোক, কলিকাতার লোকের কথায় তাঁহার নিদারুণ অবিশ্বাস। কলিকাতার লোক প্রাণান্তে সত্য বলে না, ইহা তাঁহার আর একটি বিশ্বাস।

ছায়াদের গৃহে এই ব্যাপারে তেমন চাঞ্চল্য দেখা যায় নাই। মিঃ ঘোষ নিজে বিলাতে ছিলেন, ব্যারিষ্টার। তিনি বলেন, অধিকাংশ যুবাই দিন কতক একটু বিগড়ায়, তারপর ঘুরিয়া আসে। তাঁহাদের সময়ের প্রায় সব ছাত্রই সময় বিশেষে একটু-কি-বলে-তাই হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু পরে না ফিরিয়াছে কে? সংসারই বা না গড়িয়াছে কে? ছায়ার মা প্রথমটা খুব রাগ করিয়াছিলেন, পরে আবার শান্ত হইয়াছেন। ক্রমে

মেয়ে বিয়ে করিবার জন্য যে দেশের ছেলেরা পাগল, গোরোচনা গৌরীর দেশে গিয়া তাহাদের যদি একটু মতিভ্রান্তি ঘটে, তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। ছায়ার আচরণ অতীব আশ্চর্য্যজনক। অশোকের অধঃপতনের সংবাদ তাহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিয়াছে এমন মনে হয় না।

এত সব ব্যাপার বিমলের জানিবার বা শুনিবার কথা নয়, ছায়া-ই সবিস্তারে তাহাকে জানাইয়াছে। ধনী বা তথাকথিত আধুনিক সমাজের সহিত বিমলের কোন পরিচয় ছিল না ; এই সমাজের গঠন-বিন্যাস সম্বন্ধেও তাহার কোন জ্ঞান ছিল না। অশোক বিলাতে যে কীর্ত্তি করিয়াছে, এই সমাজে তাহার সনাতনত্ব সম্বন্ধেও কোনরূপ ধারণা ছিল না। ছায়াকে সহজ ভাবে, গল্পচ্ছলে সব কথা বলিতে শুনিয়া বিস্ময়ের তাহার অবধি রহিল না। প্রথমটা এই সব গল্প শুনিতে তাহার আগ্রহের অভাব ছিল ; ছায়ার বাক্যস্রোতে বাধাও দিয়াছিল কিন্তু ছায়া তাহা গ্রাহ্য করে নাই।

কন্যার ভবিষ্যৎ-জীবন গঠনে মিসেস ঘোষ অতিমাত্রায় সজাগ। বিবাহের পূর্ব্বেই তিনি কন্যাকে নৃত্য-গীতাদিতে পারদর্শিনী করাইয়া লইয়াছিলেন ; আদব-কায়দা ও আধুনিক হাব-ভাব সম্বন্ধেও ছায়া পিছাইয়া ছিল না ; কেবল লেখাপড়ায় তাহাকে উন্নত করিতে পারা যায় নাই। এক্ষণে তিনি তৎপ্রতি অবহিত হইয়াছেন। মেমেদের দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া অশোক যেন একটি দেশী-মেমই পায়, মেয়েকে মিসেস ঘোষ সেই ভাবেই প্রস্তুত করিতে যত্নবতী হইয়াছেন।

আজও বিলাতের কথা উঠিয়া পড়িয়াছিল। ছায়া অঙ্কের বই, খাতা বন্ধ করিয়া বলিল, মিষ্টার রায়, এমন কোন ব্যবস্থা হ'তে পারে না যাতে অঙ্কটা বাদ দিয়ে পরীক্ষায় পাস করা যায়?

বিমল বলিল, এখানে তেমন ব্যবস্থা নেই, শুনেছি বিলেতে আছে।

—বিলেত দেশ'। বেশ, বলিয়া ছায়া টেবিলের উপর রক্ষিত অশোকের ফটোখানির দিকে চাহিল।

বিমল হাসিয়া বলিল, আপনি বিলেত গেলেন না কেন? তা' হলে ত—

তির্য্যক গতিতে ফিরিয়া ছায়া প্রশ্ন করিল—তা' হলে কি?

বিমল যেন একটুখানি অপ্রতিভ হইয়া পড়িল; বলিল, তা হ'লে অঙ্ক নিয়ে মাথা ফাটাফাটি করতে হত না।

ছায়া হাসিল; বলিল, তা ঠিক।

এক মিনিট পরে আবার বলিল, দেখুন মিষ্টার রায়, পাস আমি করতে পারব না, সে আমিও জানি; আপনিও জানেন। মা জেনেও জানতে রাজী ন'ন। আপনার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।

—কি বলুন?

—আপনি সন্ধ্যাবেলা না এসে, বিকেলে আসতে পারেন না?

বিমল চিন্তিতভাবে বলিল, বিকেলে?

ছায়া কহিল, হাঁ। আপনি ত কোথাও কাজ করেন না বলেছেন, বিকেলে আপনার কি বিশেষ অসুবিধে আছে?

বিমলের মন বলিল, অসুবিধা একটু আছে বৈকি! একজন সারাদিন ধরিয়া তাহারই আশা পথ চাহিয়া থাকে, তাহাকেই নিরাশ করিতে হয়। আজ বিকালটা নিষ্ফল গিয়াছে, দেখা হয় নাই, বোধ হয় সে গৃহে ছিল না, দুইবার বাড়ীটার সামনের পথ ধরিয়া বিমল হাঁটিয়া গিয়াছে, আসিয়াছে, ইন্দুর দেখা পায় নাই। কাল নিশ্চয়ই ইন্দু সাগ্রহে তাহার প্রতীক্ষায়

দাঁড়াইয়া থাকিবে। শুধু চোখের দেখা! তাহা হইতেও, তাহাকে বঞ্চিত করিতে মন সরে কৈ?

তাহাকে নীরব দেখিয়া ছায়া আবার বলিল আপনার সুবিধে না হয় যদি, তবে যেমন আসেন তেমনই আসবেন।—তারপর একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, আমার কিন্তু সন্ধ্যেবেলাটা বই নিয়ে বসে থাকতে ভাল লাগে না। ডিনারের আগে পর্য্যন্ত কত লোক আসেন, কত গল্পগুজব হয়, আমি শুধু বাদ পড়ে থাকি।

বিমল দ্বিধা পরিহার করিয়া বলিল, বেশ, আমি কাল থেকে বিকেলেই আসব।

ছায়ার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; সাগ্রহে কহিল, বিশেষ অসুবিধে হবে না ত আপনার?

—অসুবিধে কিছু না। তবে—বিমল থামিয়া গেল। ছায়া কথাটার শেষ জানিবার জন্য কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল; তারপর জিজ্ঞাসিল, 'তবে' ব'লে থামলেন যে?

এই সময়ে সামনের পর্দ্দাটা ফাঁক করিয়া টাই-আঁটা একটি সুশ্রী ও আধুনিক-ভাবাপন্ন যুবক উঁকি মারিতেই, ছায়া বলিল, এক মিনিট, আমি আসছি, বলিয়াই সে বাহির হইয়া দশ পনেরো মিনিট কাটাইয়া আসিল। এই যুবকটিকে বিমল কয়দিনই এই সময়ে আসিতে দেখিয়াছে।

বিমল যে কৌতূহলবর্জ্জিত মানব তাহা নহে; তবে অনধিকার-চর্চ্চার প্রবৃত্তি দমন করিবার অভ্যাস আছে বলিয়া কোনদিন ছায়াকে কোন প্রশ্নই সে করে নাই। আজও করিল না, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া ছায়া নিজেই আজ কৈফিয়ৎ দিতে বসিল। বলিল, ও আমার কাজিন, সমীর

ওর নাম, সিনিয়র কেম্বি্রজ পাস ক'রে ব'সে আছে, অক্সফোর্ডে সীট্ না। রাত আটটা ন'টা পর্য্যন্ত আমি ঘরে আটকা থাকি বলে ওরা ভারি ডিসাপয়েণ্টড হয়ে ফিরে যায়। তাইত আপনাকে বলছি— ডিসাপয়েণ্ট করতে আমার ভারি খারাপ লাগে।

শেষ কথাটা বিমলের বুকের মধ্যে প্রতিধ্বনি তুলিতেছিল। তা সে সংযতভাবে বলিল, কাল থেকে তাই হবে মিসেস্ বোস।

ছায়া আনন্দ-আপ্লুতকণ্ঠে কহিল, কিন্তু আপনি আমায় মিসেস বলেন কেন? আমাকে ছায়া বলেই ত' সবাই ডাকে।

বিমল হাসিল।

ছায়া বলিল, ইন্দু ব'লে যে মেয়েটিকে আপনি পড়াতেন, তাঁকেও আপনি 'আপনি' বলতেন?

বিমল অপরাধীর মত উত্তর করিল 'না'।

—তবে আমাকেই বা আপনি 'আপনি' বলেন কেন?

বিমল ভাবিতেছিল ইহার কি সদুত্তর দেওয়া যায়?

ছায়া জিজ্ঞাসা করিল, ইন্দু ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাস করে আই-এ প না কেন?

বিমল বলিল, সে'ও আপনারই জুড়িদার, পড়তে চায় না।

ছায়া অকৃত্রিম দুঃখের স্বরে কহিল, আমার জুড়িদার কেন হতে য তিনি! তিনি ত ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাস করেছেন।

—তা ক'রেছেন।

—আপনার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়?

বিমল বলিল, হয়।

—আপনি তাঁকে পড়তে বলেন না ?

—না।

—কেন ?

বিমল একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, কি হবে পড়ে ?

ছায়া সোল্লাসে বলিয়া উঠিল, ঠিক বলেছেন মিঃ রায়। আমরা ত আর চাকরী করতে যাচ্ছি নে। মা যে এ কথাটা কিছুতেই বোঝেন না।

ইহার কয়েকদিন পরে, বিকালে পড়াইতে আসিয়া বিমল দেখিল, অনেকগুলি বিবাহের প্রীতি-উপহার ছড়াইয়া, ছায়া একমনে কবিতা লিখিতেছে। নমস্কার,বলিয়া বিমলকে বসাইয়া বলিল, আমার এক কাজিনের বিয়ে। সমীরকে ত আপনি দেখেছেন, তার দাদা প্রবীরের বিয়ে। প্রবীরও আমার গ্রেট ফ্রেণ্ড। আমার ওপর কবিতা লেখার ভার। লিখছি কিন্তু ভাল হচ্ছে না, আপনাকে ঠিক করে দিতে হবে।

বিমল হাসিয়া কহিল কবিতার যে আমি কিছুই বুঝিনে ছায়া।

না, আপনি আবার বোঝেন না! আমি ব'লে আপনার ভরসাতেই এই ভার নিলুম! আপনার আরও কিছু কাজ আছে মিঃ রায়।

—আমার আবার কি কাজ ?

—আমাদের সমাজের বিয়েতে প্রোগ্রাম ছাপা হয় জানেন ত ?

—না।

—হয়। তাতে সংস্কৃত মন্ত্রগুলিকে ভেঙ্গে বাঙলা করতে হয়। সেইটি আপনাকে করে দিতে হবে।

—তা বোধ হয় পারব।

ছায়া চেয়ার ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, বয়কে বলি চা দিতে, কেমন ?

বলিতে হইল না, তন্মুহূর্ত্তে 'বয়' চা লইয়া প্রবেশ করিল। চা প্রস্তুত করিয়া ছায়া বিমলকে দিল, নিজে লইল। তারপর, একখানা হরিদ্রাবর্ণের তুলোট কাগজে ছাপা ছিন্নপ্রায় প্রোগ্রাম দেখাইয়া বলিল, ওতে বিয়ের মন্ত্রগুলো আছে, ওরই অনুবাদ করতে হবে।

বিমল প্রোগ্রামটা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। ছায়া তাহার অনুসরণ করিয়া যাইতে যাইতে, এক সময়ে প্রশ্ন করিল, এ আপনার কেমন মনে হয় ?

বিমল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি ?

এই যে, বলিয়া সে একটা স্থান দেখাইয়া দিল। বিমল পড়িল।

ওঁ যদেতদ্ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।

যদেতদ্ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।

ছায়া বলিল, অসহ্য ন্যাকামী ব'লে মনে হয় না আপনার ?

—না।

—আমার ত হয়। "তোমার হৃদয় আমার হউক, আমার হৃদয় তোমার হউক", আবার অনেকে ঐ সঙ্গে বলে কি জানেন ?—উভয়ের মিলিত হৃদয় ঈশ্বরের হউক,—বিয়ে করতে বসে কোন বর বা কোন বধূ এ কথা যে মনে করে, আমি তা মানি নে।

বিমল সহজ ও সরল হাস্যের সহিত প্রশ্ন করিল, তুমি মনে কর কি ছায়া ?

—একবারও না।

—কিন্তু মন্ত্রটি বলেছিলে ত ?

ছায়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, ওটা ত আমার বলবার নয়। ওটা যে—

বিমল কাগজটা দেখিয়া লইয়া ত্রুটী স্বীকার করিল, তাই বটে। তারপর সমস্ত প্রোগ্রামটা আগাগোড়া চক্ষু বুলাইয়া লইয়া বলিল, বিয়ের মন্ত্র বাঙ্গলাতেই হওয়া উচিত। বেশীর ভাগ ছেলে মেয়ে ভাল করে সংস্কৃত জানে না, পুরুত ম'শায় অং-বং করে মাথামুণ্ড যা আউড়ে যান, বর ক'নে তার কতক উচ্চারণ করে শুধু, বেশীর ভাগ উচ্চারণও করতে পারে না, তা মানে বোঝা ত পরের কথা। আপনাদের ব্রাহ্ম-সমাজের ব্যবস্থাটি বেশ।

ছায়া মৃদু হাস্যের সহিত কহিল, তা হ'লে আপনি যখন বিয়ে করবেন, ব্রাহ্ম-সমাজের ব্যবস্থাটিই রাখবেন।

বিমল মনে মনে প্রসন্ন না হইলেও মুখে তাহা প্রকাশ না করিয়া বলিল, বিয়ে করলে ত!

—কেন, বিয়ে করবেন না?

—না।

ছায়া আব্দার ধরিল, কেন বলুন না?

বিমল ম্লান হাসিয়া নত মুখে বলিল, গরীবের কি ঘোড়া রোগ সাজে?

কথাগুলা তাহার নয়; কিন্তু সেগুলা বুকের ভিতরে যেন জাঁকিয়া বসিয়া আছে। শ্লেষ্মারোগী শ্লেষ্মা উঠিলে যেমন স্বস্তি বোধ করে, কথাটা বলিয়া বিমলও একটু স্বস্তি পাইল।

কেহ বিবাহ করিবে না শুনিলে, কেন জানি-না নারীমাত্রেরই দুঃখ হয়। ছায়াও নারী এবং সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমও নয়। দুঃখিত

ভাবে কহিল, কিন্তু মিঃ রায়, আপনার চেয়েও যারা গরীব তারা কি বিয়ে করে না ?

—তারা কি করে জানি নে ; কিন্তু আপনি পড়বেন কখন ?

—হ্যাঁ ! আজ আর পড়েছি ! কবিতা দু'টো শেষ করতেই হবে, তারপর আপনাকে দিয়ে কারেক্ট করিয়ে রাত্রে সমীরকে দোব, সে বলেছে খুব আর্টিষ্টিক ক'রে ছাপিয়ে এনে দেবে। আপনি ততক্ষণ এইটে দেখুন না ! আমি পড়ব ? আচ্ছা—

এতদিনের ভালবাসা
কত প্রেম কত আশা—

পড়িতে পড়িতে থামিয়া, টীকা করিল, প্রবীর রেণুকে অনেকদিন থেকে ভালবাস কি-না, এনগেজ্‌ড-ই ত' ছিল প্রায় দু বছর, সবাই এক রকম ডিসগাস্‌টেড হয়ে গেছল। লং এনগেজমেণ্ট ইজ নো গুড। আপনি কি বলেন মিঃ রায় ?

বিমল বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া গিয়াছিল। ভদ্রঘরের কোন যুবতী বিবাহিতা মেয়ে যে এই সকল কথা একজন অন্য পুরুষের সঙ্গে অবাধে কহিতে পারে ইহা তাহার কাছে কল্পনার অতীত। তাহার মনের মধ্যে যে মন থাকে, সেই মন ছি-ছি করিয়া উঠিল। মাঝে মাঝে ছায়ার মুখের উপর, দেহের উপর দৃষ্টি ফেলিয়া তাহাকে দেখিয়া দেখিয়া সে শুধু নিজের বিস্ময়ের বোঝা বৃদ্ধি করিতেছিল।

ছায়া কবিতা-সংশোধনে মন দিয়াছিল, শেষ করিয়া মুখটি তুলিয়া বলিল, এইখানটার বড্ড আটকেছে—

পূর্ব্বরাগ শেষ হ'লো
অনুরাগ-পালা প'লো
বাকী শুধু—

'মান' করব না 'বিরহ' করব ? মান থাকলে 'প্রাণ'-এর সঙ্গে বেশ মিল হয়। এই যে প্রণয়-দাদা। একেবারে সাইকোলজিক্যাল মোমেণ্টে এসে পড়েছ।

পর্দ্দা সরাইয়া 'অদৃষ্টের পরিহাস' নাটকের লেখক ডেপুটী প্রণয়কুমারের প্রবেশ।

—তোমার মা কোথা ?

বোধ হয় শোবার ঘরে, চেঞ্জ করছে, বেরোবো। কিন্তু তুমি আমার কবিতা দুটো ঠিক ক'রে দিয়ে যাও। মিঃ সেন, ইনি আমাদের গ্রেট ফ্রেণ্ড, মিঃ রুদ্র। প্রণয় দা, ইনি মিঃ রায়। আমি পড়ি ওঁর কাছে।

'হা ডু ডু', বলিয়া প্রণয়কুমার হস্ত প্রসারিত করিলেন। অনুমানে ভর করিয়া বিমল হাত বাড়াইতে, করমর্দ্দন করিয়া 'ভেরী গ্লাড টু মিট ইউ' বলিয়া, প্রণয় ছায়াকে বলিল, তোমার মাকে ডাক্, একটা নেমন্তন্ন ক'রে যাই।

—কিসের নেমন্তন্ন প্রণয় দা ? তোমার বিয়ে নাকি ? কবে ? কোথায় ? তোমার নবীনা জীবনসঙ্গিনীর কথা বল কিছু, শুনি, আমি আগেই কন্‌গ্রাচুলেট, করছি।

—না, না, ওসব নয়, ওসব নয়। আমাদের বাড়ীর ছেলেরা আমার লেখা একটা নাটক্ প্লে করবে, তারই নেমন্তন্ন।

—পুওর নেমন্তন্ন ! আমি কোথায়—

—মা'কে ডাক, আমার এখনও অনেক জায়গায় যেতে হবে।

—মা এখনি আসবে প্রণয় দা, তুমি বস না। ঐ বুঝি কার্ড? দেখি, বলিয়া ছায়া প্রণয়ের হাত হইতে খামে বন্ধ কার্ড একখানি টানিয়া লইয়া দেখিতে লাগিল; পরে বলিল, প্রণয় দা, মিঃ রায়কে তুমি আসতে বলবে না?

কবি বা সাহিত্যিক যশঃপ্রার্থীর নিকট ইহাপেক্ষা প্রিয় কার্য্য হইতে পারে না, প্রণয় সাগ্রহে বলিল, নিশ্চয়! সাদা কার্ড আমার সঙ্গেই রয়েছে, নামটা বল ত ছায়া?

বিমল অস্পষ্ট স্বরে ছায়ার উদ্দেশ্যে কহিল, আমাকে কেন আবার? আমি ও সবের কিবা বুঝি?

ছায়া সে কথায় যেন কর্ণপাত না করিয়াই বলিল, সুবিমল রায়, এম-এ।

প্রণয় কার্ডে নাম লিখিয়া, আবার খামে ভরিয়া, খামের উপরে নাম লিখিয়া বিমলের হাতে দিয়া বলিল, আসবেন কিন্তু।

ছায়া উঠিয়া গিয়া প্রণয়ের কাঁধের কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, প্রণয় দা, শোন, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

প্রণয়কে লইয়া ছায়া বাহির হইতে উদ্যত হইয়াছিল, বিমল দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, আজ ত আর তুমি পড়ছ না, আমি যাই।

—কাল আসচেন ত? আচ্ছা, শুভরাত্রি।

উভয়কে নমস্কার করিয়া বিমল ত্রস্তপদে বাহির হইয়া গেল। তখন সেই ঘরেই ইহাদের গল্প জমিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সংসারের ভার পাইয়া ইন্দু যেন বাঁচিয়া গিয়াছে। এই কাজে যে এত আনন্দ ও মাদকতা ছিল, তাহা কোনদিন সে ধারণাতেও আনিতে পারিত না। ঠাকুর, চাকর, ঝি, আশ্রিত, প্রতিপাল্য সকলেই তাহার পানে চাহিয়া আছে; তাহার আদেশ পালন করিবার জন্য, তাহার নিকট একটু আদর, একটু যত্ন পাইবার জন্য সকলেই উন্মুখ হইয়া আছে। ইন্দুও সমস্ত ভার এমন ভাবে হাতে তুলিয়া লইয়াছে, কোথায় এতটুকু ফাঁকও থাকিতে দেয় নাই। ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিবার ভারও সে নিজের হাতে লইয়াছে।

ইহাতে ইন্দুর লাভও হইয়াছে অনেক। সময় যে কোথা দিয়া, কেমন করিয়া স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যায়, তাহা সে বুঝিতেও পারে না। মাও একেবারে বদলাইয়া গিয়াছেন। আগে এই খামখেয়ালী মেয়েটার উপর তিনি প্রায়ই অপ্রসন্ন থাকিতেন, এখন তাঁহার মুখখানি সর্ব্বদাই প্রসন্নতামণ্ডিত। ইন্দু যেন বাঁচিয়া গিয়াছে।

কিন্তু দিনের আলো যখন নিভিয়া আসে, স্কুল-কলেজ-প্রত্যাগত ছাত্রদল, কর্ম্মান্তে শ্রমক্লিষ্ট শুষ্কমুখ কেরাণীবাবুরা কেহ বাজারের পুঁটলী হাতে, কেহ কাগজে জড়ান টিফিনের বাক্স হাতে সামনের রাস্তা দিয়া গৃহে ফিরিয়া যান, দিনের কাজ শেষ করিয়া ফেরিওয়ালারা শ্রান্তকণ্ঠে হাঁকিয়া হাঁকিয়া চলিয়া যায়, রাস্তার ধারের গ্যাসের আলো অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠে, পথ জনবিরল হইয়া পড়ে, তখন আর ইন্দু আপনাকে সম্বরণ করিতে পারে না। সেদিন তাহারা গৃহে ছিল না, বিমল আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে কি না জানে না, তারপর-দিন হইতে রোজই অপরাহ্নে সর্ব্ব কর্ম্ম

ফেলিয়া ইন্দু বারান্দাটিতে আসিয়া সেলাই লইয়া, পথের উপরে চক্ষু পাতিয়া বসিয়া থাকে, চক্ষু ভরিয়া অবসাদ আসে, নিরাশার পীড়নে বুকের ভতরটা যেন কাঁদিয়া উঠে।

বিমলকে সে শিশুকাল হইতে জানে। কথা দিয়া কথা রাখে না, এমন ঘটনা কখনও ঘটে নাই। সে-যে কথা দিয়াও আসে না, শুধু চোখের দেখাটাও দেয় না, ইহার যে অন্য কোন কারণ থাকিতে পারে ইন্দুর একবারও তাহা মনে হইল না। পুরুষ মানুষ, কাজ-কর্ম্মের চেষ্টায় ঘুরিতে হয়, পাঁচজনের সঙ্গে দেখা করিবার দরকার হয়, এ সকল কথা একবারও মনে উঠিল না! তাহার নিজের মনের মাপকাঠিতে বিচার করিয়া ইহাই তাহার মনে হইতেছিল, যত কাজ থাক আর যত দরকারই থাক, বিকালের এই সময়টুকু কোন কাজ, বা কোন দরকারই বিমলকে আটকাইতে পারিবে না। পৃথিবীতে কাজই বড়, ভালবাসার দাবীকে তাহার মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়, এ জ্ঞানটুকু ইন্দুর ছিল না। বিমল যে আসে নাই, আসিতেছে না, তাহার মূলে অন্য কোন কারণের কথা তাহার একটিবারও মনে পড়িল না। সে নিঃসন্দেহে ভাবিল, বিমলের অসুখ করিয়াছে, তাই সে আসে না।

খবর লইবার কোন উপায়ই নাই। চিঠি লিখিতে সাহস হয় না। বিমল পছন্দ করিবে না। যাইয়া দেখিয়া আসিবে, সে সম্ভাবনাও নাই। অসুখের কথা যত ভাবে মন তত বিচলিত হয়। সে যেন মনশ্চক্ষুতে দেখিতে পায়, ধূমমলিন প্রায়ান্ধকার গৃহের একটি অপরিষ্কৃত বিছানায় পড়িয়া রোগ-যন্ত্রণায় বিমল ছটফট করিতেছে, শিয়রে তাহার মাতা একাকী। কে ডাক্তার ডাকিবে, কে ঔষধ আনিবে, ডাক্তারের ভিজিট

কোথা হইতে আসিবে, ভাবিতে ভাবিতে ইন্দুর চোখে জল আসিয়া পড়িল।

পাচক আসিয়া ডাকিতে তাহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিল। বাহিরে তাসের আসর বসিয়াছে, চা, জলখাবার, পানের তলব পড়িয়াছে, ইন্দু চোখের জল সামলাইয়া নীচে চলিয়া গেল। মা হলঘরে আছেন, কর্ত্তাও সেখানে, তাই সে পথে না গিয়া, ঘুরিয়া অন্য পথ ধরিয়া নীচে নামিল। সে রাত্রে আহারে তাহার রুচি হইল না। আহার্য্যের সামনে বসিতেই সেই দৃশ্য তাহার মনের চোখে ভরিয়া ভাসিয়া উঠিল। হয়ত ঔষধ পেটে পড়ে নাই, হয়ত পথ্যাভাবে সে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ইন্দু পিতার প্রতীক্ষায় জাগিয়া রহিল, কিন্তু এমনই বিপাক, রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরেও তাস শেষ হইল না। অনেক বকা-ঝকা করিয়া ইন্দুকে শুইতে পাঠাইয়া গৃহিণী শুইয়া পড়িলেন।

ভোর বেলা উঠিয়া,মুখ হাত ধুইয়া, বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া, ইন্দু পিতার সন্ধানে আসিয়া জানিল, পিতা খুব ভোরেই বাহির হইয়া গিয়াছেন; এবেলা ফিরিবেন না, আফিস ফেরৎ একেবারে সন্ধ্যাবেলা গৃহে ফিরিবেন।

মধ্যাহ্নের পর আবার যখন অপরাহ্ন আসিয়া পড়িল, ইন্দুর মন আগে-কার যা-কিছু গড়া, সব ভাঙ্গিতে বসিল। বোধ হয় বিশেষ কোন কাজে ক'দিন আসিতে পারে নাই, আজ ঠিক আসিবে। মন উৎসাহ দেয়, আবার নিরাশও করে। আশা ও নিরাশা, উৎসাহ ও অবসাদের মধ্য দিয়াই অপরাহ্ণ যখন উত্তীর্ণ হইতে চলিল, বিলীয়মান দিনের আলো পথচারীদের অস্পষ্ট করিয়া ফেলিল, তখন ইন্দুর মুখখানিতে অন্ধকার

পরিব্যাপ্ত। মন আবার সেই সদ্যঃ ভাঙ্গা কথাই ভাবিতে বসিল, নিশ্চয়ই সে অসুস্থ।

তবু কি মন আশা ছাড়ে! হয়ত কাজের মধ্যে বিলম্ব হইয়া গিয়াছে তাই দেরী হইয়াছে, এইবার আসিবে এ আশাও কি কম! পাছে বারান্দা হইতে স্বল্পালোকে তাহাকে দেখা না যায়, ইন্দু বাগানে গেল। বাগান ফুলে ফুলে ফুলময়, রূপে, গন্ধে মাতোয়ারা। ফটকের সামনে এক ঝাড় সৌজন-ফ্লাওয়ার ফুটিয়া পথিক মাত্রেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট করিত। ইন্দু সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। যাহারা শুধু ফুল দেখিতে দেখিতে পথটি অতিক্রম করে, আজ ফুলের মাঝে ফুলরাণীকে দেখিয়া তাহাদের অনেকের চলচ্ছক্তি হ্রাস পাইল; কাহারও কাশি আসিল; কেহ একবার গিয়া, আবার ফিরিল, আবার গেল। পথিকের লোলুপ দৃষ্টির সম্মুখে এ-রকম ভাবে দাঁড়াইয়া থাকা যে কত বড় নির্লজ্জতা, ইন্দু যে তাহা বুঝিতেছিল না, তাহা নহে, হায়, মন যে তবু প্রলুব্ধ করে! নিরাশা যে কেবলই আশা জাগায়!

ঘনান্ধকার ধরিত্রীকে আছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। আর আশা নাই ভাবিয়া যে মুহূর্ত্তে ইন্দু গৃহগমনোদ্যত হইল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে পশ্চাদ্দিক হইতে প্রচণ্ড আলো পড়িয়া বাগানটিকে সচকিত করিয়া তুলিল ও মোটরের হর্ণ বাজিয়া উঠিল। ইন্দু ত্বরিত গতিতে চলিয়া যাইতেছিল, আরোহী ডাকিলেন, ইন্দু!

সমুদ্রমন্থনে যত হলাহল উঠিয়াছিল, সেই সমস্ত হলাহল যদি নীলকণ্ঠের মত আমার লেখনী-কণ্ঠে ভরিয়া লইতে পারিতাম, তাহা হইলেও এই মোটর, এই মোটর-আরোহী ও তাহার সাদর আহ্বানে ইন্দুর মনের

হলাহল সম্যক্ বর্ণনা করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ। কিন্তু সে এক মুহূর্ত্তের জন্য!

মোটর থামাইয়া আরোহী যখন দ্বিতীয় বার আহ্বান দিলেন, ইন্দু ফিরিয়া দাঁড়াইল, দুই হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

আরোহী প্রণয়।

—বৌদি আসতে পারলেন না, নেমন্তন্ন করতে বেরুলেন। আমারও অনেক যায়গায় দরকার ছিল, কিন্তু ভাবলুম, তোমাদের কথা দিয়েছি আসব, দেখা করে যাই।

ততক্ষণে ইন্দু আপনাকে সংযত করিয়া ফেলিয়াছে। মৃদুস্বরে কহিল, চলুন, মা ওপরে।

প্রণয় পুষ্পিত তরুলতার পানে চাহিতে চাহিতে বলিলেন, তোমার বাগানটি দেখলে আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। এত যায়গায় ত যাই, এমন সাজান ফুলের বাগান একটিও দেখি নে।

দরোয়ান বাগানের আলো জ্বালিয়া দিয়াছিল।

ইন্দু বলিল, এখানেই বসবেন? বেশ ত, মালী চেয়ার আনুক না। —মালীকে ডাকিতে গিয়া থামিল, আবার বলিল, কিন্তু মা ত' এখানে বসতে পারবেন না। বাবার তাসের আড্ডার বাবুরা সব এখনই আসতে আরম্ভ করবেন।

প্রণয় কহিলেন, তোমার মা বুঝি এখানে আসেন না? 'তোমার', 'তোমাদের' শব্দগুলা ইন্দু লক্ষ্য করিয়াছিল, প্রথমটা একটু খারাপও লাগিয়াছিল কিন্তু স্বপক্ষে এই যুক্তিই সে মানিয়া লইল, মা'র আবুদি'র দেবর, বয়সেও বড়, হাকিম লোক, 'তুমি' সম্ভাষণে দোষ নাই।

বলিল, অন্য সময়ে আসেন, এখন আসবেন না।

প্রণয় বলিলেন, কিন্তু এ জায়গাটা চমৎকার! ফুল অনেক বাগানে ফোটে, হয়ত বেশীও ফোটে; কিন্তু এমন ক'রে সাজাতে কেউ পারে না।

আর একবার সমস্ত বাগানখানি দেখিয়া লইয়া প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, এ তোমারই কাজ ব'লে মনে হচ্ছে। তাই না?

ইন্দু নতমুখে বলিল, প্রথম বছর মা দেখিয়ে দিয়েছিলেন, তারপর থেকে আমিই করাই মালীদের দিয়ে।

আর একজন তাহার রুচিজ্ঞান, সৌন্দর্য্যবোধ, শিল্পপ্রতিভা দিয়া ইন্দুকে সাহায্য করিত, এ বছরও করিয়াছিল। প্রত্যেকটি তরুলতায়, ফুলে পাতায় তাহার যত্ন আজও রূপ ধরিয়া আছে। মনে পড়িয়া ইন্দুকে বিষণ্ন করিয়া তুলিল।

বলিল, আপনি উপরে চলুন।

—চল, বলিয়া প্রণয়কুমার অনিচ্ছাসহকারে চলিতে লাগিলেন। সিঁড়ির কাছে আসিয়া বলিলেন, তুমি যে ড্রাইভিং শিখবে বলেছিলে।

—আমি বলেছিলুম!

—সেদিন বললে না, শিখলে হয়!

ইন্দু হাসিয়া বলিল, ওঃ, তাই!

—ওন্‌লি হাফ্ এন আওয়ার ইজ কোয়াইট্ সাফিসিয়েন্ট।

—কিন্তু আমার যে এখন অনেক কাজ!—থামিয়া তখনই আবার বলিল, আসুন ত ওপরে।

মা'র কাছে পৌঁছাইয়া দিয়া ইন্দু চলিয়া গেল। চা, খাবার প্রস্তুত

করাইয়া, নীচে তাসের আড্ডায় ও উপরে প্রণয়কে পাঠাইয়া দিয়া, ঠাকুরকে রান্নার কাজ সব বুঝাইয়া দিয়া সে যখন উপরে আসিল, তখন রাত্রি প্রায় আটটা।

প্রণয় উঠিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, ইন্দুকে দেখিয়া আবার বসিলেন।

ইন্দুর মা হাসিয়া বলিলেন, ইন্দু আজকাল আমাদের ঘরের অন্নপূর্ণা হয়েছে, বুঝলেন প্রণয় বাবু! রান্না-বান্নার ব্যবস্থা করা, লোকজনকে খাওয়ান-দাওয়ান, সমস্ত কাজ ইন্দুই করে।

প্রণয় কুইনিন খাওয়ার মত ভাবে বলিলেন, সে ত খুব ভাল।

মেয়ের মা'রা মেয়ের গুণ-বর্ণনা করিবার সুযোগ বা অবসর পাইলে কৃতার্থ হইয়া থাকেন। ইন্দুর মা'ও মা। বলিতে লাগিলেন, কলকাতার বড়লোকদের মেয়ের মত কেবল সাজপোষাকের ঠমক নিয়ে আমার মেয়ে থাকে না। আমার এত বড় সংসারটি নিজের ঘাড়ে নিয়ে ও যেমনটি চালাচ্ছে, অনেক বড়লোকের বাড়ীর মেয়ে কেন, মেয়ের মা'রাও পারে না।

নিজের প্রসঙ্গটা পরিবর্ত্তিত করিবার মানসে ইন্দু প্রণয়কে জিজ্ঞাসা করিল; আবু মাসি কোথায় গেছে বললেন?

প্রণয় বলিলেন, পরশু সারস্বত সম্মেলন, তারই সব নেমন্তন্ন সারতে গেছেন বোধ হয়। তোমরা আসছ ত?

ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, ক'টায় সময় হবে?

—বিকেল-পাঁচটায় আরম্ভ হবার কথা। একটু দেরীও হতে পারে। আট-টায় ভাঙবে।

ইন্দু কথা বলিল না। বিকেলে বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না।

প্রণয়বাবু দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, আজ তা' হলে উঠি।

ক্ষণা ও ইন্দু তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নামিতেছিল, সিঁড়িতে আসিয়া প্রণয় বলিলেন, আজ ত খুব হল! কাল আসব, বেরুবে?

ইন্দু সাশ্চর্য্যে কহিল, কোথায় বেরুব?

প্রণয় বলিলেন, ড্রাইভিঙে।

ক্ষণপ্রভা সোল্লাসে কহিল, হাঁ হাঁ, আসবেন, আসবেন। আমি শিখব।

প্রণয়কুমার ইন্দুর মুখের পানে সাগ্রহ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বল ইন্দু, কাল আসব?

স্থানটি অত্যুজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত। সেই আলোকে প্রণয়ের দৃষ্টিটাকে ইন্দু সহজ বলিয়া ভাবিতে পারিল না। যেন কত মিনতি ভরা, যেন বড় আগ্রহে আকুল। তা' ছাড়া, যেন সে দৃষ্টিতে আরও কিছু ছিল। সেই কিছু কি, তাহা ইন্দু বুঝিল না। তা না বুঝুক, তাহাকে 'না' করিতেও পারিল না। বলিল, আসবেন বৈকি!

প্রণয় আরও পরিষ্কার উত্তর চাহেন; বলিলেন, যদি বল, তবে আসি।

ক্ষণপ্রভা বলিয়া উঠিল, দিদিটা ভীতু; আমি একটু একটু জানি। আমাকে আপনি ভাল করে শিখিয়ে দেবেন।

প্রণয়ের দৃষ্টি তখনও ইন্দুর আননে নিবদ্ধ। ইন্দুকে নীরব থাকিতে দেখিয়া ক্ষণপ্রভা তাহাকে একটি ধাক্কা দিয়া বলিল, বল্ না দিদি।

ইন্দু হাসিয়া বলিলেন, বল্লুম ত!

—কি বল্লে?

—আসবেন। দেখব চেষ্টা করে।

প্রণয়ের মুখ উজ্জল হইয়া উঠিল, কহিলেন, থ্যাঙ্ক ইউ! দুদিন চেষ্টা কর, তা হ'লেই হয়ে যাবে।

ইন্দু সহাস্যে কহিল, আমি তা বলি নি। আমি বলছি, কাজকর্ম্ম সেরে রাখবার চেষ্টা করব।

—তাই করে রেখ। আমি বরং খানিক আগেই আসব।

ত্রস্তা হরিণীর মত ইন্দু বলিল, না না, তার আগে নয়, তা হ'লে একেবারেই হবে না।

—বেশ। আজ যে সময় এসেছিলুম, সেই সময় এলে অসুবিধে হবে না ত?

—না। কিন্তু মাকে বলেছেন?

—না, এখনও বলা হয় নি। তার দরকার আছে? বেশ, কালই বলব।

উপরে উঠিবার আগে ইন্দু বাবার খানসামাকে ডাকিয়া খবর লইয়া জানিল, খেলা মোটে আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম হইতেই বাবু হারিতেছেন; মহেন্দ্রবাবু জিতিতেছেন।

ইহা হইতে অনুমান করা শক্ত ছিল না যে আজও রাত্রি দ্বিতীয় যামের এধারে খেলা শেষ হইবে না। হারিলে হেরম্বনাথের এমন জেদ চাপে যে যদি সারা রাত এমনি কাটিয়াও যায়, না জিতিতে পারিলে খেলার শেষ হইবে না। কতদিন এমন হইয়াছে, সন্ধ্যার আড্ডা পরের দিন আপিসের বেলা হইলে তবে ভাজিয়াছে। মধ্যে নামমাত্র খাওয়া-দাওয়া হইয়াছে, কেবল চা পান ও তামাকের বিরতি ছিল না।

যদি সকাল সকাল খেলা ভাঙে, সে যেন খবর পায়, খানসামাকে এই

নির্দ্দেশ করিয়া উপরে চলিয়া গেল। গৃহিণী তারই প্রতীক্ষায় বসিয়া ছিলেন, বলিলেন, আবু-দি জিজ্ঞেস করে পাঠিয়েছে, তুই কি ওদের সভায় একখানা গান করতে পারবি?

ইন্দু আকাশ হইতে পড়িয়া বলিল, আমি! তাহার মুখে এমনই একটা হাসি ফুটিয়া উঠিল. যাহা সহজেই বুঝাইয়া দিল যে এর চেয়ে অসম্ভব ব্যাপার আর কিছু হইতে পারে না।

গৃহিণী বলিলেন, আমিও তাই বলেছি।

ইন্দু সাশ্চর্য্যে কহিল, তুমি আবার কি বললে?

বললুম, ইন্দু গান-টান বড় করে না।

ইন্দু খুশী হইয়া বলিল, বেশ করেছ মা!

গৃহিণী কহিলেন, প্রণয় বলছিলেন, ওঁর নাটকের চাষা এসে যখন বাঙলা দেশের কথা বল্‌ছেন, সেই সময় উইংস-এর ওধার থেকে একটা গান যদি কেউ গায়, খুব ভাল হয়। উনি গান লিখেওছেন। তাই বলছিলেন, ইন্দু যদি গানখানা গাইতে রাজী থাকেন, কাল এসে তিনি সুরটা ঠিক ক'রে দিয়ে যেতে পারেন।—বলিয়া গৃহিণী কন্যার সম্মতির আশায় তার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

ইন্দু বলিল, রক্ষে কর মা, একে ত আমি, তায় গাওয়া ছেড়ে দিয়েছি, তার ওপর নূতন গানে সুর দিয়ে—হয়েছে আর কি!

—বলছিলেন, ইন্দু যদি না গান্, তা হ'লে কোন ছেলেকে দিয়ে গাওয়াবেন। সে জায়গায় একটি গান হলে খুব ভাল লাগবে।—একটু থামিয়া আবার বলিলেন, কোন্ জায়গাটা তোর মনে আছে ত ইন্দু?

হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, সেই যে—

"আমি দেখি পাহাড় থেকে জল নেমে আসছে কাঁতে। নদী সেই জল বুকে ধরে তর্ তর্ বেগে কুলু কুলু রবে গান গাইতে গাইতে বয়ে যাচ্ছে আমার জমির পাশ দিয়ে। জমি শুষে নিচ্ছে তার রস। আমাকে দিচ্ছে ফুল, ফল, শস্য। আমার মরাই-ভরা ধান, ক্ষেত-ভরা ফসল, গাছ-ভরা ফল, পুকুর-ভরা মাছ; আমার গোয়াল-ভরা গরু, ঘর-ভরা ছেলে-মেয়ে। ভোরে পাখীরা গান গেয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়, সন্ধ্যেয় তারা গান গেয়ে বিশ্রাম করতে ব'লে যায়। আমার ঘরের পাশে নদী, তার পাশে লতায় পাতায় ঘেরা মালঞ্চ। দিনের শেষে কর্ম্মান্তে পালঙ্কে ব'সে বাঁশের বাঁশীতে আমি বাজাই ইমন। এই আমার দেশ, এই আমার বঙ্গভূমি!"

—ও জায়গাটা আমার মুখস্থ হয়ে গেছে মা।

গৃহিণী ভাবগদগদস্বরে বলিলেন, শুনতে শুনতে গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে ওঠে।

ইন্দু বলিল, মনে হয়, আমাদের বাঙলা দেশকে চোখের সামনে দেখছি। খুব সুন্দর ঐ জায়গাটা।

ক্ষণপ্রভা বলিল, সেইটে আরও ভাল—

"লিখিবে পড়িবে
মরিবে দুঃখে
আর মৎস্য ধরিবে
খাইবে সুখে।"

ইন্দু তাহার পিঠে গুম্ করিয়া একটা কিল বসাইয়া দিয়া বলিল, প্রা[illegible] তোমার মনের কথা কি-না!

ইন্দুর মা বলিলেন, ছোট্ট ছেলেটি করেছিল কিন্তু বেশ। মাথায় ম[illegible]

পাগড়ী, হাতে লম্বা হুইল ছিপ, কেউ বলছে লেখা পড়ার কথা, কেউ বলছে চাষের কথা, কেউ বলছে কল-কারখানার কথা; সে ঘাড় নাড়ছে আর বলছে—

ক্ষণপ্রভা মা'র মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল—

"লিখিবে পড়িবে মরিবে দুঃখে
আর মৎস্য ধরিবে খাইবে সুখে।"

ইন্দু বলিল, সব ছেলেই ভাল করেছে, না মা?

—হ্যাঁ। নাটকটি ভাল, কথাগুলি মিষ্টি—

—চমৎকার!

ইন্দুর মা' মনস্তত্ত্বের ছাত্রী ছিলেন না, তাহা আমরা জানি; তবুও, গুণগ্রাহিতা যে অনেক ক্ষেত্রে সুফল প্রসব করে ইহা তাঁহার অজানা ছিল না; ইন্দুর মুখে নাটকের উচ্চ প্রশংসা শুনিয়া একদিকে যেমন অপার আনন্দ হইল, সেই সঙ্গে আশার সুবর্ণ-দীপটিও হৃদয়মধ্যে প্রজ্জলিত হইল। সুপাত্রে কন্যা সমর্পণ করিতে না চায় কে? প্রণয় সুপাত্র এবং সৎপাত্র! নামেই দোজবরে, একটা কাঁটাও নাই, তাহার যে বয়স সে বয়সে অনেকে দার-পরিগ্রহই করে না। রূপ, গুণ, অর্থ, বিত্ত, পদ, মান, এমন সমন্বয় সচরাচর দেখা যায় না, আবুদি' বলিয়াছে, কত রাজা-রাজড়ার ঘর হইতে কথা আসিতেছে, তাহার দেবর রাজী নয়। পাস-করা মেয়ে অনেক পাওয়া যায়, প্রণয় সে সবও পছন্দ করে না; বিলাতফেরৎ সমাজেও তাহার দারুণ অরুচি, যাহারা বিলাত যায় নাই তাহাদিগকে বিলাত-ফেরতদিগের কন্যারা মানুষ বলিয়াই গণ্য করে না। দাম্ভিকা মেয়েরা প্রণয়ের কাছে পাত্তা পায়না! সে নিজে সাদাসিধা কবি লোক, সাদাসিধা মেয়ে পাইলে

পুনরায় বিবাহ করিতে পারে, নতুবা চাকরী-বাকরী, সাহিত্য ইত্যাদি লইয়াই সে থাকিবে। আবুদি' আর একটি কথা বলিয়াছেন, ইন্দুর রঙটি তেমন ফর্সা নয়, নাকটিও একটু বড় ; চোখ দুটাও খুব ভাসা-ভাসা নয়, তবু পাঁচশ' মেয়ের মধ্যে প্রথম দৃষ্টিতে, ইন্দুকেই ঠাকুরপোর মনে ধরিয়াছে, তাহার কারণ ইন্দুর অটুট স্বাস্থ্য। বাঙলাদেশের কোন্ মেয়ে ইন্দুর মত স্বাস্থ্যবতী ?···ঠাকুরপোর নিজের স্বাস্থ্য যেমন, যাকে ও বিয়ে করবে, তার স্বাস্থ্যও তেমনই হওয়া চাই। ইন্দুকে দেখেই ত ওর মন পড়ে গেল। নইলে সুন্দরী মেয়ের অভাব কি ! আর ঠাকুরপো টাকা-পয়সাও চায় না। কিছুই না—ও চায় সেই মেয়েটি, যে মেয়ে রোগের ডিপো নয়। একবার ঠকেছে কি না, সে বউটা এসেছিল, জন্মরোগা। তিনটে মাসও বাঁচল না।

সকাল হইবা মাত্র ইন্দু পিতাকে ধৃত করিল। হেরম্বনাথ গড়গড়ায় তামাক টানিতেছিলেন, ইন্দু কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই বলিলেন, ভাল কথা, বিমলের একটি কাজ হয়েছে।

মেঘে যেমন দামিনী খেলে, বর্ষাকালে মেঘের মধ্য হইতে যেমন চন্দ্র বাহির হয়, ইন্দুর মুখও তেমনই হাসিয়া উঠিল। পিতার ইজিচেয়ারে ভর দিয়া, তাঁহার কেশবিরল মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে ইন্দু মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, কি কাজ ?

—কি কাজ ! তা'ত কৈ বললে না।

—তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ?

—হ্যাঁ হয়েছিল বৈ কি ! শেয়ার-মার্কেটে গিয়ে বলে এল যে আমায়।

—কি কাজ তা তুমিও জিজ্ঞাসা করলে না !

হেরম্বনাথ চিন্তিত মুখে বলিলেন, ভুল হয়ে গেল মা! তাইত!

ইন্দুর হাসি পাইতেছিল, সেই 'তাইত!' এলোপ্যাথি ঔষধশাস্ত্রে ক্যাষ্টর অয়েল যেমন, হেরম্বনাথের কথার মধ্যে ঐ 'তাইত'টি তেমন! কত জটিল জটিল সমস্যার সহজ সমাধান যে ঐ একটি মাত্র 'তাইত' দ্বারাই হইয়া যায়, তাহা তাঁহার আত্মীয়-বন্ধু সবাই জানে।

ইন্দু হাসিয়া বলিল, তোমায় কবে বললে বাবা?

হেরম্বনাথ বলিলেন, তা তিন চার দিন হবে। হ্যাঁ, তা হবে বৈ কি!

—তা তুমি এতদিন বলনি কেন?

—বলি নি, না? ভুল, ভুল! আর ভুলের দোষই বা কি! মহেন্দরটা তিনদিন ধরে যে রকম মাৎ করছে—

ইন্দু মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসিল, মা'কে বলবে না বাবা?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলতে হবে বৈকি! কৈ, তিনি গেলেন কোথা?

—থাক্ বাবা, মা'কে এখন বলবার দরকার নেই! সব খবর যখন জানা নেই—

—তা বটে।

—আর নিজে এসে বললে মা খুশী হবেন।

হেরম্বনাথ আগাগোড়া সব ভুলিয়া, খেই হারাইয়া বলিয়া বসিলেন, সেও বুঝি বলে নি তোদের কাছে?

—কে?

—কে কিরে, বিমল, বিমল! বিমল তোদের কিছু বলেনি?

ইন্দু নতমুখে বলিল, সে কি আমাদের বাড়ীতে আসে যে বলবে! কেন, তুমি ত তা জান বাবা!

হেরম্ব বলিলেন, তাই ত! খবরটা ত তা হ'লে—

বাধা দিয়া ইন্দু বলিল, তার দরকার নেই বাবা!—বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল। যে কথাটা তাহার গলার মধ্যে কুণ্ডলী পাকাইয়া কণ্ঠরোধের উপক্রম করিতেছিল, তাহা এই যে, কাজের খবরটা সব চেয়ে দামী কাহার কাছে? কিন্তু মনে পড়িতেই, চোখে জল আসে কেন?

অষ্টম পরিচ্ছেদ

যথা সময়ে ছায়ার পাঠকক্ষের দ্বারসম্মুখে দাঁড়াইয়া বিমল বলিল, আমি আসব?—কোন উত্তর না পাইয়া সে আবার প্রশ্ন করিতে উদ্যত হইলে, ছায়ার 'কাজিন' সমীর আসিয়া পর্দাটা একটু ফাঁক করিয়া ইংরাজীতে কহিল, আমি বড় দুঃখিত; ছায়া অত্যন্ত অসুস্থ।

বিমল প্রশ্ন করিল, কি হয়েছে?

এই সময়ে, কক্ষমধ্যে ছায়া কাহাকে বলিল, 'না, না, ওকে ডাক।

সমীরের সমবয়সী, সমবেশী একটি যুবক পর্দার আর একটা দিক ফাঁক করিয়া বলিল, আপনি আসুন, ছায়া ডাকছে।

বিমল কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, কক্ষটির জানালাগুলি বন্ধ—অন্ধকার; লম্বা কৌচটার উপরে ছায়া এলায়িতভাবে শুইয়া; তাহার মাথায় জলপটি; ঘরখানি ল্যাভেণ্ডারের গন্ধে আমোদিত। ছায়া চক্ষু মুদিয়া শুইয়াছিল, পদশব্দে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া বলিল, গুড-আফ্‌টারনুন, আসুন। বসুন। বড্ড মাথা ধরেছে মিষ্টার রায়। সকাল থেকেই—

সমীর ও অপর যুবকটি ছায়ার দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল, সমীর বলিয়া উঠিল, কিন্তু তুমি কথা ক'য়ো না ছায়া!

—কেন, কথা কইলে কি হবে! কাল অনেক রাত্রে প্রণয় মামা এসে ড্রাইভিঙে নিয়ে গেলেন, ফিরতে প্রায় বারটা বেজে গেছল, এসে ঘুম হ'ল না, ভোর বেলা বিছানা থেকে উঠতে গিয়ে দেখি, মাথাটা ধরে গেছে। তাই থেকে বেড়েই চলেছে।

বিমল শুনিতেছিল কি না তাহা বলা যায় না; ছায়া থামিলে বলিল, তা হলে আজ পড়তে পারবে না?

সমীর ও তাহার বন্ধু সমস্বরে বলিয়া উঠিল, একেবারে অসম্ভব।

ছায়া কোন কথা বলিল না দেখিয়া বিমল বলিল, তা হ'লে আমি যাই।

—কিন্তু আপনি চা খাবেন না?

—বাড়ী গিয়ে খাব।

—না, বয় চা আনুক। সমীর, বল না ভাই বয়কে চা আনতে।

—বলছি, বলিয়া সমীর বাহির হইয়া গেল।

বিমল চা-জলখাবার এখানেই খাইত। গৃহকর্ত্রী মিসেস্ ঘোষ স্বয়ং সে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, বিমলের আপত্তি তিনি গ্রাহ্য করেন নাই। তাঁহার ব্যবস্থায় কন্যার জন্য যে সমস্ত আহার্য্য আসিত, শিক্ষকের জন্য অবিকল তাহাই আসিত; কোন পার্থক্য থাকিত না। বিমল ইহাতে অন্তরে কুন্ঠিত হইত কিন্তু গ্রহণ না করিয়া উপায় নাই।

সমীরের সঙ্গে চা ও আহার্য্যের ট্রে লইয়া বয় ও তৎসঙ্গে মিসেস্ ঘোষ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কন্যার কৌচের ধারে বসিয়া পড়িয়া মিসেস্ ঘোষ বলিলেন, মাথাটা ছাড়ল ছায়া?

এবারও সমীর ও অপর যুবাই উত্তর করিল, না মাসিমা! ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছে।

জননী কঠিন স্বরে কহিলেন, নিজের দোষে কষ্ট পাচ্ছে। কি দরকার ছিল বাবু অতো রাত পর্য্যন্ত ড্রাইভিঙে! তার ওপর সকালেই বললুম, একটা পারগেটিভ নিতে, তাও নিলে না। নাও, ভোগ এখন। পড়া-শুনো চুলোয় যাক্।

সমীর বলিল, একদিনে কি এমন ক্ষতি হবে মাসিমা!

মিসেস্ ঘোষ বলিলেন, যাদের কিছু কিছুও তৈরী থাকে, একদিনে তাদের ক্ষতি নাও হতে পারে, ছায়ার মত বিদ্বান মেয়ের একদিনেই যথেষ্ট ক্ষতি!

সমীর বলিল, কেন মাসিমা, ছায়া ত এদানী খুব প্রোগ্রেস্ করছে।

মিসেস্ ঘোষ যেন শুনেন নাই, এই ভাবে বলিতে লাগিলেন, যেমন শরীরের দিকে, তেমনি লেখাপড়ায় সমান নেগলিজেন্স! কি দরকার ছিল বাপু, অতো রাত্রে বেরুবার! বেরুলেই যদি, একটুখানি বেড়িয়ে ফিরে এলেই হোত! তা নয়, ভোগ এখনও সাতদিন। পড়াশুনো বন্ধ থাক।

ছায়ার মন ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহ করিতেছিল, কিন্তু এতগুলি লোকের সামনে বিদ্রোহ প্রকাশ করিতে তাহার লজ্জা হইতেছিল। অন্ততঃ মিঃ রায় না থাকিলে মা'কে বেশ দু'কথা শুনাইয়া দিত; এবং যে কথাটা তাহার ওষ্ঠাধরে নৃত্য করিতেছিল, সে কথা অনেকবারই সে বলিয়াছে। পড়াশুনা যখন বিবাহের জন্য এবং যেমন হউক বিবাহ একটা হইয়া গিয়াছে

দ্বিতীয়বার হওয়া সম্ভব নয়, তখন লেখাপড়া লেখাপড়া করিয়া অত হট্ট-গোল করিবার কোন সার্থকতাই ছায়া দেখিতে পায়—না। এই কথাগুলাই আজ কড়া করিয়া মা'কে শুনাইয়া দিবার ইচ্ছা তাহার ছিল। এই মেয়েরই মা ত! মেয়ের মুখ দিয়া তাহার মনের ভাব কতকটা অনুমান করিতে তিনি বোধ করি পারিয়াছিলেন, ভাব ও ভাষা নরম ও মোলায়েম করিয়া লইতে বিলম্ব হইল না, মা বলিলেন, ও শুয়ে কিছু হবে না। ওঠ, আমি বালিগঞ্জের লেকের দিকে যাচ্ছি, চল আমার সঙ্গে। মাথায় খানিক ঠাণ্ডা হাওয়া লাগলে মাথা সেরে যাবেখ'ন।—তারপর মেয়ের কাপড়-জামার পানে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, চেঞ্জ করবি নাকি!—আবার নিজেই বলিলেন, ভালই আছে, চেঞ্জের দরকার নেই।—নে, ওঠ!—বলিয়া বিমলকে বলিলেন, আপনিও চলুন না মিষ্টার রায়। বালিগঞ্জে একটু বেরিয়ে, আপনাকে ড্রপ ক'রে আসব'খন। আমি গাড়ী বার করতে বলছি—বলিয়া তিনি আর কাহারও পানে না চাহিয়া, কোন কথা না বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সমীর ও তাহার সঙ্গী যুবকটির মুখ দু'খানি কালো হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের মনের ভাব অনুমান করা কঠিন ছিল না। ছায়ার মাথাধরা উপলক্ষ করিয়া সন্ধ্যার আসরটি আজ যেভাবে জমাইবার কল্পনা করিয়া তাহারা উৎফুল্ল হইয়াছিল, তাহা সমাধিস্থ হইতে দেখিয়া দুঃখ অবশ্য হইবারই কথা; কিন্তু দুঃখ আরও অধিক হইয়াছিল এই ভাবিয়া যে মাসীমা তাহাদিগকে নেগলেক্ট করিয়া বেতনভোগী মাষ্টার মশাইটিকে সঙ্গী হইতে আহ্বান করিতে দ্বিধা করিলেন না।

মাথার জলপটিটা খুলিতে খুলিতে ছায়া বলিল, সমীর, তোমরা ঘুরে আসছ ত?

সমীর মুখখানা প্যাঁচার মত করিয়া বলিল, বলতে পারি না. দেখি!

অপরজন কহিল, তুমি ত এসেই শুয়ে পড়বে! আমরা এসে কি আর করব বল।

কিছুক্ষণ আগে ঘটা করিয়া শিরঃপীড়ার সেবায় এই ব্যক্তিই তনুমন সমর্পণ করিয়া ফেলিয়াছিল।

গাড়ী-বারান্দায় মোটরগাড়ী থামার সুগম্ভীর শব্দ হইল। ছায়া বিমলের দিকে চাহিয়া বলিল, চলুন মিঃ রায়!

বিমল ড্রাইভারের পাশে বসিতে যাইতেছিল, মিসেস্ ঘোষ নিজের দক্ষিণ পার্শ্বে স্থান দেখাইয়া বলিলেন, আপনি এইখানে আসুন। বিমল সসঙ্কোচে যতটুকু না হইলে নয়, ততটুকু স্থানে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল। ছায়া জননীর বামদিকে অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া পড়িল।

সমীরের বেবি-অষ্টিনখানা ফটকের বামপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল, দেখিয়া মিসেস্ ঘোষ জিজ্ঞাসা করিলেন, ওরা আছে বুঝি?

হাঁ না কেহই কিছু বলিল না।

ফাঁকা রাস্তায় পড়িয়া গাড়ী আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল।

ঘোষ কথা সুরু করিলেন, ছায়া অঙ্ক পারছে?

বিমল একটু মুস্কিলে পড়িল। সত্য কথা বলিলে বলিতে হয়, না। মিথ্যাভাষণে সে অনভ্যস্ত। বলিল, মনে হচ্ছে পারবেন।

পুনশ্চ প্রশ্ন—ক'দিনে কিছু এগিয়েছে?

প্রশ্ন অত্যন্ত অসুবিধাকর। বিমল পূর্ব্বের মত 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ' রূপ জবাব দিল, চেষ্টা করছেন বৈকি !

মিসেস্ ঘোষ বলিলেন, আপনি ওকে ম্যাট্রিকটা এ-বছরে পাস করিয়ে দিতে পারলে, আপনাকে রিওয়ার্ড দোব।

বিমল কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, রিওয়ার্ডের কথা কেন বলছেন, ওঁকে পড়াবার জন্যেই ত আমাকে রেখেছেন।

—রিওয়ার্ডের কথা কেন বলছি তা'ও আপনাকে বলি। কোন কারণে আমি চাই, ছায়া এই বছরই ম্যাট্রিক পাশ ক'রে ফেলে। সময় পেলে আই-এও পড়াব, আর যদি এর মধ্যে—কথাটা তিনি শেষ করিলেন না। করিলেন না, কেন না, বাহিরের লোকের কাছে সব কথা বলা সাজে না। তিনি বলিতে চাহিয়াছিলেন, আর যদি এর মধ্যে সেই বানরটা ফিরিয়া আসে, তখন দায় তাহার—তাঁহার নয়। বিমল যে সবই জানে, তিনি তাহা জানিতেন না।

বিমল বলিল, পরিশ্রম করতে পারলে এই ক'মাস সময়ই যথেষ্ট। তবে ওঁর শরীরও ত তেমন ভাল নয়।

ছায়া মোটরের ভাঁজবন্ধ হুডের উপর মাথা রাখিয়া চক্ষু মুদিয়া বসিয়া ছিল, বিমল তাহা দেখিয়া আবার বলিল, আজও যে রকম কষ্ট উনি পাচ্ছেন, দু'-একদিনে সেরে উঠতে পারবেন ব'লে মনে হয় না।

—সেই ত হয়েছে আরও মুস্কিল ! কাল আমাদের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে একটা চিলড্রেন্স থিয়েট্রিক্যাল শো আছে, যিনি অথার, তিনি ছায়াকে একখানা গান গাইবার জন্য ধ'রে পড়েছেন। ছায়া স্বীকারও

পেয়েছে, এখন এই মুস্কিল। আর এই ইলেভন্থ আওয়ার লাষ্ট মোমেণ্টে গাইব না বলা মানে সমস্ত শো'টাকে নষ্ট করা।

বিমল কোন কথা বলিল না। কেনই বা বলিবে? সীমার বাইরে চলা তাহার স্বভাববিরুদ্ধ।

আকাশে রঙের লীলাখেলা চলিতেছিল। পশ্চিম আকাশ ধূসর বর্ণের হাল্কা মেঘে আচ্ছন্ন, দিনান্তের শ্রান্ত রবি মেঘান্তরাল হইতে যেন অতীব করুণ নয়নে ধরিত্রীর নিকটে বিদায় মাগিতেছেন। পশ্চিম আকাশ লালে লাল হইয়া গিয়াছে, খণ্ড খণ্ড ধূসর মেঘগুলি লাল রঙ মাখিয়া ঘোলাটে দেহে দাঁড়াইয়া আছে। ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ লোককে আবীরে চর্চ্চিত করিলে যেমন দেখায়, মেঘখণ্ডগুলিকেও তেমনই দেখাইতেছে। আকাশের রক্তিমাভা আকাশ ছড়াইয়া, নিখিল ভুবনে, স্থলে জলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

মিসেস্ ঘোষ সোল্লাসে বলিলেন, আকাশের দিকে দেখ্ ছায়া।

—ভারি সুন্দর ত! গাড়ীটা একধারে রাখতে বল না মা!

হঠাৎ ছায়াকে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কথাগুলি বলিতে শুনিয়া তাহার মা যেমন, বিমলও তেমন প্রফুল্ল হইলেন। বিমল তাহার পানে চাহিতে দেখিল, পশ্চিম আকাশের আভা পড়িয়া ছায়ার মুখখানিকে অতীব সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে।

ছায়া মেয়েটি সুন্দর। আজকাল গল্প-উপন্যাসে রূপ-বর্ণনার রেওয়াজ নাই। বোধ হয় রূপ নাই বলিয়া বর্ণনার প্রথাও রহিত হইয়াছে। এখনকার দিনে রূপের আদর্শ ব্যক্তিগত ভাবে লোকের মনে আছে। তুমি যাহাকে ভাল বাস, তোমার কাছে সে সুন্দর; আমি যাহার প্রেমা-ভিলাষী, আমি তাহার রূপমুগ্ধ; তেমনই সে যাহাকে চায়, সে তাহার

রূপে মজিয়াছে, ডুবিয়াছে, হয়ত বা মরিয়াছে। আজকাল বোধ হয় এমনই চলিতেছে। তবুও, এই ব্যক্তিগত রূপাদর্শের গণ্ডীর বাহিরে রূপের প্রভাব কখনও কখনও বিস্তৃত হইয়া পড়ে। আজ এই মুহূর্ত্তের পূর্ব্বে বিমলের মনে ছায়ার রূপের কোন রেখাপাতই হয় নাই; আজ এইক্ষণে পশ্চিমাকাশের রঙে রাঙা সুগৌর মুখের পানে চাহিয়া বিমলের মনে হইল, মেয়েটি সুন্দরী। যে অশোককে সে জানে না, চেনে না, যাহার নাম ও কীর্ত্তিমাত্র সে জানিয়াছে, সে যদি বিলাতের মোহ পরিহার করিয়া দেশে ফিরিয়া আসে, রূপতৃষা তাহার অতৃপ্ত থাকিবে না।

বিমল যখন ঐ কথাগুলি চিন্তা করিতেছিল, তখন আর একখানি গৌরবর্ণ আনন তাহার মনে ভাসিয়া উঠিল। হয়ত সে'ও এই সময়ে তাহাদের অট্টালিকার পশ্চিমমুখী কাশ্মীরি বারান্দায় বসিয়া আছে, পশ্চিমাকাশের ঐ রাঙা রঙ তাহার মুখেও আসিয়া পড়িয়াছে! সে মুখ বড় পরিচিত, প্রত্যেকটি রেখার সঙ্গে বিমলের নিবিড়তম পরিচয়।

গাড়ী থামিয়াছিল! মাতাপুত্রী মুগ্ধ দৃষ্টিতে আকাশের বর্ণলীলা দেখিতেছিল, বিমল বলিল, ছায়া আজ আর পড়তে পারবেন না; যদি অনুমতি করেন, মা, আমি যাই।—'মা' বলিতে তাহার বড় বাধিতেছিল। এই বিলাতী চালচলন ও নব্যসমাজাস্তভু‍ক্ত রমণীদের মাতৃসম্বোধন করিতে সত্যই বাধে; বিমলেরও বাধিয়াছিল, কিন্তু বিমল সে বাধা অতিক্রম করিল।

ঐ শ্রেণীর অন্য রমণীরা কি ভাবিতেন, কি বলিতেন, কি করিতেন জানি না, মিসেস্ ঘোষের হৃদয়ে স্নেহ-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল, সস্নেহকণ্ঠে

কহিলেন, বাড়ী যাবে ত ? চল না বাবা, আমরা তোমাকে ড্রপ ক'রে দিয়ে যাই।

—আমি বাড়ী যাব না, আমার এক বিশেষ আত্মীয়দের—

—বেশ ত ! চল, সেইখানেই দিয়ে যাই। সে কোথায় ?

—ভবানীপুর।

—সে ত আমাদের পথেই পড়বে। চল, তোমায় সেইখানে নামিয়ে দিয়ে আমরা যাই। বিশ্বনাথ, ষ্টার্ট দেও।

লেক রোড ছাড়িয়া রসা রোড দিয়া গাড়ী যখন ভবানীপুরের দিকে ছুটিতেছিল, বিমল বলিল, থাক্‌গে, যাব না।

মিসেস্ ঘোষ হাসিলেন, বলিলেন, তবে চল, আমাদের ওখানেই।

—না, মা, আমি বাড়ীই যাই ! গাড়ীটা একবার থামাতে বলুন।

—চল, তোমার বাড়ী দেখে আসি।

বিমল অত্যন্ত কুন্ঠিত হইয়া বলিল, না, না, সে বাড়ী আপনার দেখবার যোগ্য নয়। আমি এইখানেই নামি।

মিসেস্ ঘোষ কথা কাটাকাটি করিবার লোক নহেন; ড্রাইভারকে গাড়ী থামাইতে বলিলেন।

নামিয়া বিমল নমস্কার করিতে, কহিলেন, কালও ওর পড়া হবে না, প্রণয়দের থিয়েটারে যেতে হবে। পরশু থেকে ভাল ক'রে পড়া আরম্ভ করিয়ে দিন। দেখ বাবা, তোমাকে তুমিই বলি ! আমাদের আত্মীয়-স্বজন যে যেখানে আছে, সকলকার মেয়েই ম্যাট্রিক, আই-এ, বি-এ পাশ করেছে, তাদের কাছে আমার বড় লজ্জা হয়। ছায়া বাতে পাসটি করতে পারে, তুমি তাই কর বাবা ! আমি ওঁকে ব'লে তোমার ভাল চাকরী করিয়ে দোব।

বিমল গদ্গদচিত্তে বলিল, চেষ্টার ক্রটী করব না মা।

—আচ্ছা বাবা, এসো। কাল আর তোমায় কষ্ট করতে হবে না—

ছায়া বলিয়া উঠিল, না, না, উনি আসবেন, প্রণয় মামা ওঁকেও ইন্‌ভাইট্ করেছেন, আপনি যেমন আসেন, তেমনই আসবেন মিঃ রায়, সব এক সঙ্গে যাব।

তাই ভালো।—বলিয়া মিসেস্ ঘোষ গাড়ী চালাইতে আদেশ দিলেন।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। এখন গেলেও, অন্ধকারে ইন্দুকে দেখিতে পাইবে না। বিমলের মনটি বিষণ্ণতায় ভরিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

প্রণয় বাবু গাড়ী থামাইয়া, প্যাণ্টের পকেট হইতে ঘড়ী বাহির করিয়া দেখিয়া বলিলেন, ঠিক সময়ে এসেছি, কালকের চেয়ে একটি মিনিট দেরী।

ইন্দু হাসিল। এ হাসি কেমন জান? শুকনো ফুলে বাতাস লাগিলে সে যেমন হাসি হাসে, এ তেমন হাসি। সারাটি দিন আজ কি কষ্টেই না তাহার কাটিয়াছে; কতবার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছে; কত কাজে আজ তাহার ভুলক্রটী হইয়াছে, ধরা পড়ায় বার বার কতই না অপ্রস্তুত হইতে হইয়াছে। আজিকার দিনটি বড় কষ্টে কাটিয়াছে। সংসারের যে সমস্ত কাজে মগ্ন হইয়া সে মস্ত পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিল, আজ সে সকল কাজ তাহার নিকট অত্যন্ত নীরস বলিয়া বোধ হইয়াছে; আজ সমস্ত দিন,

সমস্ত কাজের মধ্যে সে কেবলই একজনের পরিচিত পদশব্দ, পরিচিত কণ্ঠস্বর কামনা করিয়াছে, যত বার ব্যর্থতা আসিয়া আঘাত করিয়াছে, ততবার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছে। সারাদিনের সঞ্চিত দুঃখের রাশি যে বুকে যে মুখে ভরিয়া ছিল, সেই মুখের হাসি কত করুণ, তাহা যে না দেখিয়াছে সে বুঝিবে না।

প্রণয় বাবু গাড়ীর চাবি খুলিয়া পকেটজাত করিয়া, নামিয়া বলিলেন, আজ যাবে ত?

ইন্দু বলিল, যাব।

প্রণয় সানন্দে ও সোৎসাহে কহিলেন, চল, তোমার মা'কে বলে আসি। দেখা গেল, কণা ও তাহার মাতা খিড়কীর দিক হইতে বাগানেই আসিতেছেন, ইন্দু বলিল, ঐ যে মা আসছেন।

ধন্যবাদ!—বলিয়া প্রণয় গাড়ীর দুইদিকের দ্বার খুলিয়া দিলেন। ইন্দুর ইচ্ছা ছিল সামনের আসনে তিনজনই বসে; কিন্তু প্রণয় ফ্রক-পরা কণাকে আগেভাগে আদর করিয়া পিছনের আসনে বসাইয়া দিয়া ইন্দুকে বলিলেন, তুমি ঐ দিক দিয়ে ওঠ।

ইন্দু উঠিলে নিজে উঠিয়া বসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়া ফটক পার হইয়া গেলেন। বাগান তেমনই ফুলে ফুলে ফুলময়। ফ্লাওয়ার বেডে এমন একটি তরু নাই যাহার সর্ব্বাঙ্গ না পুষ্পিত হইয়া শোভায় সৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠিয়াছে। এই বৃত্তাকার 'পুষ্পশয্যার' মধ্যস্থলে একটি কনকচাঁপার নাতিবৃহৎ গাছ ছিল, সেইটির মাথায় নীলরঙের একটি বিদ্যুৎ-বাতি বিমল এমন সুকৌশলে বসাইয়া দিয়াছিল যে, সে আলোকটি জ্বলিলে স্থানটুকুর সৌন্দর্য্যের সীমা থাকিত না। গৃহস্বামিনী বা তাঁহার কর্ত্তাকে

সন্ধ্যার পর বাগানে আসিতে দেখিলে, দ্বারবান্ বাতির সুইচটা টিপিয়া দিত, আজও দিয়াছিল। গৃহিণী কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথে অন্তঃপুরে যাইতেছিলেন. হঠাৎ কাহার আহ্বানে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

—কাকিমা!

গৃহিণীর প্রসন্ন মন অকস্মাৎ অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইল। আগন্তুক, বিমল।

বিমল নত হইয়া পায়ের ধূলা লইল। বলিল, আমি একটা ছো' কাজ পেয়েছি, তাই আপনাকে বলতে এলুম।

—কি কাজ?

—টিউসনি।

গৃহিণী তাচ্ছিল্যের স্বরে বলিলেন, টিউসনি? ক'টাকা ক'রে পাও?

(তাচ্ছিল্য সহ্য করিবার শক্তি বোধ করি ভগবানই দরিদ্রদের দিয়া থাকেন।) বিমল সহজভাবেই বলিল, পঞ্চাশ টাকা।

—তা বেশ। পঞ্চাশ টাকায় তোমাদের দু'জনের বেশ চলে যাবে।—একটু থামিয়া আবার বলিলেন, তোমার মা ভাল আছেন ত?

—হ্যাঁ, মা ভালই আছেন।

এখন কি করা যায়?—এ সমস্যা উভয়ের মনেই উদিত হইয়াছিল। গৃহিণী ভাবিতেছিলেন, মেয়েদের ফিরিতে বিলম্ব আছে, এখন ইহাকে উপরে লইয়া দুই পাঁচটা কথা কহিয়া বিদায় দিলে কোন ক্ষতি নাই। তবে কর্তাটি আসিয়া পড়িলে, মুস্কিল আছে! তাঁহার হয়ত এখনই 'কথা

দেওয়ার' কথা মনে পড়িয়া যাইবে ও একটা কাণ্ড করিয়া বসিবেন। বিমল এখান হইতে যদি আপনা-আপনি চলিয়া যায়, সেই ভাল হয়। বিমল ভাবিতেছিল, ইন্দু কি একবার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইবে না! একটি বার চোখের দেখা, কত দিন দেখা হয় নাই, আজও কি হইবে না? ইন্দু আগে প্রায়ই এসময় ফুলবাগানটিতে ফুলরাণীর মত বেড়াইত—কোন ফুলের গন্ধ লইত, কোন লতাটিকে আদর করিত, কোন পুষ্পিত তরুশাখে আদর করিয়া হাত বুলাইত, আজ কি একবার আসিবে না? বাগানটী তেমনই আছে, কিন্তু ইন্দু কি তাহার সাধের বাগানটিকে পরিত্যাগ করিয়াছে? ইন্দু যদি না-ই আসে, দেখা যদি না-ই হয়, তাহা হইলে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কি হইবে?

অবাঞ্ছিত পরিচিত লোককে অল্প কথায় বিদায় দেওয়া বড় শক্ত। গৃহিণীর বড় বিপদ। তবে তিনি নাকি নিজকে খুবই শক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন, তাই বিমলকে ধূলাপায়ে বিদায় দিতেও পারিলেন। বলিলেন, তুমি কি বস্‌বে?

একথার কি উত্তর, বিমল তাহাই ভাবিতেছিল।

গৃহিণী পুনরপি কহিলেন, মেয়েরা সব প্রণয়ের সঙ্গে মোটরে বেড়াতে গেছে; কর্ত্তাও আসেন নি, দেরী হবে বোধ হয়।

বিমল উত্তর ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিল. বলিল, আমি যাচ্ছি কাকিমা! —বলিয়া পুনরায় প্রণাম করিয়া বিমল বাহির হইয়া গেল। কাশ্মীরি বারান্দা অন্ধকার, বোধ হয় জনপ্রাণীশূন্য!

প্রণয়! প্রণয়! প্রণয়! বিশ্বভুবনে ছড়ানো ঐ একটি নাম—প্রণয়! প্রণয়! প্রণয়! এই প্রণয় যেন প্রজাপতির মত বিচিত্র বর্ণবহুল পাখা

উড়াইয়া চারিধারে উড়িয়া বেড়াইতেছে। এই প্রণয়কে সে ছায়াদের ওখানে দেখিয়াছে, এখানেও এই প্রণয়। অথচ এই গৃহে কোনদিন কোন প্রণয়ের প্রণয়বিস্তার যে হয় নাই, সেদিন পর্য্যন্ত বিমল তাহাই জানিত।

আসিবে না ইহাই ঠিক ছিল, মিসেস্ ঘোষের নিকট বিদায় লইয়া বাড়ীর পথই সে ধরিয়াছিল, কিন্তু ভবানীপুরের সেই রাস্তাটার সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় তাহার মন বিশ্বাসঘাতকতা করিল, চরণদ্বয় সেই দুষ্কর্ম্মে সহায় হইল; চক্ষুর্দ্বয় শাসন ভুলিয়া গিয়া বিদ্রোহ করিল! অল্প সময়ের মধ্যে কত কাণ্ড ঘটিয়া গেল। না ঘটিলে ভাল হইত, এই অনুশোচনা যত বৃথাই হউক, তাহার প্রভাব অতিক্রম করিবার সাধ্য অনেকেরই নাই, বিমলেরও ছিল না।

গড়ের মাঠের বক্ষভেদ করিয়া মাঝে মাঝে যে সমস্ত রাস্তা বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহারই একটায় পড়িয়া, প্রণয়কুমার বলিলেন, এইবার তুমি ষ্টিয়ারিঙে এস, ইন্দু! ধর।

ইন্দু চাকাখানা ধরিল, প্রণয় তাহার হাতের উপর হাত রাখিয়া, চাকাখানাকে কখনও দক্ষিণে, কখনও বামদিকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে ইন্দুকে কলকব্জা,তাহাদের কার্য্যকারণ সমস্তই বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। ইন্দু একেবারে আনাড়ি নয়, কলকব্জা চিনিত, একটু-আধটু চালাইতেও জানিত; কিন্তু সে ভাব একেবারেই প্রকাশ করিল না। প্রণয়কুমারের কথাগুলা সে-যে শুনিতেছিল, এমনও মনে হয় না! হাত দু'খানাকে নিজের দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া সে নিস্পৃহ উদাসীনের মত বসিয়া রহিল।

প্রণয়কুমার অনর্গল বকিয়া যাইতেছিলেন, এক সময়ে কেবল ইন্দুর কর-

পল্লবে একটু চাপ দিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া করুণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, তুমি বুঝি কিছুই শুনছ না?

ইন্দুর যেন সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। হাত দু'খানাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে করিতে লজ্জাজড়িত কণ্ঠে কহিল, ও আমি পারব না।

প্রণয় হাত দিয়া, চাকার উপর ইন্দুর হাত দু'খানা চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, খুব পারবে।

—না থাক্, বলিয়া সে এক রকম জোর করিয়াই হাত দু'খানা টানিয়া লইল।

প্রণয় রাস্তার এক পার্শ্বে গাড়ী থামাইয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি রাগ করলে ইন্দু?

ইন্দু বলিল, না। একটু থামিয়া আবার বলিল, আমার দ্বারা হবে না। আর শিখে লাভই বা কি!—কথাগুলার মধ্যে নৈরাশ্যব্যঞ্জক এমন একটি করুণ সুর ধ্বনিত হইল যে, তাহার নিজের কাণেও তাহা খারাপ লাগিল। সংশোধন করিয়া লইবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, আমি ঐদিকে বসি, ক্ষণাকে দিন, চমৎকার ড্রাইভ করবে।—বলিয়া বামহস্তে টানিয়া দরজাটা খুলিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল।

ক্ষণা সোল্লাসে নামিতে নামিতে বলিল, প্রণয় দা, আপনি কিন্তু পাশে থাকবেন।

প্রণয় ক্ষণাকে ষ্টিয়ারিং ছাড়িয়া দিলেন কিম্বা ক্ষণাই তাঁহাকে সরাইয়া দিয়া ষ্টিয়ারিং ধরিয়া বসিল ঠিক বলা যায় না, তবে একটা কাণ্ড হইয়া গেল। গাড়ীর ভিতরে ইন্দু নীরবে বসিয়া রহিল, স্তম্ভিত ও বাক্‌হীন প্রণয়ের দক্ষিণে বসিয়া ক্ষণা বেগে গাড়ী চালাইয়া দিল!

মিনিট দশেক পরে প্রায় ইন্দুর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ দিকে যাবে বল ?

ইন্দু নির্লিপ্তের মত বলিল, বাড়ীই চলুন, ভাল লাগছে না আমার !

সত্যই তাহার ভাল লাগিতেছিল না। মনে হইতেছিল, না আসিলেই ভাল হইত। কিন্তু কি ভাল হইত, কেন ভাল হইত, সে তর্ক উঠিল না, মনে হইতেছিল, না আসিলেই ভাল হইত।

এবং সারা রাত জাগিয়া এই কথাটাই সে ভাবিল, না গেলেই ভাল হইত। বিমল যে আসিয়াছিল, ইন্দুর মা সে কথা কাহাকেও বলেন নাই। শুনিলে ইন্দু বুঝিত, কেন তাহার মন বলিয়াছিল, না গেলেই ভাল হইত।

সে রাত্রে ভাল করিয়া বিমলের খাওয়া হইল না, সুপ্তি তাহার নয়নমন স্পর্শ করিল না। সমস্ত গ্লানি, সমস্ত অনুশোচনা, যুক্তিতর্ক, বাদপ্রতিবাদ প্রভৃতি যা-কিছু এবং যতকিছুর অবসান ঘটিয়া যে সমস্যাটি ভোরের আকাশের শুকতারাটির মত বিমলের চিত্তাকাশে জাগিয়া রহিল, তাহা এই যে, ইন্দুও প্রণয়জালে জড়াইয়া পড়িল নাকি ?

তখন প্রভাত হইয়া গিয়াছে। তরুণ অরুণের আলোকধারা কক্ষময় লুটাইতেছে, খুব দৃঢ়কণ্ঠে 'নাঃ, কিছুতেই নাঃ' বলিয়া বিমল শয্যাত্যাগ করিল।

পল্লীর লাইব্রেরীতে গিয়া, সংবাদপত্রে কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া এবং অন্যান্য সংবাদগুলিতে চোখ বুলাইয়া বাজার করিয়া বাড়ী ফিরিয়া স্নানাহার সারিয়া নিত্য নিয়মিত ইম্পীরিয়্যাল লাইব্রেরীতে বিমল অধ্যয়ন

করিতে গেল। মা'কে বলিয়া গেল, আজ এক জায়গায় থিয়েটার দেখিতে যাইবার কথা আছে, ফিরিতে বিলম্ব হইবে।

মা যথেষ্ট বিস্মিত হইলেন। থিয়েটার বায়স্কোপ বিমল কখনও দেখিয়াছে বলিয়া তিনি মনে করিতে পারেন না। পাড়ার কত ছেলে কত মেয়ে যায়, কত গল্প করে, কত তর্ক চলে, আশ্চর্য্য তাহার ছেলেটি, কোন-দিন কোথাও যায় না। তিনি কত সময়ে কত বলিয়াছেন, পোড়া ছেলের মুখে সেই এক কথা—গরীবের ছেলের ঘোড়া-রোগ সাজে না মা! এখন বলিতে নাই একটি কাজ হইয়াছে, পঞ্চাশ টাকা মাহিনা হইয়াছে, এখন বুঝি ছেলের মন সখের দিকে একটু ঝুঁকিয়াছে, ভাবিয়া সন্তানের জননীর চিত্তে সন্তোষ জাগিল।

খুব একটা বড় গোছের উচ্চাশা বিমলের মা'র মনে কোন দিন স্থান পায় নাই। তাঁহার স্বামীর শেষ বয়সে সত্তরটি টাকা মাহিনা হইয়াছিল, সত্তর টাকাতেই তাঁহাদের স্বচ্ছন্দে দিন চলিয়া যাইত, ছেলে যদি প্রথমেই পঞ্চাশ টাকা পাইল, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া সত্তরের বেশী হইতেও পারে, তখন তাহার দিনও স্বচ্ছলভাবে চলিতে পারিবে, এই চিন্তাই এই বিধবা নারীটিকে পরম পরিতুষ্ট রাখিত। কেবল একটি সাধ, এইবার বিমলের বিবাহটি হইয়া গেলেই তিনি নিশ্চিন্তে মরিতে পারেন।

বিমলের জামাগুলো যেন কেমন! মাহিনার টাকাটা আসিলে তাহাকে গুটি কত ভাল জামা করাইতে বলিবেন, মাতার এইরূপ ইচ্ছা আছে। কত রঙ-বেরঙের, কত সুন্দর সুন্দর জামা পরিয়া কত ছেলে ঐ বিমলের কাছেই আসে, দেখিয়া চক্ষু জুড়াইয়া যায়, তাঁহার ছেলেটির না আছে সখ, না আছে পছন্দ! এবার তিনি কোন কথা শুনিবেন না। মোড়ের

মাথার খলিলকে ডাকাইয়া জামা করিতে নিশ্চয়ই দিবেন। যে বয়সের যা, তা না করিলে কি ভাল দেখায়? আর ভগবান যখন মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন তখন না করিবেই বা কেন?

এই যে আজ থিয়েটার দেখিতে গেল, মার মনে যে কত আনন্দ হইয়াছে, মা'ই তাহা জানেন! ভগবান যেন বিমলের এই সুবুদ্ধিটি বজায় রাখেন, আর যেন সে সৃষ্টিছাড়া ছন্নছাড়া বাউণ্ডেলের মত ঘুরিয়া না বেড়ায়! হাসিবে, খেলিবে, সাজিবে, গুজিবে, রঙ-তামাসা দেখিয়া বেড়াইবে, তবে না যোয়ান ছেলেকে মানাইবে! ভাবিয়া ভাবিয়া বাছা যেন দিনের দিন বুড়া হইয়া পড়িতেছে। আহা, আজিকার এই সুবুদ্ধিটি যেন তার বজায় থাকে!

কিন্তু হঠাৎ রঙ-তামাসায় কে বাছার মন ফিরাইল? হেরম্ব ঠাকুর-পোদের সঙ্গেই যাইবে বোধ হয়! বোধ হয়, ইন্দুই বিমলের বন্য মহিষের গোঁ ছাড়াইতে পারিয়াছে। মেয়েটি বড় লক্ষ্মী! মেয়ে ত নয়, যেন ভগবতী! কিন্তু তাহার কথা আজকাল বিমলের মুখে শোনা যায় না। কাকাবাবুর, কাকিমার কথাও সে বলে না। হয় ত তাঁহাদের বাড়ী যায় না। তবে বোধ হয় আজ জজ-সাহেবদের সঙ্গে যাইতেছে। জজ-সাহেবের বাঙ্গালী মেম্ বিমলকে খুব ভালবাসেন, হয় ত তিনিই ডাকিয়াছেন, তাই যাইতেছে। যে মেয়েটিকে পড়ায়, সেই হয় ত মাষ্টার মশাইকে ধরিয়া পড়িয়াছে। আহা, মেয়েটা বড় দুঃখী! স্বামী যাহার অমন, তাহার দুঃখের কি অন্ত আছে? মেয়েটা যদি পাশ করে, বিমলের একটি ভাল চাকরী হইবে। কিন্তু মেয়েটা যে পড়ে না, পাস্ কি অমনি অমনি হয়? আর সেই ছেলেগুলাই বা কেবল গল্প করিতে আসে কেন? মেয়ের মা এটা

বন্ধ করিতে পারে না? মেয়ের বিয়ে হইয়াছে, তাহার স্বামী বিলাতে, মেয়েকে চোখে চোখে রাখাই ত তাঁহার উচিত। মা যদি ইহাও না পারেন, তবে কিসের মা? সে যাই হোক্, আমার বাছা যেন তাহাদের সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারে।

মা যখন নিজের মনে ভাঙ্গা-গড়া করিতেছিলেন, বিমল তখন জজ-সাহেবের বাড়ীতে ছায়ার পাঠকক্ষে বসিয়া ছায়ার গানের খাতার পাতা উল্টাইতেছিল। "অদৃষ্টের পরিহাস" নাটকের অভিনয়ে একখানি গান তাহাকে গাহিতে হইবে। ব্যবস্থা হইয়াছে, গান খানি সে অন্তরাল হইতে গাহিবে। আজ সারা দিন সে গানখানি অভ্যাস করিয়াছে। বিমল আসিবামাত্র গানখানি তাহাকে শুনাইয়া দিল।

শুনিতে ভাল লাগিলে যদি গান ভাল হয়, তাহা হইলে ছায়ার গান ভাল হইয়াছে, বিমল এই কথাই বলিয়াছে। সে সুর বোঝে না, তান লয়ের সহিত তাহার পরিচয় নাই, কাণে তাহার মিষ্ট লাগিয়াছে এই কথাটা মাত্র সে বলিতে পারিল।

ছায়া ও মিসেস্ ঘোষ সাজসজ্জা করিয়া আসিয়া বিমলকে লইয়া যাত্রা করিলেন; জজ-সাহেব কোন্ ক্লাবে চা খাইতে গিয়াছেন, সেখান হইতে সোজা যাইবেন এইরূপ স্থির আছে।

প্রণয়কুমার মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া গাড়ী হইতে নামাইয়া লইয়া মণ্ডপমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মণ্ডপটি, বিচিত্র বেশভূষায় ভূষিত নরনারী সমাকীর্ণ, অগণিত বিদ্যুতালোকে প্রোজ্জ্বল, লতাপাতা পুষ্পমাল্যে সুশোভিত। মণ্ডপের এক কোণে, বৃত্তাকারে বসিয়া একদল যন্ত্রী তারের যন্ত্রে মৃদু আলাপ করিতেছে; ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সাজিয়া গুজিয়া

চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; কেহ রৌপ্যপাত্র হাতে লইয়া অভ্যাগতদের পুষ্পস্তবক দিতেছে, কেহ পান, কেহ সিগারেট বিতরণ করিতেছে। অভিনয়-মঞ্চে যবনিকা পড়িয়া রহিয়াছে, পাদপ্রদীপ জ্বলিয়া যবনিকার ছবিখানি জ্বল-জ্বলায়মান।

প্রণয়কুমার ও মিসেস্ ঘোষ এবং বিমল ও ছায়া যখন কথা কহিতে কহিতে মণ্ডপমধ্যে প্রবেশ করিলেন, ঠিক সেই সময়ে অন্যদিকের ঝালরের পর্দা সরাইয়া আবুদি, ইন্দু ও ইন্দুর মা'ও মণ্ডপে আসিলেন।

আবুদি একটি ছোট ছেলের হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর সেজকাকা কোথায় রে ?

ঐ যে—বলিয়া ছেলেটি প্রণয়কে দেখাইয়া দিল। তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া সেদিকে চাহিতে দেখা গেল, প্রণয় মিসেস্ ঘোষের সহিত কথা বলিতেছে। আবুদি বালিকাটিকে বলিলেন, ওদিকে গিয়ে সেজকাকাকে একবার পাঠিয়ে দে ত!

দিচ্ছি জ্যেঠাইমা, বলিয়া বালক ভিড় ঠেলিয়া প্রণয়কে ধৃত করিল। আবুদি হাত নাড়িয়া প্রণয়কে ডাকিলেন। বিমল মুখ তুলিয়া সেদিকে চাহিল, আবুদির সঙ্গে সঙ্গে ইন্দুও এদিকে চাহিল। বিদ্যুতালোক যেন সহস্রগুণ তেজবৃদ্ধি করিল। ওপারে ইন্দু, এ পারে বিমল—উভয়ে উভয়কে দেখিল।

আবুদির সহিত কথা কহিতে কহিতে ইন্দুর মা একটু সরিয়া যাইবামাত্র ইন্দু বেঞ্চের সারির সরু পথ ধরিয়া এদিকে আসিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল।

ছায়া বিমলের হাত ধরিয়া বলিতেছিল, আপনিও ভেতরে আসুন না,

মিঃ রায়! আপনি, মা দু'জন কাছে থাকলে আমার নার্ভাসনেস্ কেটে যেতে পারে।

চলুন, বলিয়া মুখ তুলিতেই বিমল দেখিল, সম্মুখে ইন্দু।

বিমল আনন্দে তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছিল, কোথা হইতে প্রণয় আসিয়া ইন্দুর সামনে দাঁড়াইয়া বলিলেন, আমি তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি ইন্দু! চল, বসবে চল।

তারপর ছায়ার দিকে চাহিয়া বলিলেন, তুমি যাও ছায়া, প্রথম দৃশ্যেই তোমার গান, তুমি না গেলে ড্রপ তুলতে পারছে না।

আসুন মিঃ রায়—পাইলট-ইঞ্জিন যেমন অবলীলাক্রমে ওয়াগন টানিয়া লইয়া যায়, লরী যেমন স্বচ্ছন্দে ট্রেলারখানাকে টানিয়া লইয়া যায়, ছায়া সেইভাবে বিমলকে টানিয়া লইয়া গেল।

—চল ইন্দু, আমরা বসিগে।

ইন্দুর দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল; অতিকষ্টে কহিল, চলুন।

ছায়ার দেহসংলগ্ন বিমল তখনও দৃষ্টিবহির্ভূত হয় নাই। বিমলের না আসিবার, খবর না দিবার জাজ্জ্বল্যমান হেতু ইন্দুর চোখে জ্বালা ধরাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু যে দৃশ্য চোখে আগুন জ্বালে, অন্তরে তাহাই আবার বর্ষা আনে কেন?

প্রণয় ডাকিলেন, এস ইন্দু।

—চলুন।

ইন্দু সিল্কের ক্ষুদ্র রুমাল দিয়া চোখ দু'টি, কপোল খানি মার্জ্জনা করিয়া লইল।

দশম পরিচ্ছেদ

রঙ্গমঞ্চের ঠিক সম্মুখে, প্রথম সারিতে আবুদি ইন্দুর মাতাকে লইয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের পার্শ্বে তুইখানি আসন খালি ছিল—খালি রাখা হইয়াছিল। প্রণয়ের সঙ্গে ইন্দু যখন সেই পথে যাইতেছিল, ইন্দুর মাতা ডাকিলেন, আয়, ইন্দু বোস্।

ইন্দু সে কথা শুনিল কি না বলা যায় না, তবে বসিল না, মা'কে দেখিয়াও যেন দেখিল না। প্রণয় এক মুহূর্ত্ত মাত্র থামিয়া, অথবা থামিতে গিয়া আবার চলিতে লাগিলেন, প্রথম সারি অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় সারির শেষ প্রান্তে তুইখানি শূন্য আসনের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, ইন্দুকে বসাইয়া নিজে তাহার বাম দিকে বসিলেন। আবুদি ঘাড় বাঁকাইয়া একবার ইহাদের দেখিয়া লইয়া চুপ করিয়া বসিলেন।

মা'র আহ্বান ইন্দু শুনিয়াছিল; কিন্তু এই মুহূর্ত্তে মা'র উপর হইতে তাহার মন অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছিল। বিমল যে এইমাত্র তাহারই চোখের সামনে, তাহাকে উপেক্ষা করিয়াই সেই সুবেশিনীর সঙ্গে চলিয়া গেল, একটিবার ফিরিয়া চাহিল না, এই ঘটনা-বিপর্য্যয়ের মূলে কে? ইন্দুর মনে হইতেছিল—আর কোনদিনই সে মা'র মুখের পানে চাহিবে না, চাহিতে পারিবে না, তাঁহার সঙ্গে কথাও বলিবে না! যেখানে তাহারা বসিয়াছিল, সেখান হইতে মা'কে দেখা যায়, চেনা যায়; ইন্দুর মন, আরও দূরে—দেখা না যায় এমন দূরে বসিতে চাহিতেছিল।

যবনিকা উঠিয়া গিয়াছে। নদীমাতৃক বাঙলা দেশের শ্যামল শস্য-ক্ষেত্রের দৃশ্যাবলী পরিদৃশ্যমান। মাঠ হরিদ্বর্ণের ধান্যে ভরিয়া গিয়াছে;

দূরে খড়ের ঘর অনেকগুলি দেখা যায়—যেন একটি গ্রাম; গ্রামের পিছনে আম, জাম, কাঁঠাল, তাল, নারিকেল বৃক্ষশ্রেণী, তাহারই পাশ দিয়া ছোট একটি নদী বা খাল আঁকিয়া বাঁকিয়া নীল-আকাশের কোলের কাছে গিয়া অদৃশ্য হইয়াছে। সূর্য্য অস্ত যাইতেছেন, পশ্চিমাকাশ রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই বর্ণছটা জলের উপর পড়িয়াছে।

দুই দিক হইতে দুইটি ছেলে আসিয়া কথা বলিতেছে, কত হাসিতেছে; আর একটি ছেলে আসিল। মাথায় তাহার কোঁকড়া কালো চুলের রাশি, কালো চুলের নীচে ফর্সা টুকটুকে ঢল ঢল কচি মুখখানি, বাসন্তী রঙের কাপড় পরা খালি পায়ের উপরে বাসন্তী রঙে রাঙা চাদরখানি পড়িয়া আছে, পায়ে তাহার জুতা নাই, ছোট ছোট ফর্সা পা দুখানি বিদ্যুতালোকে কি সুন্দর যে দেখাইতেছে! হাতে তাহার বাঁশের একটি বাঁশী! সে আঙুল দিয়া সেই শস্যশ্যামল হরিৎ ক্ষেত্র দেখাইল, জল-ভরা নদী দেখাইল, দিকচক্রবালে বিলীয়মান সূর্য্যরশ্মি দেখাইল—কত কথাই বলিল!

আমরা জানি, তাহার প্রত্যেকটি কথা দর্শকদের অঙ্গে রোমাঞ্চ আনিয়া দিতেছিল, বাঙলার যে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা রূপ তাহার কথায় ফুটিয়া উঠিতেছিল, দর্শকমাত্রেই তাহা যেন চাক্ষুষ করিতেছিলেন; সকলেরই মনে হইতেছিল—এই আমার দেশ! এই আমার বাঙলা! এই আমার মা, জননী, জন্মভূমি!

ছেলেটি কথা বন্ধ করিয়া একপাশে গিয়া বসিল। চক্ষু মুদিয়া যেন ধ্যানেও সে বঙ্গমাতার পরিপূর্ণ রূপ প্রত্যক্ষ করিতেছিল। তারপর আস্তে আস্তে বাঁশীতে ফুঁ দিল।

প্রণয় বলিলেন, এইবার ছায়ার গান।

ইন্দুর চমক ভাঙিল! এতক্ষণ একটি শব্দও তাহার কানে যায় নাই, একটি কথাও সে শুনিতে পায় নাই।

রঙ্গমঞ্চের ভিতরে হার্মোনিয়াম বাজিয়া উঠিল।

প্রণয় আবার বলিলেন, এই গানটাই তোমায় গাইতে বলেছিলুম, তুমি গাইলে না, ছায়া—

অনেকক্ষণ হইতে ঐ নামটা ইন্দুর প্রাণে গাঁথিয়া গিয়াছিল। অভিভূত ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, ছায়া কে?

প্রণয় বলিলেন, ঐ যে, যাদের আমি ভেতরে পাঠিয়ে দিলুম, ওদের মধ্যে একটি মেয়ে ছিল, সেই-ই ছায়া!

ইন্দু আর কোন কথা কহিল না। তাহা হইলে সেই মেয়েটিরই নাম ছায়া! যেমন সুন্দর চেহারাটি, তেমনই মিষ্ট ঐ নামটি—ছায়া!

গান আরম্ভ এবং শেষ হইয়া গেল। মুগ্ধ শ্রোতৃবর্গের ঘন করতালি ধ্বনিতে প্রেক্ষামণ্ডপ ভরিয়া উঠিল। করতালি-ধ্বনি থামিলে, প্রথমিত গানখানি পুনরায় গীত হইল।

নীল ফ্রক-পরা একটি মেয়ে আসিয়া প্রণয়কে কি বলিল; প্রণয়ের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া ইন্দু দেখিল, তাহাদের বয়সী একটি মেয়ে মণ্ডপের পর্দ্দার ফাঁক হইতে হাতছানি দিয়া প্রণয়কে ডাকিতেছে,—'এক মিনিট, ইন্দু' বলিয়া প্রণয় উঠিয়া গেলেন।

গান শেষ হইবামাত্র আবুদি আসন ছাড়িয়া, ইন্দুর পাশ দিয়াই বাহিরে যাইতেছিলেন, ইন্দুর পানে চক্ষু পড়িতেই বলিলেন, প্রণয় ঠাকুরপো কোথায় গেল?

ইন্দু চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। বয়স্কাদের সঙ্গে কথা কহিবার

সময়, বয়স্কা দাঁড়াইয়া থাকিলে, অল্পবয়স্কাদের দাঁড়াইবার নিয়ম সভ্য সমাজে প্রচলিত।

— এই ত ছিলেন! আপনি কোথায় যাচ্ছেন মাসিমা?

—ভেতরে; আমার ছোট ছেলেটা মেছুড়ে সাজছে, তাকে একটু দেখে আসি।

—আমি যেতে পারি মাসিমা?

—যাবি, তা আয় না।

গান শেষ হইয়া গিয়াছিল। 'উইংয়ে'র পাশে সেই মেয়েটি—ছায়া যাহার নাম—তখনও টেবিল-হার্মোনিয়ামে বসিয়া, ঘাঘরাপরা দু'টি ছোট মেয়ে তালপাতার পাখায় তাহাকে বাতাস করিতেছে; তাহার পার্শ্বে চশমাধারিণী একটি বর্ষীয়সী মহিলা বসিয়া আছেন—ইন্দু বুঝিল, তিনিই ছায়ার মা।

কিন্তু বিমল সেখানে নাই।

পরের উইং অতিক্রম করিবার সময় দেখা গেল, বিমল একটি ছোট্ট ছেলের মাথায় মস্ত একটা পাগড়ী বাঁধিয়া দিতেছে। এই ছেলেটি মেছুড়ে সাজে—আবুদি'র ছোট ছেলে। আবুদি তাহারই দিকে চলিলেন; আর ইন্দু নিজের অজ্ঞাতসারে তাঁহারই অনুসরণ করিল।

বিমল সানন্দহাসিমুখে দাঁড়াইয়া উঠিয়া ইন্দুর পানে চাহিল। সেই চাহনি! কোন পরিবর্তন নাই। সেই দু'টি উজ্জ্বল চক্ষু হইতে চিরদিন যেমন স্নেহ ঝরিত, ভালবাসা ঝরিত, অগাধ আত্মীয়তা প্রকাশ পাইত, আজ কোন ব্যতিক্রমই ছিল না; ঠিক সেই। ইন্দুর দু'টি চোখ, সেই সঙ্গে মনখানি, হৃদয়খানি ভরিয়া গেল। কত দিনের শুষ্ক নদী, বক্ষে কত

ফাটা-চটা, কত বালি, কত কাঁকর—এই মুহূর্ত্তে কোন্ পাহাড় হইতে একটি ঢল্ নামিয়া তাহাকে ভরিয়া দিল—পাড়ে পাড়ে কূলে কূলে প্লাবন বহিয়া গেল।

বিমল কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; হাসিমুখে স্নেহস্বরে বলিল, কাল তোমাদের বাড়ী গেছলুম ইন্দু। তুমি ছিলে না!

এ ত সেই স্বর! যে স্বরে ইন্দুর কাণ জুড়ায়, বুক জুড়ায়—এ ত সেই স্বর! আবিলতা নাই, আবিলতার ছায়া-লেশও নাই। ইন্দু সাগ্রহে বলিল, কখন্?

—সন্ধ্যার ঠিক পরেই।

ইন্দুর মাথা খুঁড়িতে ইচ্ছা হইতেছিল।

বিমল বলিল, তুমি বাড়ী ছিলে না, না?

—না, না, না। বাড়ীতে ছিল না, সত্য; কিন্তু কোথায় ছিল? সেই সময় গড়ের মাঠের দিকে প্রণয়ের মোটর ছুটিতেছিল।

বিমল বলিল, বেশীক্ষণ থাকি নি বটে—

—কারও সঙ্গে দেখা হয় নি?—সে জানিতে চাহিতেছিল, মা'র সঙ্গে দেখা হইয়াছিল কি-না কিন্তু মধুর পবিত্র 'মা' কথাটা তাহার জিহ্বা যেন উচ্চারণ করিতে চাহিতেছিল না।

বিমল বলিল, তোমার মা'র সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

ইন্দু আপনার মনেই শেষ শব্দটা উচ্চারণ করিল,—হয়েছিল!

হ্যাঁ। তুমি বুঝি প্রণয়বাবুর সঙ্গে—

হ্যাঁ!—এই একটি কথা উচ্চারণ করিতে কতখানি কষ্ট তাহার হইল, সে শুধু সেই জানে।

—তুমি মোটরে বেড়াতে গেছ, ফিরতে অনেক দেরী হবে শুনে আমি চলে এলুম।

মোটরে বেড়াইতে গিয়েছিল সত্য; কিন্তু সে যে কত অনিচ্ছায়, সে সংবাদ কি কেহ রাখে? কাল রাত্রের স্মৃতি আজও শতবৃশ্চিক দংশনের জ্বালা দিতেছে, এ কথাই বা কে বুঝিবে? মোটর-চালনা শিখাইবার ছলে একজন যে তাহার হাতের ওপর হাত চাপিয়া ধরিয়াছিল, ইহা মনে করিতেও গা ঘিন্‌ঘিন্‌ করিতেছে।

আবুদি তাঁহার ছেলেটিকে সব বুঝাইয়া-পড়াইয়া আদর করিয়া, চুমা খাইয়া ছাড়িয়া দিয়া, এদিকে আসিয়া বলিলেন, চল ইন্দু।

ইন্দু বলিল, আপনি যান মাসিমা, আমি আসছি।

আচ্ছা, বলিয়া আবুদি প্রস্থান করিলেন।

ইন্দু বলিল, যে মেয়েটি গাইল, ও কে?

বিমল কহিল, আমার ছাত্রী, ছায়া—মিসেস্‌ বোস্‌! আমি ওঁকেই পড়াচ্ছি। সেই কথা বলতেই কাল গেছলুম। পঞ্চাশ টাকা ক'রে পাই, মেয়েটি যদি পাস করতে পারেন, ওঁর বাবা আমাকে একটা ভাল কাজ ক'রে দেবেন, ছায়ার মা সেই ভরসা দিয়েছেন। ছায়ার বাবা জজ।

মিসেস্‌ বোস্‌ বললেন যে, ওঁর বিয়ে হয়েছে নাকি?

—হ্যাঁ, ওঁর স্বামী বিলেতে।

ছায়ার শ্রান্তি দূর হইয়াছিল। সরিয়া আসিয়া বিমলের উদ্দেশে কহিল, চলুন মিষ্টার রায়, বাইরে যাওয়া যাক।

—চল। কিন্তু তুমি ইন্দুকে দেখতে চেয়েছিলে—

—কে ইন্দু? ওঃ, যিনি ফার্ষ্ট ডিভিসনে—ওঃ, ইনিই? নমস্কার!

ইন্দু প্রতি-নমস্কার করিলে, ছায়া বলিল, আজ আপনার সঙ্গে ভাল ক'রে আলাপ করা হবে না। ঐ যে, মা'র শুভাগমন হচ্ছে। মা যদি শোনেন, বয়সে এত ছোট হয়েও আপনি ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাস ক'রে ফেলেছেন, খোঁটা শুনতে শুনতে আমার প্রাণান্ত হবে; তার চেয়ে পরে বরং একদিন—

—ছায়া!

—এই যে মা।

—বিমল চল বাবা, বাইরে বসি গে, চমৎকার প্লে করছে এরা।

—চলুন।

ছায়ার মা ও ছায়া অগ্রে অগ্রে, বিমল ও ইন্দু তাঁহাদের অনুগমন করিয়া চলিলেন।

ইন্দু নিম্নস্বরে বলিল, আবার কবে আসবে বল?—মনে পড়িল, আসার প্রতিবন্ধকতা আছে। আবার বলিল, দেখা না হলে আমার যে বড় কষ্ট হয়।

—আর আমার বুঝি কষ্ট হয় না?

ইন্দুর চোখে জল আসিয়া পড়িল।

হঠাৎ ঘণ্টা বাজিয়া যবনিকা পতন হইল। বাহিরে একসঙ্গে অনেক লোক কথা কহিয়া উঠিল। হঠাৎ যেন একটা হট্টগোল পড়িয়া গেল।

ইন্দু কৈ—বলিতে বলিতে ইন্দুর মা ও প্রণয় রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন।

ইন্দু বলিতেছিল, তুমি যদি না আস, আমি যাব। বাবা কখনই 'না' করবেন না, আমি তাঁর সঙ্গে—

কথা বন্ধ হইয়া গেল। সম্মুখে প্রণয়, তাঁহার সঙ্গে ইন্দুর মা!

মা ডাকিলেন—ইন্দু!

ইন্দু নিঃশব্দ।

মা গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন, এখানে কি করছ? চলে এস।

যে যেখানে ছিল, সকলে সেই দিকে চাহিল। যেন একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

ছায়া, ছায়ার মা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, বিমলের মাথাটা তাহার বুকের উপরেই ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

ইন্দুর কাণ মাথা ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল। একটা কড়া জবাব দিতে না পারিলে যেন সে ফাটিয়া পড়িবে, এমনই তাহার অবস্থা।

এই সময়ে প্রণয় তাহার পার্শ্বে আসিয়া বলিলেন—চল ইন্দু, এখানে বড় গরম, বাইরে যাই।

ইন্দু নিঃশব্দে তাহার সঙ্গে বাহির হইয়া গেল। এই লোকটির সঙ্গ যতই অবাঞ্ছনীয় হউক না কেন, এ সময় সেখান হইতে বাহির হইতে পারিলেই যেন সে বাঁচে!

একাদশ পরিচ্ছেদ

সেই রাত্রে!

হেরম্বনাথ 'তাস পাশা পাঁচালী' শেষ করিয়া যখন বাড়ী ফিরিলেন, কাহারও জাগিয়া থাকিবার সম্ভাবনা না থাকিলেও দেখিলেন, গৃহিণী খাটের মধ্যে শুইয়া হাত-পাখা নাড়িতেছেন—অর্থাৎ জাগিয়া আছেন। পাছে

ঘুম আসে, ঘুমাইয়া পড়েন, তাই এই কৃচ্ছ্রসাধন। হেরম্বনাথ বলিলেন, পাখা বন্ধ কেন? খারাপ হল নাকি? কখন খারাপ হল? মিস্ত্রীকে ডেকে বল নি কেন, আমি ডাকছি, র'স—ইত্যাদি।

গৃহিণী শশব্যস্তে বলিলেন, না, না, পাখার কিছু হয় নি। কাউকে ডাকতে হবে না।

হেরম্বনাথ উদ্বেগমুক্ত হইয়া কহিলেন, তা'হলে পাখাটা খুলে দিই, কি বল?

গৃহিণী কিছু বলিলেন না।

হেরম্বনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, ওরা সব শুয়েছে?

—হ্যাঁ।

হেরম্বনাথ অধিকতর আশ্বস্ত হইয়া আলোটি নিবাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িলেন। তিনি যে মুহূর্তে শয়ন করিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে গৃহিণী উঠিয়া বসিলেন এবং পরমুহূর্তে নিজের খাট ছাড়িয়া এ খাটের ধারটিতে আসিয়া বসিবার উদ্যোগ করিলেন। হেরম্বনাথ তাহা বুঝিলেন, একগাল হাসিয়া হাত ঝাড়াইয়া গৃহিণীকে ধরিয়া বসাইয়া দিয়া, বলিলেন, কি গো, কি খবর?—বলিয়াই হাসি। অনেক দিন পরে যেন অনেকখানি রসিকতা করিয়া ফেলিয়াছেন।

গৃহিণী তাঁহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, সরে শোও।

হেরম্বনাথ সাহ্লাদে সরিয়া গিয়া কিস্ কিস্ করিয়া বলিলেন, এখানে শোবে? এস এস, আয়াহি বরদে দেবি।

—খুব রসিকতা হয়েছে! থাম।—বলিয়া গৃহিণী আস্তে আস্তে পার্শ্ববর্তিনী হইলেন।

হেরম্বনাথ বলিলেন, ওদের ঘরের দরজাটা—

তার জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না, বন্ধ আছে।

বেশ বেশ, বলিয়া হেরম্বনাথ এমন কতকগুলি ভাবভঙ্গী অভিব্যক্ত করিলেন, যাহা প্রকাশ করা শুধুই অসঙ্গত নহে, অশোভনও বটে।

গৃহিণী বলিলেন, এই ফাল্গুন মাসেই আমি ইন্দুর বিয়ে দোব।

—ফাল্গুন মাসেই! ভাল দিন আছে, পাঁজী দেখিয়েছ? আজ কত তারিখ?

—চোদ্দই। কাল তুমি পুরুত মশাইকে ডেকে দিন দেখাও।

—তা বেশ।

স্যাকরাকেও খবর দিও।

—তা দোব।

কথা ফুরাইয়া গেল। কিন্তু এত শীঘ্র ফুরাইয়া যাওয়া নিরাপদ নহে বুঝিয়া গৃহিণী বলিলেন, ইন্দুকে নিয়ে তুমি একদিন সাহেব স্যাকরাদের বাড়ী ঘুরে এস-না। নতুন নতুন কত সব গয়না বেরিয়েছে, দেখে পছন্দ করে নিতে পারবে।

হেরম্বনাথ বলিলেন, তার আর কি, কালই নিয়ে যাব।

গৃহিণী বলিলেন, আবুদি'র সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল, ওরা কিছু চায় না, বরং প্রণয়ের প্রথম বউয়ের দশ-হাজার টাকার জড়োয়া গয়নাগাটী ইন্দুই সব—

হেরম্বনাথ বলিলেন, কার গয়নাগাটী বলছ?

—আহা, প্রণয়ের প্রথম বউ গো! সে বউ বিয়ের পরই মারা গেছে না!

—প্রণয়! প্রণয় কে?

গৃহিণী ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া, রাগত স্বরে বলিলেন, প্রণয় কে, তুমি জান না? ন্যাকা আর কি!

হেরম্বনাথ ভাবিতে লাগিলেন, তাই ত!

এই ন্যাকা, পদার্থহীন লোকটার উপর গৃহিণী হাড়ে চটিয়া গেলেন। কিন্তু চটিয়া থাকিলে কার্য্য উদ্ধার হয় না, তাই আবার নরমও হইলেন, বলিলেন, তোমার মতো ভুলো লোক যদি আর একটি থাকে। প্রণয়কে এরই মধ্যে ভুলে গেলে? প্রণয় গো প্রণয়! আবুদি'র সেজ দেওর। ডেপুটী।

ঘরে যদি আলো থাকিত, গৃহিণী দেখিতেন, বিছানার মধ্যে হেরম্বনাথ আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি কর্ত্তাকে দেখিতে পাইলেন না, কর্ত্তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দটুকুও যে লয় পাইয়াছে ইহাও বুঝিতে পারিলেন না। ভাবগদগদ-চিত্তে বলিলেন, তার সঙ্গে ইন্দুর আমার খুব ভাব হয়েছে যে! ইন্দুকে বেড়াতে নিয়ে যায়, মোটর চালান শেখায়, কাল রাত্রে গড়ের মাঠে নিয়ে গেছল।

হেরম্বনাথ আরও আড়ষ্ট হইলেন।

—আমরা ত একটু আগে ওদের ওখান থেকেই আসছি কিনা, প্রণয় নিজে ইন্দুকে পাশে বসিয়ে ডিনার না-কি-বলে-যে তাই খেলে। কি রকম ক'রে কাঁটা ধরতে হয়, চামচ ধরতে হয়, খাওয়া শেষ হলে কাঁটা চামচ কি ভাবে রাখতে হয় সব বোঝাচ্ছিল! মাগো, এতও আছে সব।

হেরম্বনাথ বলিলেন, ইন্দু কাঁটা চামচ ধরে খেতে পারলে?

কেন পারবে না, প্রণয় সব দেখিয়ে দিতে লাগল।

—বল কি! ইন্দুর বাবা, তার বাবা, তাঁর বাবা, তাঁরও বাবা যা পারেন নি, ইন্দু তাই পারলে?

দেখলেই পারা যায়। তুমি চেষ্টা করলে বুঝি পার না?

হেরম্বনাথ বলিলেন, এ জন্মটা ত কেটেই গেল, ফিরে জন্মে চেষ্টা করা যাবে। সে যাক্, ইন্দু কি বলে?

গৃহিণী মনে মনে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া বলিলেন, কিসের কি বলে?

—এই বিয়ের?

—কি আবার বলবে? চুপ করে থাকে।

—কেন, চুপ করে থাকে কেন?

—চুপ ক'রে থাকবে না ত লাফালাফি ক'রে বেড়াবে নাকি? অমন ঘর বর, হাকিমের বউ হবে, কে না চায়? তবে যদি বল, দোজ পক্ষ! তা সে নামেই দোজ পক্ষ। বউটা রোগে একদিনের জন্যে ঘর করতে পায় নি। ইন্দুর খুব ইচ্ছে আছে, বুঝেছ?

হেরম্বনাথ কথা কহিলেন না।

গৃহিণী বলিতে লাগিলেন, প্রণয় কাল বিকেলে আসবে' বলেছে, তার আগে তুমি পুরুত মশাইকে ডাকিয়ে আশীর্ব্বাদের সময় কখন্ আছে জেনে নিও, কালই আশীর্ব্বাদ করব। বুঝলে ত?

বোধ হয় হেরম্বনাথের নিদ্রাবেশ আসিতেছিল, জড়িতমৃদুকণ্ঠে কহিলেন, হুঁ।

গৃহিণী অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিলেন। প্রণয়দের আর্থিক স্বচ্ছলতার কথা, তাহার উচ্চপদ, মোটা মাহিনার কথা, তাহার সৌখীনতার কথা, তাহার মোটর গাড়ীর কথা—বিনাইয়া বিনাইয়া নানা ছাঁদে বলিয়া

চলিলেন। হেরম্বনাথ কতক শুনিলেন, কতক শুনিলেন না—সাড়া দিলেন না। তিনি নিদ্রিত মনে করিয়া গৃহিণী ধাক্কাধাক্কি করিয়াও যখন সাড়া আদায়ে অক্ষম হইলেন, তখন পাস ফিরিয়া শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

হেরম্বনাথের সারারাত্রি ঘুম হইল না। ঘুম না হইবার এমন কোন গুরুতর কারণ ঘটিয়াছিল, তাহা বলা যায় না। ইন্দু যদি প্রণয়কে বরমাল্য দানে সম্মত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ত সমস্ত সমস্যারই সমাধান হইয়া গিয়াছে। প্রণয়ের ঐশ্বর্য্য, উচ্চপদ, বিলাস-ব্যসন যদি তাহার মনকে আকৃষ্ট করিয়া থাকে, তাহা হইলে ত আর কোন কথাই নাই, কিন্তু ইন্দু কি সেই মেয়ে?

হেরম্বনাথ প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া অন্ধকারে অনেক ভাবিলেন এবং শেষ এই মীমাংসায় উপনীত হইলেন যে ভগবান যাহা করেন তাহা মঙ্গলের জন্য।

এত বড় একটা সান্ত্বনা আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়া তিনি আর শয্যায় শুইয়া থাকিতে পারিলেন না। নিঃশব্দে উঠিয়া নীচে গিয়া ফুলবাগানের একটি বেঞ্চে বসিয়া তামাকের ফরমায়েস করিলেন। তখনও সকাল হয় নাই। তামাক পুড়িয়া ছাই হইবার পূর্ব্বেই সকাল হইয়া পড়িল।

গৃহিণী আসিয়া হাসিমুখে সোহাগ-স্বরে বলিলেন, কখন্ চুপি চুপি পালিয়ে এলে বল ত?

হেরম্বনাথ রসিকতা করিয়া বলিলেন, পালাব না ত কি ভয় করব?

গৃহিণী অভিমানভরা গলায় মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, তা নয় ত কি। আমি যে বাঘ, একদিন যদি বা কাছে এলুম, বাবু পালিয়ে এলেন বিছানা ছেড়ে।

হেরম্বনাথ বলিলেন, শ্লোকটা বলব নাকি?

—কি আবার শ্লোক ?

সেই যে—

দিন্‌কা মোহিনী
রাতকা বাঘিনী
পলক পলক লহু চোষে
দুনিয়া সব বাউরা হোকে
ঘর ঘর বাঘিনী পোষে।

গৃহিণী বক্রকটাক্ষসহকারে বলিলেন, থাক্ থাক্, খুব শ্লোক পড়েছ। শোন, পুরুত মশাইকে আনতে গাড়ীটা পাঠিয়ে দাও-না।

—গাড়ী পাঠাতে হবে ? এখনি ?

—গাড়ী পাঠালে এখনই চলে আসতে পারেন, নইলে কখন্ তাঁর ফুর্সৎ হবে, বুড়ো মানুষ শরীর যদি ভাল না-ই থাকে, হয়ত আসতেই পারবেন না, তার চেয়ে গাড়ীটা পাঠিয়ে আনানই ভাল।

—আচ্ছা, দিচ্ছি পাঠিয়ে।

ভৃত্যকে ডাকিয়া তদনুযায়ী আদেশ দেওয়া হইলে, গৃহিণী কহিলেন, শোন, তুমি যেন ইন্দুকে এখনি কিছু বলে বসো না।

হেরম্বনাথ বলিলেন, বলবো না ?

গৃহিণী কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন, বলতে চাও বলো। তবে আমি বলছিলুম কি, একেবারে আশীর্ব্বাদের সময় বললেই হবে।

হেরম্বনাথ তাহাই মানিয়া লইয়া তামাক টানিতে লাগিলেন। এই সময়ে টুথব্রাশে দাঁত ঘষিতে ঘষিতে এক মুখ ফেনা লইয়া ক্ষণা সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর দিদি ওঠে নি রে ?

—উঠেছে। অ-নে-ক-খো-ন।

—কোথায়?

—ওদিকের বারাণ্ডায় ইজিচেয়ারে শুয়ে আছে।

হেরম্বনাথ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন—শুয়ে কেন? অসুখ-বিসুখ নয় ত?

ক্ষণা শুনিতে না পায় এমন ভাবে কর্ত্তাকে ছোটখাট একটি ধমক দিয়া গৃহিণী বলিলেন, থাম, থাম! অসুখ হতে যাবে কেন।—ক্ষণাকে বলিলেন, এক মুখ ফ্যানা ক'রে দাঁড়িয়ে কি করছিস, যা মুখ ধুগে।

ক্ষণা চলিয়া গেল।

গৃহিণী রুক্ষস্বরে কহিলেন, সারা সকাল ভড়াৎ ভড়াৎ করে তামাকই টানবে? চা-টা খেতে হবে না? বলিয়া গৃহিণী উঠিয়া গেলেন।

পুরোহিত মহাশয় আসিলে সাবধানতা সহকারে গৃহিণী তাঁহাকে লইয়া কর্ত্তার বৈঠকখানায় বসাইলেন। সন্ধ্যার পরে আশীর্ব্বাদের লগ্ন পাওয়া গেল এবং দেখা গেল ফাল্গুন মাসের ২৯ তারিখে গোধূলিক্ষণে বিবাহের লগ্নও আছে।

হেরম্বনাথ তাড়াতাড়ি মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। গৃহিণী যতই নিঃসন্দেহ হউন না কেন, তাঁহার সন্দেহের অভাব ছিল না। স্ত্রী-চরিত্রের দৃঢ়তা যতই ক্ষণভঙ্গুর হউক না কেন, ইন্দুর সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল এবং এই আশঙ্কা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। এই যে সারা সকাল ইন্দু উপরেই থাকিয়া গেল, একটি বারও নীচে আসিল না, সম্ভাবিত পরিণয়জনিত লজ্জাই যে ইহার একমাত্র কারণ নহে, তাহা এই খোলাভোলা লোকটিরও অজানা ছিল না। বিবাহের

কথায় মেয়েরা লজ্জা পায় সত্য ; কিন্তু সে লজ্জা তাহাদিগকে লোকচক্ষুর অন্তরালে আবদ্ধ রাখিতে পারে না ! ঊষার তরুণালোকের মত রক্তরাগে তাহা প্রকাশই মাগে।

গৃহিণী বারম্বার বলিয়া দিয়াছিলেন, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই গৃহে ফিরিতে। কাজকর্ম্ম অনেক আগেই চুকিয়া গিয়াছিল কিন্তু গৃহে ফিরিতে হেরম্বনাথের মন সরিল না। তাঁহার মনে হইতেছিল, সন্ধ্যায় যাহা হইবার, হইয়া যাক্‌. তারপর বাড়ী ফিরিলেই হইবে। ইন্দুকে আশীর্ব্বাদ ? ভাবী জামাতাকে আশীর্ব্বাদ ?—তাহার জন্য দিন-ক্ষণ-লগ্ন খুঁজিতে হইবে না। সমস্ত দিনই সুদিন, সমস্ত ক্ষণই মাহেন্দ্রক্ষণ।

এদিকে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই প্রণয়কুমার আসিয়া বসিলেন। ঘটনাচক্রে ইন্দুর স্কুল-সহপাঠী কয়েকটি কিশোরী অপরাহ্নে আসিয়া পড়িয়াছে, ইন্দু তাহাদের লইয়া খুবই ব্যস্ত। গৃহিণীর পক্ষে ইহা শাপে বর হইয়া দাঁড়াইল।

প্রণয়কে একাকী পাইয়া কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া তিনি প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, ফাল্‌গুন মাসের শেষেই আমরা দিন ঠিক করেছি।

প্রণয় সাশ্চর্য্যে কহিলেন, কিসের দিন ?

গৃহিণী বলিলেন, কেন, আবুদি কিছু বলেনি তোমায় ?

'তোমায়' শব্দটি প্রণয়ের কাণে ও মনে খট্‌কা ধরাইয়া দিয়াছিল। অন্যমনস্কভাবে কহিলেন, বৌদি ? কৈ—কিছু ত—

—তাহ'লে বোধ হয় ভুলে গেছে। তাতে আর কি হয়েছে। আমিই বলি !—বলিয়া গৃহিণী একবার চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া লইলেন। দূরে

কোন ঘরে মেয়েরা হুল্লোড় করিতেছে, গানের শব্দও মাঝে মাঝে শুনা যাইতেছে, উচ্চ হাসির রোলও ভাসিয়া আসিতেছে! গৃহিণী মনে মনে বক্তব্যটি গুছাইয়া লইলেও বলিবার সময় বেশ গুছাইয়া বলিতে পারিলেন না।

বলিলেন—ইন্দুকে ত তুমি ভালবাস বাবা! তাই বলছিলুম কি, ফাল্‌গুনেই যাতে ছু' হাত এক হয়, তাই করতে হবে।

প্রণয় বিস্ময়-বিস্ফারিতের মত চাহিয়া বলিল, আপনি বিয়ের কথা বলছেন?

ইহার পরে গৃহিণী অনেক কিছুই বলিয়া চলিলেন, সে সকলের একটি কথাও প্রণয়ের কাণের মধ্যে প্রবেশ করিল না।

ইন্দুর মা ইদানীং আধুনিক পদবাচ্যা হইবার চেষ্টা করিতেছেন সত্য; কিন্তু আধুনিকতার কোন গুণই তাঁহার ছিল না। প্রণয়ের মনের ভাব তাহার নিকট সম্পূর্ণই অজ্ঞাত রহিয়া গেল। তিনি সেকাল ও একালের মধ্যে তাঁতির মাকুর মত ঘোরাফেরা করিতেছেন, কোথাও স্থির হইতে পারিতেছেন না। প্রণয়কে নির্ব্বাক নিরুত্তর দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, এই সময়ে একবার ইন্দুকে আনা দরকার। যেমন মনে হওয়া, অমনি আসন ত্যাগ।

—একটুখানি বস বাবা, ইন্দুকে বলি তোমার চা জলখাবার আনতে। — বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

ইন্দুদের ঘরে ঢুকিয়া আদর করিয়া বলিলেন, ইন্দু, একটু তাড়াতাড়ি নে মা, কাজ আছে।

মা বাহির হইবামাত্র মেয়েরা বিদায় লইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইলে ইন্দু সকাতরে বলিল—না ভাই, এখনই না।

—তোমার মা যে ভাই—

—তা হোক্ !

প্রণয় আসিয়াছে এবং ইহারা বিদায় লইলে ছাগশিশুর মত তাহাকে যূপকাষ্ঠের সম্মুখীন হইতে হইবে ইহা মনে করিতেও ইন্দুর দেহ-মন অবশ হইয়া আসিতেছিল।

গৃহিণী প্রণয়কুমারের চা-জলখাবারের বন্দোবস্ত করিয়া হল-ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, প্রণয় কক্ষের মধ্যস্থলে অবনতাশরে দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহাকে দেখিবামাত্র প্রণয় বলিল, আজ আমি চললুম।

গৃহিণীর মাথায় যেন বাজ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার কণ্ঠ দিয়া একটি শব্দও বাহির হইতে চাহিল না। কিন্তু না বলিলেও নয়। প্রণয় যে পা বাড়াইয়া দাঁড়াইয় আছে।

—তোমার চা খাবার—

—আজ থাক। বিশেষ কাজ আছে—বলিয়াই প্রণয় অদৃশ্য হইয়া গেল।

গৃহিণী অনেকক্ষণ স্তম্ভিতের মত বসিয়া রহিলেন। মেয়েদের হাস্য-কলরোল তাঁহার কাছে ভূতের অট্টহাস্য বলিয়া বোধ হইতেছিল।

প্রণয়ের বিদায়বার্ত্তা ইন্দু জানিতে পারে নাই। মেয়েদের সে কিছুতেই ছাড়িবে না। কিন্তু গৃহিণীর পক্ষে রঙ্গ-তামাসা সহ্য করা এখন অসম্ভব। তিনি ক্ষণাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া বলিলেন, দিদিকে বল, এইখানে আসতে!

ক্ষণা মায়ের কণ্ঠ ও ভাব অনুকরণ করিয়া সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিতে মেয়েদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি আরম্ভ হইয়া গেল। ইন্দু তাহাদের সামনে আর একটি মুহূর্ত্তও দাঁড়াইতে পারিতেছিল না।

অথচ ঠিক এই মুহূর্ত্তে এই সভা ভঙ্গ করা সহজ নহে; সভা ভাঙ্গিয়া দিলে বন্ধুদের মধ্যে নানারূপ আলোচনার সৃষ্টি হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। সব দিক ভাবিয়া ইন্দু বিহ্বল হইয়া পড়িল। ইহারই মধ্যে তাহার একটি বন্ধু ক্ষণাকে ধরিয়া কতকটা রহস্য বাহির করিয়া লইয়াছিল, সেই অগ্রসর হইয়া ইন্দুকে শুনাইয়া অন্য সকলকে কহিল, ভারি অন্যায় হয়ে গেছে ভাই! ছিঃ ছিঃ, তিনি এতক্ষণ ধরে বসে আছেন আর আমরা ইন্দুকে আটকে রেখেছি! ভারি অন্যায়, ভারি অন্যায়। চল, চল।

'চলিতে' কাহারও আপত্তি ছিল না, কিন্তু যিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া আছেন সেই তিনিটি কে, তাহা না জানিয়া চলাও যায় না। এক সঙ্গে অনেকেই প্রশ্ন করিয়া উঠিল, কে বসে আছেন ভাই?—তাহারা ইন্দুকে ধরিয়া পড়িল, বলবি নে ত? আচ্ছা ভাই, দেখা গেল। বুঝলুম! বেশ ভাই বেশ!

ক্ষণা এক পাশে দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল, একজন গিয়া তাহাকে ধরিল, কে বসে আছেন ক্ষণা?

ক্ষণা বলিল, কৈ, কেউ বসে নেই ত!

যিনি গোপনীয় তথ্য আবিষ্কার করিয়া কলম্বাস-সুলভ গর্ব্ব ও আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন, সকলে তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল। অনন্যোপায় হইয়া তিনি পুনরায় ক্ষণার আশ্রয় লইলেন। ক্ষণার কাণে

কাণে কি বলিলেন, ক্ষণা তাহার উত্তর বেশ মোটা করিয়াই দিল ; বলিল—প্রণয়দা ত ! তিনি ত চলে গেছেন !

প্রণয় দা কে, প্রণয়ের সঙ্গে পরিণয়ের নিকট সম্বন্ধ আছে কি না, তিনি কবে হইতে আসিতেছেন, কি করেন, দেখিতে কেমন ?—প্রশ্নশরজালে ক্ষণা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল।

দিদির মুখের পানে চাহিয়া ক্ষণা হতভম্ব হইয়া গেল। দিদি একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে।

দিদির বন্ধুরা তবুও ছাড়ে না। প্রণয় রোজ আসেন কি না, দিদির সঙ্গে গল্প করেন কি না, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ক্ষণা বলিল, প্রণয়দা দিদিকে বিয়ে করতে চায় ! বলিয়াই সে ছুট দিল।

—হ্যাঁ ভাই ইন্দু, আমাদের বলবি নে ভাই ?

ইন্দু বলিল, কি বলব ?

একটি মেয়ে ঝাঁঝিয়া উঠিয়া বলিল, নেকু খুকু আমার ! কিছু জানেন না, ভাজা মাছটি উল্টে খেতেও জানেন না গো !

ইন্দু কথা বলিল না।

সখীরা বলিলেন—আমাদের দেখাবি নে ?

—কি দেখাব ?

—বর।

ইন্দু আস্তে আস্তে অথচ প্রত্যেকটি শব্দ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিয়া কহিল, আমার বরকে তোরা সবাই দেখেছিস।

—যাঃ, মিথ্যে কথা ! কেন ভাই আমাদের ঠকাও। আমরা ত ভাই চিল নই যে ছোঁ মারব ! তোমার বরটিও পান্তুয়া নয় যে খপ্ করে ধরে

টপ্ ক'রে পেটে পুরে ফেলব! এই বুঝি আমরা বন্ধু তোমার!—অভিযোগের আর অন্ত নাই।

ইন্দু বলিল, আমি ত বলেছি ভাই, তোমরা দেখেছ তাঁকে।

—কবে দেখলুম বল?

—কত দিন, কত বার দেখেছ! আজ ক'দিন এ বাড়ীতে আসেন না তাই, নইলে যখনই তোমরা এসেছ, তাঁকে দেখেছ—

একজন বলিল, ওঃ, সেই বিমলবাবু?

ইন্দু নতচক্ষু।

তবে যে ক্ষণা বললে, কে প্রণয়—

—বিয়ে ত একবারই হয় ভাই। আমার বিয়ে তাঁর সঙ্গে হয়ে গেছে আবার যদি বিয়ে করতে হয় তাহ'লে যমকেই করব।

ক্ষণা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, দিদি, বাবা এসেছেন, তোমায় ডাকছেন! ছুট্‌টে!

আঃ! ইন্দু বাঁচিয়া গেল। প্রবল গ্রীষ্মের পর বারিধারায় ধরিত্রী যেমন শীতল হয়, পিতার আগমন-সংবাদে ইন্দুর মনও শান্তি লাভ করিয়া বাঁচিল

—বাবা কোথা রে?

—নীচে, বাগানে।

—মা?

—ওপরে, শুয়ে আছেন। বাবা তোমায় চুপি-চুপি ডেকে আনতে বললেন। এস!

ইন্দুর বিরস মুখে হাসির রেখা ফুটিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ইন্দু ও ক্ষণা বাহিরের ঘরে আসিল। পিতা আরাম-কেদারাটায় সোজা হইয়া বসিয়াছিলেন, দু'জনকে হাত বাড়াইয়া কাছে লইয়া কেদারার দুই হাতলে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। ইন্দুর ম্লান মুখের পানে চাহিয়া হঠাৎ কোন প্রশ্ন করিতে সাহস হইতেছিল না। অথচ সংবাদের জন্য তাঁহার অন্তরটা, জলকষ্টপ্রপীড়িত চাতকের মত খাঁ খাঁ করিতেছিল। ইন্দু নিজে হইতে কোন কথা বলিবে না, সে স্বভাবই তাহার নয়। কি ভাবে কথাটা পাড়িলে সহজ, সরল ও পরিষ্কার হয় তাহা ভাবিয়া না পাইয়া তিনি ক্ষণাকে বলিলেন, ক্ষণা, ঠাকুরকে বল্ ত একটু চা আনুক; অমনি লছমনকে তামাক দিতে বলিস্।

—শুধু চা, বাবা?

—হ্যাঁ, শুধু চা।

ক্ষণা চলিয়া গেলে, হেরম্ব যেন অনেকখানি সাহস সঞ্চয় করিলেন। ইন্দুর গৌর-সুন্দর বাহুখানিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রণয় এসেছিলেন?

ইন্দু বলিল, হ্যাঁ।

হেরম্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, তারপর?

ইন্দু বলিল, আমি কিছু জানি নে বাবা। আমার সঙ্গে দেখা হয় নি।

হেরম্বনাথ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। যাক্, দেখা হয় নাই। সব কথার শেষ যেন ঐ খানেই হইয়া গেল! তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া দ্বারের পানে চাহিয়া চা ও তামাকের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কতক-

গুলি লোক আছে তাহারা দূরের পানে চাহিতে চায় না। আপাতসুখে তাহাদের সন্তোষ; সম্মুখ-বিপদের আশঙ্কা না থাকিলেই তাহারা নির্ভীক। হেরম্বনাথ এই দলের লোক। প্রণয় আসিয়াছিল, সে সংবাদ তিনি দ্বারবানের কাছেই পাইয়াছিলেন। তাঁহার গৃহিণী, প্রণয়, ইন্দু, পুরোহিত ঠাকুর প্রভৃতি মিলিয়া যে ঘটনা ঘটিবার কথা আজ ছিল, তাহা ঘটে নাই শুনিয়া আজিকার দিনের মত তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া গেলেন।

ইন্দু এই সুযোগে পিতার কাছে অনেক কথাই বলিতে চাহিতেছিল, কিন্তু কি ভাবে আরম্ভ করা যায়, সেও যেন তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না। তাহার প্রতি পিতার আদরের অপ্রাচুর্য্য ছিল না। যে ভাবেই কথা বলুক না কেন, পিতার নিকট তাহার কথা অপ্রীতিকর হইবার সম্ভাবনা যেমন আদৌ নাই, পিতার অপ্রিয় হইবার আশঙ্কাও তাহার তেমনি নাই। তবুও কেন যে কথা যুয়ায় না, তাই সে ভাবিতেছিল।

অকস্মাৎ যেন কথার সূত্রটি খুঁজিয়া পাইয়া হেরম্ব অতি মাত্র প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন; বলিলেন, কাল কেমন থিয়েটার দেখলি বল?

ইন্দু বলিল, আগেও আর একদিন দেখেছিলুম বাবা, বেশ প্লে।

হেরম্ব বলিলেন, ঐ একই বই দু'দিন?

—হ্যাঁ, সে দিন খুব ভাল লেগেছিল। কাল—

হেরম্ব হাসিয়া বলিলেন, কাল ভাল লাগল না

ইন্দু বলিল, না।

—এক বই একবারের বেশী ভাল লাগে না।

তাই কি! ইন্দু ভাবিতেছিল, তাই কি! না—না—না!

মুখটি নীচু করিয়া বলিল, কাল ছায়াকে দেখলুম বাবা।

—ছায়া কে রে?

যে মেয়েটিকে পড়ান্। কাল দেখা হয়েছিল।—বলিয়া ইন্দু মুখ নমিত করিল।

হেরম্বনাথ বলিলেন, বিমলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল? কি বললে?

ইন্দু বলিল, ছায়াদের সঙ্গে এসেছিলেন; আমার সঙ্গে কথা হয় নি। —মা পছন্দ করেন না।

হেরম্বনাথ শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিলেন। তাড়াতাড়ি বলিলেন, হ্যাঁ। মা ইন্দু, প্রণয় বাবুর সঙ্গে তোর ভাব হয়েছে?

ইন্দু বলিল, তিনি মার আবুদি'র দেওর।

—তোর সঙ্গে ভাব হয়েছে?

—ভাব তুমি কা'কে বল বাবা?

কথাবার্ত্তা বাঁকা পথ ধরিতেছে বুঝিয়া হেরম্ব অধিকতর শঙ্কিত হইয়া পড়িতেছিলেন। তিনি আর কোন কথা বলিতে সাহস পাইতে-ছিলেন না।

কিন্তু ইন্দু সেইখানেই নিবৃত্ত হইল না। সে বলিল, রোজ একবার করে আমাদের এখানে আসেন; একদিন আমাকে আর ক্ষণাকে নিয়ে বেড়াতে গেছলেন; কাল তাঁদের বাড়ীতে আমাদের খাইয়েছিলেন!

—ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। না?

—তাই ত' শুনেছি।

চা আসিল, পরক্ষণে তামাকও আসিল। হেরম্বনাথ চা পানান্তে তামাকে মনঃসংযোগ করিলেন।

অনেকক্ষণ কেহ কোন কথা বলিল না। অ্যালবোলার শব্দ ছাড়া শব্দ

নিস্তব্ধ। অনেকক্ষণ পরে ইন্দু বলিল, বাবা, তুমি জজ-সাহেবের বাড়ী জান?

—কে জজ-সাহেব?

ইন্দু সে পরিচয় দিতে পারিল না। সে কথাটা জানিয়া লওয়া হয় নাই। জজ-সাহেব যে একাধিক থাকিতে পারেন তাহা সে জানিত না; জানিলে এবং স্থবিধা হইলে, সবিশেষ পরিচয় জানিয়া লইত।

পিতা পুনরপি বলিলেন, কোন্ জজ-সাহেব?

ইন্দু বলিল, জজ-স্যাহেবের মেয়েকে পড়ান।

—বিমল পড়ায়?

—হ্যাঁ। তাঁর নাম ছায়া। আমাকে কাল ছায়া অনেক করে বলে-ছিলেন, একদিন তাঁদের বাড়ী যেতে। তাই বলছিলুম, তুমি যদি জানতে, তাহলে আজ একবার তোমাতে আমাতে যেতুম। ছায়া খুব সুন্দর মেয়ে।

—কোথাকার জজ-সাহেব? হাইকোর্টের? বাঙ্গালী জজ?

ইন্দু বলিল, তবে এক কাজ করা যেতে পারে। জ্যেঠাইমাদের বাড়ীতে গিয়ে জজ-সাহেবের ঠিকানা জেনে নিলে হয়।

ইন্দুর মুখখানি ক্ষণেকের জন্য উৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; পর মুহূর্ত্তেই দীপ্তিটুকু মুছিয়া গেল। বলিল, কিন্তু তা কি ক'রে হবে? তিনি ত' এই সময় জজ-সাহেবের বাড়ীতেই থাকেন।

হেরম্বনাথ ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিলেন, তা বটে!

ইন্দু সোৎসাহে বলিল, হয় ত' জ্যেঠাইমা ছায়াদের বাড়ীর ঠিকানা জানতে পারেন!

ইন্দু দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, যাবে, বাবা? কতদিন জ্যেঠাইমাকে দেখি নি; যাবে?

—তা যেতে পারি।

—তবে চল বাবা, এই বেলা ঘুরে আসি।

—ক্ষণা যাবে?

—ক্ষণা থাক। চল-না, আমরা দু'জনে বেড়িয়ে আসি।

খবর লইয়া জানা গেল গৃহিণী ঘরের বাতি নিবাইয়া শুইয়া আছেন, সম্ভবতঃ নিদ্রিত। ক্ষণা উপরের ঘরে বসিয়া লেখাপড়া করিতেছে। পিতা-পুত্রী বাহির হইয়া গেলেন।

ইন্দুর অনুমান সত্য, বিমল জজ-সাহেবের কন্যাকে পড়াইতে গিয়াছে, এখনও ফিরে নাই—ফিরিতে তাহার দশটা বাজে। বহুকাল পরে হেরম্ব-নাথকে দেখিয়া বিমলের মা'র পতিশোক উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি এক হাতে চক্ষু মুছিলেন, অন্য হাতে ঠাকুরপো'র সামনে যৎসামান্য মিষ্টান্ন ধরিয়া দিলেন। তারপর ইন্দুকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া ভিতরের ঘরে চলিয়া গেলেন।

এই মেয়েটিকে কাছে পাইবামাত্র এই ধুলিমলিন, ছায়ান্ধকার কক্ষের মানসিক চিত্রটি যেন নিমেষে পরিবর্তিত হইয়া গেল। যেন অন্ধকার আকাশে চন্দ্রোদয় হইল—ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো পড়িয়া ঘর হাসিয়া উঠিল। হঠাৎ মনে হইল, এই সব ভাঙ্গাচোরা আসবাব নাই, এই মলিন শয্যা আর নাই, হতশ্রী তৈজসপত্র নাই। এই মেয়েটির শুভাগমনে, তাঁহার কোমল-করস্পর্শে সমস্তই রমণীয় রূপ ধারণ করিয়াছে। অনুপস্থিত পুত্রের বাম পার্শ্বে এই কৃশাঙ্গী কিশোরীকে বসাইয়া মা চোখের জল সম্বরণ

করিতে পারিলেন না। ইন্দুকে তিনি প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে চাহেন, পারেন না, চোখের জল কণ্ঠ রোধ করে। যতবার কিছু বলিতে যান, বাষ্পোচ্ছ্বাসে শব্দ অবলুপ্ত হয়, কথা বাহির হয় না।

অবশেষে মেয়েটিকে বুকে চাপিয়া বাহিরে আসিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, ঠাকুরপো, ইন্দুকে তুমি আমায় দাও।

হেরম্বনাথ কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে তিনি আবার বলিলেন, তাঁর ছেলেটিকে দিয়ে তোমার মেয়েটিকে নেবার বড় সাধ তাঁর ছিল। তিনি নেই ঠাকুরপো, তুমি আছ। তাঁর ইচ্ছা যাতে পূর্ণ হয়, তাই কর। ইন্দুকে আমায় দাও।

হেরম্বনাথ বলিতে গেলেন, সে ত' নিশানাথ দা'—

বৃদ্ধা আবেগাতিশয্যে কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিলেন, আমি কোন কথা শুনব না ভাই। আমার বিমলকে তুমি নাও, ইন্দুকে আমায় দিয়ে যাও। সেই শেষদিনে এই কথাটিই তিনি বলতে চেয়েছিলেন—

হেরম্বনাথের মনে সেদিনের স্মৃতি জাগ্রত ছিল, বলিলেন, ইন্দু ত' আপনারই বৌদি!

—কথা দিচ্ছ ঠাকুরপো, মনে থাকে যেন!

—মনে থাকবে বৈ কি!

বৃদ্ধা এইবার পরম আত্মীয়ার মত ইন্দুকে বুকে চাপিয়া এক হাতে তাহার অশ্রুসিক্ত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, গরীবের ভাঙা ঘরে কি মন উঠবে না মা?

ইন্দুর চোখ দিয়া দরদর ধারে অশ্রু গড়াইতেছিল, জ্যেঠাইমার কাঁধের উপরে মাথা রাখিয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

বিমলের মা বলিলেন, ভগবান তোমায় আজ এখানে এনে দিয়েছেন ঠাকুরপো। তুমি না এলে আমাকেই তোমার কাছে যেতে হত। সব কথা ছেলে ত' খুলে বলে না ভাই, তবে কথার ভাবে বুঝলুম তোমরা কোন্ এক হাকিমের সঙ্গে ইন্দুর সম্বন্ধ করছ। ছেলে আমার আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছে ভাই! তোমাদের কথা উঠলে বাছার আমার দুটি চক্ষে সহস্র ধারা বইতে থাকে। আমি যত বলি, তোমার কাকাবাবু কি তাঁর বন্ধুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে পারেন?—ছেলে তত বলে অপদার্থ গরীবের ভাঙ্গাঘরে রাজরাণীকে পাঠাতে কোন্ বাপ বা প্রাণ ধরে পারে মা?

ইন্দুর বুকের ভিতরটা ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল। হায়! সে'ও কেন গরীব হইল না! যে চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া গিয়াছে, যে চোখে পলক নাই, যে চোখে শুধুই ধারা, সেই দুটি চক্ষু তুলিয়া ইন্দু বাপের পানে চাহিয়া রহিল।

পিতা কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে জ্যেঠাইমা বলিলেন, বিমল গরীব সত্যি, কিন্তু তুমি ত' ভাই গরীব নও। ভগবানের ইচ্ছেয় তোমার রাজার ভাণ্ডার। ক্ষণা, ইন্দু—দুটো খুদকুঁড়ো তোমার। তোমার যা কিছু সবই ত' ওদের ঠাকুরপো। তুমি মনে করলে—

হেরম্বনাথ হাসিয়া বলিলেন, সেই ত' হচ্ছে মুস্কিল বৌদি। যেমন পাগল বিমল, তেমনই পাগল আমার এই মেয়েটা! বলে কি-না, আমার পয়সা নেবে না!

জ্যেঠাইমা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, ওমা! এমন অনাসৃষ্টি কথা ত' কখনও শুনি নি মা!

হেরম্বনাথ বলিলেন, তবে আর বল্‌ছি কি!

এ সময়ে এখানে কথা কওয়া উচিত নয়, ভাল দেখায় না, বরং বাচালতাই প্রকাশ পায়—ইন্দু সবই জানিত; তবুও সে কথা না বলিয়া পারিল না, অতি ধীর কণ্ঠে, শুধু জ্যেঠাইমাই শুনিতে পান, এমন ভাবে বলিল, কেন জ্যেঠাই-মা, তিনি যখন রোজগার করবেন, তখনই আমায়—কথাটা বাধিয়া গেল; পরমুহূর্ত্তেই বলিল, তখনই হবে।

—ততদিন কি বিমল কেঁদে কেঁদে ভেসে ভেসে বেড়াবে মা?—বলিতে বলিতে বৃদ্ধা আবার কাঁদিয়া ফেলিলেন। চোখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, ওসব কোন কাজের কথা নয় ঠাকুরপো। তুমি শীগগির শীগগির যাতে দু'হাত এক হয় তাই কর ভাই!

—আমার ত তাই ইচ্ছে! আপনি একবার বিমলকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন—আপিসেই যায় যেন!

ইন্দুকে কাছছাড়া করিতে বুড়ীর প্রাণ যেন চায় না। কোন এক অদূর দিনেই ইন্দুকে নিজস্ব, একান্ত নিজস্ব করিয়া পাইবেন, মনকে পুনঃ পুনঃ এই প্রবোধ দিয়া, তাহার মুখে, মাথায়, দুটি হাতে অজস্র আশীর্ব্বাদ ও অনেকগুলো চুম্বন ঢালিয়া দিয়া তবে ইহাদের বিদায় দিতে পারিলেন! হেরম্বনাথ গাড়ীতে উঠিয়া বসিলে, ইন্দুকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন, মনে থাকে যেন ঠাকুরপো।

হেরম্বনাথ বলিলেন, মনে থাকবে বৈ কি বৌদি।

মোড় ফিরিতেই বাড়ীখানা অদৃশ্য হইয়া গেল। ইন্দুর মন বলিতেছিল,

সে যেন নিজের গৃহ হইতে অন্য কোথায় যাইতেছে। মনে অপ্রসন্নতার লেশমাত্র ছিল না। সারা পথ বাপের সঙ্গে আজে-বাজে কথা কহিতে কহিতে চলিল, মস্ত একটা বোঝা আজ নামিয়া গিয়াছে। বাবা আজ যে কথা দিয়াছেন, তাহা ভাঙ্গিতে পারিবেন না, ভুলো প্রকৃতির বাপের সম্বন্ধে এ বিশ্বাস তাহার ছিল।

বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া পিতা বলিলেন, ঐ যা, জজ-সাহেবের ঠিকানাটা ত' জানা হল না।

কন্যা কহিল, সে তখন আর একদিন হবে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আমাদের হাকিম-সাহেব প্রণয়কুমার কোথায়? আমরা গল্প-লেখকগণ সর্ব্বজ্ঞ বলিয়াই বলিতে পারিতেছি, প্রণয়কুমারকে বড়ই মনস্তাপ পাইতে হইতেছে। মনস্তাপের অনেক কারণ। আমরা সকল কথা এখনই বলিতে পারিতেছি না বলিয়া দুঃখিত। একটা কথা এই যে, ইন্দুদের বাড়ীতে বড়ই দাগা পাইতে হইয়াছে। কলিকাতা শহরের সভ্য সমাজে এমন একটা অদ্ভুত পরিবারের অবস্থিতি প্রণয়কুমার কল্পনাতে আনয়ন করিতে পারেন নাই। দুই দশ দিন কোন বাড়ীতে গিয়া বয়স্কা তরুণীদের সঙ্গে মিশিলেই বিবাহ-প্রস্তাব দ্বারা আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা আজকালকার দিনে অতীব বিরল, ইহাই তিনি জানিতেন। শুধু তিনি কেন? শতকরা নিরানব্বইটি তরুণ-তরুণীকে জিজ্ঞাসা করিলেও জানা

যাইবে যে ইহার অপেক্ষা আজগুবি ব্যাপার হইতেই পারে ন। অত্যন্ত প্রাচীন ও বর্ব্বরযুগের প্রথাসমূহ যে সভ্যতালোকোদ্ভাসিত কলিকাতা শহরেও বর্ত্তমান, ইহা মনে করিতে প্রবৃত্তি না হওয়াই স্বাভাবিক।

প্রণয়কুমার সেই যে ইন্দুর বাড়ী হইতে চলিয়া আসিয়াছেন, সে পথ আর মাড়ান নাই; কোন দিন মাড়াইবেন এমন ভরসাও নাই। সভ্য সমাজে যাহারা মিশিতে জানে না, তাহাদের সঙ্গে মিশিবার প্রবৃত্তি ও পর্য্যাপ্ত অবসর তাঁহার নাই। তিনি ছায়াদের গৃহে আসিয়া উদয় হইলেন।

মিসেস ঘোষ মনে মনে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন, ছায়া যাহাতে বাজে কথায় ও গল্পে সময়ক্ষেপ না করিয়া পড়া-শুনায় মনোযোগী হয়, তৎপ্রতি তাঁহাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেই হইবে। রাত্রিটুকু ছাড়া সকল সময়ই মা মেয়ের সঙ্গে ছায়ার মত রহিয়াছেন। চেনা-শুনা-জানা যত মেয়ে দেখিয়াছেন, যা দেখিতেছেন, ম্যাট্রিক পাস করে নাই এমন একটি মেয়েও তাঁহার চোখে পড়ে নাই। বিমলের সেই ছাত্রীটি—ইন্দু যাহার নাম—বয়সে কত ছোট, সেও পাস করিয়াছে, করে নাই কেবল তাঁহার কন্যা। বিমল বলিয়াছে, মনোযোগ দিলে সেও পারিবে—যাহাতে মনোযোগ দেয় তাহাই করিতে হইবে। অন্যমনস্ক হইয়া যাহাতে ছায়া লেখাপড়ায় অবহেলা না করে, তাহাই দেখিতে হইবে।

মিসেস ঘোষের এই যখন মনোভাব, সেই সময়ে তরণীহীন বিভ্রান্ত নাবিকের মত প্রণয়কুমারের আবির্ভাব। মিসেস ঘোষ তাহাকে বসাইয়া গল্প করিলেন, চা খাওয়াইলেন, অভিনয়ের, রচনার অজস্র প্রশংসা করিলেন, কেবল ছায়াকে ডাকিলেন না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত

হইলেও ছায়ার দর্শন মিলিল না দেখিয়া, প্রণয় বলিলেন, ছায়াকে দেখছি নে যে!

—ছায়া পড়ছে। এইটুকু বলিয়াই মিসেস ঘোষ প্রসঙ্গান্তর সুরু করিয়া দিলেন।

এইরূপে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা হইতে রজনীর প্রথম যামও অতীত হইল। প্রণয়কুমার সেখান হইতেও উঠিলেন এবং আর আসিবেন না এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াই গেলেন। কিন্তু সঙ্কল্প ঠিক রহিল না। পরদিন আদালত হইতে সোজা ছায়াদের গৃহে হাজির হইয়া দেখিলেন, ছায়া একাকিনী বসিয়া এস্রাজের তার বাঁধিতেছে।

খবর পাওয়া গেল, মা আদালত হইতে বাবাকে তুলিয়া লইয়া বালিগঞ্জে মল্লিক-সাহেবের গৃহে চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছেন। ফিরিতে রাত্রি আটটা হইতে পারে।

প্রণয় বলিলেন, এমন বিকেলটা ঘরে বসে কাটাবে ছায়া?

ছায়া মৃদু হাসিয়া বলিল, কি আর করি বল!

চল না একটু বেড়িয়ে আসি। সারাদিন আজ মেঘ করেছিল, এখন মেঘ কেটে গেছে, রৌদ্র উঠেছে, ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে বাইরেটা।

ছায়া ম্লান হাস্যে কহিল, কোথায় আর মেঘ কাটল প্রণয়-মামা?

…above the sunless sky
Big with clouds, hangs heavily
And behind the tempest fleet
Hurries on with lightning feet

Driving sail, and cord. and plank
Till the ship has almost drank
Death from the over-brimming deep···

প্রণয় মুগ্ধের মত কহিলেন, শেলীর কবিতা এমন সুন্দর করে আবৃত্তি করতে ক'জন বাঙ্গালীর মেয়ে পারে !

ছায়া কহিল, তা জানিনে, তবে অনেক মেয়ে ম্যাট্রিক পাস করেছে তা দেখতে পাই।

প্রণয় বলিলেন, ড্যাম ম্যাটিক। চল ছায়া, খানিক ঘুরে আসি। এমন সুন্দর বিকেলটা বসে বসে কাটাতে কি ভাল লাগে ?

—কিছুই ভাল লাগে না প্রণয়-মামা। মনটা ভীতু সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে গেছে, আর সে কুণ্ডলী ছেড়ে বার হবে না।

প্রণয় বলিলেন, বাঁশীর ধ্বনি শুনলেই সাপ ফনা ধরবে।

ছায়া হাসিল, কথা কহিল না। কিন্তু তাহার মন বলিল, বাঁশী ! বাঁশীই কি আর বাজবে ?

প্রণয়কুমার ছায়ার ক্রোড় হইতে এস্রাজটি সরাইয়া লইয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন, তারপর ছায়ার একখানা হাত ধরিয়া বলিলেন, চল না ছায়া।

—মাপ কর প্রণয়-মামা। আমার আর ভাল লাগে না, মাও পছন্দ করেন না।

মা কি পছন্দ করেন না সে কথা ছায়া স্পষ্ট করিয়া বলিল না ; প্রণয়ও কথাটা খোলসা করিয়া লইতে সাহস পাইলেন না। মুখখানি অপ্রসন্ন করিয়া বসিয়া রহিলেন। মুখ দেখিয়া ছায়া তাঁহার দুঃখ বুঝিল,

বুঝিয়াই সে চঞ্চল হইয়া উঠিল, বলিল, বারে আমি! প্রণয়-মামা তখন থেকে বসে আছেন, চাও দিতে বল্লাম না, কিছু না। ভারি অন্যায় হয়ে গেছে, কিছু মনে ক'র না প্রণয় মামা, আমি এখনই আনাচ্ছি। কি দেবে, চা?

প্রণয় বিরস মুখে কহিলেন, না। আমি চা খেতে আসিনি।

ছায়া উচ্ছ্বসিত হাস্যের সহিত বলিল, তবে?—বলিয়াই সে আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইয়া জানালাটার দিকে চাহিয়া কহিল, মিঃ রায় আজ এখনও এলেন না কেন?—বলিয়া উঠিয়া গিয়া পাতলা পর্দ্দাটা সরাইয়া বাগানের হাতাটা দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিল।

প্রণয়কুমার বলিলেন তুমি কি আজকাল বার হও না ছায়া? না, আমার সঙ্গে বার হতে আপত্তি?

ছায়া হাসিয়া কহিল, তোমার কি মনে হয়?

প্রণয় গম্ভীরভাব বলিলেন, আমার মনে হওয়ার মূল্য কি বল? মিঃ রায়টি কে? নিউ অ্যাচিভমেণ্ট (নূতন লাভ)?

—মাই গড! প্রণয়-মামা তুমি যেন কি! মিঃ রায়ের কাছে আমি পড়ি যে! কেন, তোমার সঙ্গে ত তাঁর আলাপ আছে।

—আই সি! (ও তাই!)—তাঁর আসবার সময় হয়েছে বুঝি?

—হাঁ এই সময়ই ত' আসেন।

—কতক্ষণ পড়?

—পড়ি ত' মাথা আর মুণ্ড! তবে বই নিয়ে বসে থাকতে হয় অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত।

বয় পর্দ্দার বাহির হইতে মাষ্টার সাহেবের আগমন-বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিল।

ছায়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া মিটি মিটি হাসিতে হাসিতে কহিল, প্রণয়-মামা কি করবে? বসবে? তা বেশ ত', বস না, মার সঙ্গে গল্প করোখন।

—থ্যাঙ্কস্! তোমার মা'র সঙ্গে গল্প করা ছাড়া আমার অন্য কাজ থাক্‌তে পারে।

ছায়া প্রণয়ের জন্য পর্দ্দাটা সরাইয়া ধরিয়া বলিল, ভেরী সরি টু ডিসাপয়েণ্ট। (তোমাকে নিরাশ করার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত।)

—থ্যাঙ্কস্ এগেন!—বলিয়া কোন দিকে না চাহিয়া প্রণয় বাহির হইয়া গেলেন। দ্বারপার্শ্বে হ্যাট-র‍্যাকে রক্ষিত টুপি ও ছড়ি তুলিয়া লইয়া ক্ষুদ্র একটি গুড্ নাইট বলিয়া বিদায় লইলেন।

ছায়া বলিল, গুড নাইট।

গাড়ী ফটকের বাহির হইয়া গেলেও ছায়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে তাহার ক্লান্তি বোধ হইতে লাগিল। কিয়ৎ পরে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আস্তে আস্তে পড়ার ঘরে চলিয়া গেল।

হতাশা মানুষকে পীড়া দেয় সত্য; কিন্তু কতখানি পীড়া দেয়, তাহ কি কেহ অনুমান করিতেও পারে? প্রণয়কুমারের কোন আত্মীয়বিয়োগ হয় নাই, আমার পাঠক-পাঠিকারা তাহা জ্ঞাত আছেন; তাঁহার চাকুরী লোপও হয় নাই; মাহিনাও কমে নাই; যে ব্যাঙ্কে তাঁহার অর্থ গচ্ছিত সে ব্যাঙ্কও লাল-বাতি জ্বালে নাই! অথচ তিনি যখন জজ-সাহেবে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গড়ের মাঠের স্বল্পালোকিত পথে লক্ষ্যহীন পথিকের মত মোটর চালনা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার মুখের দিকে চাহিলে তাঁহার অতি বড় আত্মীয়বর্গও চমকিয়া উঠিত। মুখে যেন কে এক পোঁচ কালী মাখাইয়া দিয়াছে; চক্ষু দু'টি যেন সেই লজ্জায় লুকাইতে

পারিলে বাঁচে। আপনারা বলিতে পারেন, এতখানি কি হয়? কিসে কি হয় তাহা আমি কি জানি। যাহা হইয়াছিল তাহাই আমি বলিলাম।

ইডেন গার্ডেনে অসাধারণ জনসমাগম; ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধসন্নিকটে স্বাস্থ্যান্বেষীর ভিড়, ষ্ট্র্যাণ্ডে মোটরের ছড়াছড়ি, চৌরঙ্গীতে চলা দায়। কোন রাস্তাই প্রণয়কুমারের ভাল লাগিল না। লেখকের এক মগুপ বন্ধু ছিলেন। জন্মদিনে, স্ত্রীর নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, মদ্যপান করিবেন না। দুই তিন দিন শুষ্কাবস্থায় কাটিল। তারপর হাই উঠিতে লাগিল। তাঁহার যে সকল বন্ধু পেগ্ টানে, তাহাদের বাড়ী যাইতে ইচ্ছা হইল। মনকে বুঝাইলেন, খাইবেন না, দেখিবেন। প্রথম দিন সত্যই দেখিলেন, দ্বিতীয় দিন তদতিরিক্ত কিছু না করিয়া পারিলেন না। তরুণী-সঙ্গ-সুখে দারুণ অনিচ্ছা লইয়া প্রণয়কুমার দুই তিন ঘণ্টা মাঠে মাঠে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে 'শুধু দেখিব' ভাবিয়া এক মিসেস্ সরকারের গৃহের উদ্দেশে ছুটিলেন।

মিসেস সরকারের অন্য পরিচয় অজ্ঞাত। শহরের সৌখীন লোক শুধু ইহাই শুনিয়াছে যে তিনি নৃত্যগীতনিপুণা; অনেক বড় ঘরের মেয়েদের লইয়া তিনি একটি গানের ক্লাস খুলিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার ছাত্রীরা এম্পায়ার মঞ্চে "রাস পূর্ণিমা" নামে একখানি গীতিনাটক অভিনয় করিয়াছিল। প্রণয় সে-অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন; অভিনয়ান্তে কতক-গুলি ফুলের তোড়া, পদক প্রভৃতি উপহার দিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয়ও দিয়াছিলেন! সেই সূত্রে মিসেস্ সরকারের সহিত প্রথমে আলাপ, পরে সৌহার্দ্দ্য ঘটিয়াছিল। মাঝে কয় দিন ইন্দুদের ওখানে যাতায়াতে ব্যস্ত থাকায় মিসেস্ সরকারের ক্লাসে হাজিরা দিতে পারেন নাই। না যাওয়ায়

আরও কারণ ছিল। মিসেস্ সরকার সম্ভ্রান্তবংশীয়া ভদ্রমহিলা, মুখ ফুটিয়া তিনি কখনও কিছু চাহেন নাই সত্য; কিন্তু তাঁহার ছাত্রীদের আব্দারের অন্ত ছিল না। প্রণয় আসিয়া বসিলেই ইলেকট্রিক পাখার অভাবটা তাহাদের এতই তীব্র হইয়া উঠিত যে, সে অভাব মোচন না করিলে প্রণয়ের লজ্জার যেন সীমা থাকিত না। দোলনায় দুলিবার বয়স তাহাদের বহুকাল অতীত হইয়া গেলেও, একটা বিলাতী দোলনার স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে তাহারা এতই মশগুল হইয়া উঠিয়াছিল যে, স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ না দিয়া প্রণয় পারিলেন না। একদিন দুটি ছাত্রী প্রণয়ের সঙ্গে ড্রাইভে বাহির হইয়া, হগ সাহেবের বাজার দেখিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিল। সেই এক-সন্ধ্যায় হাকিম-সাহেবের মাহিনার অর্দ্ধেক টাকা বাহির হইয়া যাওয়ার পরও নিষ্কৃতি লাভ ঘটে নাই। মেয়ে দুটিকে ক্লাসে নামাইয়া দিয়া, মিসেস্ সরকারের নিকট বিদায় লইতে গিয়া দ্বিগুণ বিপদ। মিসেস সরকার প্রণয়কে ড্রয়িং রুমে বসাইয়া এক গ্লাস অরেঞ্জ স্কোয়াশ খাইতে দিয়া, গভীর দুঃখের সহিত জানাইলেন যে, এই হতশ্রী, সেটি-সোফা-কৌচ-শূন্য ড্রয়িং রুমে প্রণয়কুমারের মত বিশিষ্ট অতিথিকে বসাইতে তাঁহার মাথা কাটা যায়। যে-মেয়েটি সদ্য ড্রাইভিং শিখিয়াছে, সে প্রণয়কে বলিল, আমাদের একটা ড্রয়িংরুম স্যুট হ'লে বেশ হয়। বলা বাহুল্য, বেশ হইল।

অনেকদিন পরে প্রণয়কুমারকে পাইয়া ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রী সকলেই হাতে স্বর্গ পাইলেন। ড্রাইভিং শিখিতে-শিখিতে-শেখা-হয়-নাই-যাহার, সেই মেয়েটি নিদারুণ অভিমানভরে কহিল, যান্, আপনার সঙ্গে আড়ি।

এমন করিয়া আড়ি দিতে যে পারে, তাহার সঙ্গে ভাব করিবার আগ্রহ কাহার না হয়? প্রণয়কুমার বলিলেন, চল, অনিলা, আজ তোমার ড্রাইভিং শেখা শেষ করে দোব।

মেয়েটি প্রায় কাণের কাছে মুখ আনিয়া পরম আত্মীয়ার মত বলিল, চল। তারপর সকলকে শুনাইয়া বলিল, চলুন।

প্রণয়কুমার চুপে চুপে বলিলেন, আবার কাউকে জোটাবে না ত'?

—আমি নাকি জোটাই?—বলিয়া মেয়েটি রাগ প্রকাশ করিল। কাণে কাণে বলিল, তুমি বল মিসেস্ সরকারকে।

মিসেস্ সরকার অমত করিবেন কেন? প্রণয়ের মত শিক্ষিত, পদস্থ ও সম্মানার্হ ব্যক্তি যে অনিলাকে ড্রাইভিং শিখাইতে সম্মত হইয়াছেন, ইহা তাঁহার যথেষ্ট উদারতারই পরিচয়। তিনি অনিলাকে পিয়ানোর স্বরলিপির বইখানি বাহির করিয়া দিতে বলিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া গেলেন। দুই মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া অনিলা নিম্নকণ্ঠে বলিল, চল।

অন্য মেয়েদের চোখে যে ভাব ফুটিয়া উঠিল, তাহা আর যাহাই হউক, প্রীতি প্রকাশ করিল না। তাহাদের রাগ অনিলার উপর নহে; প্রণয়-কুমারের মত একচোখা লোকের উপর তাহারা কিরূপে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে?

জনবিরল, আলোকশূন্য ডায়মণ্ড হারবার রোডে বহুক্ষণ ড্রাইভ করার পর অনিলা বলিল, এইবার ত' ফিরতে হয়।

প্রণয়কুমার হাত-ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন, আটটা পঁচিশ। এখনই ফিরবে?

—হ্যাঁ। নটায় ক্লাস শেষ হয়, বাস্ নটার পরই মেয়েদের নিয়ে যায়।

—বাসের দরকার কি! আমি তোমায় পৌঁছে দোব।

অনিলা ব্যস্ত হইয়া বলিল, না, না। মেয়েদের সঙ্গে বাসে না ফিরলে বাড়ীতে কি মনে করবে!

সুতরাং ফিরিতে হইল। ফিরিবার পথে অনিলা বলিল, আজ একবার মার্কেটে যাবার দরকার ছিল, তা আর হল না।

প্রণয়কুমার বলিলেন, আগে বল নি কেন? বিশেষ দরকার?

অনিলা বলিল, তা—একরকম—তা থাক্—না হয় আর একদিনই হবে।

—বিশেষ দরকার হয় ত, চল মার্কেট ঘুরেই যাওয়া যাক্।

—কিন্তু বাস্ চলে যাবে যে! একটু ভাবিয়া আবার বলিল, তবে একটা উপায় আছে। মিসেস্ সরকার যদি ট্যাক্সি করে আমায় বাড়ী পৌঁছে দেন, তাহলে নিশ্চিন্ত।

—তাই হবেখন, বলিয়া প্রণয়কুমার গড়ের মাঠের পাশ দিয়া চৌরঙ্গীর দিকে গাড়ী ছুটাইলেন।

অনিলার এক বন্ধুর জন্মদিন আগত, তাহাকে একটা কিছু উপহার দিতে হইবে। উপহার-সামগ্রী কেনা হইল, তাহা ছাড়া টুকিটাকি সৌখীন দ্রব্যাদিও কিছু কেনা হইল। গাড়ীতে উঠিয়া অনিলা বলিল, ভাগ্যিস্ মেয়েরা ক্লাসে থাকবে না তাই, নইলে এত জিনিষপত্তর দেখলে সব হিংসেয় ফেটে মরত।

প্রণয় তৃপ্তির সহিত হাসিলেন।

একটু পরে অনিলা মুখখানি মলিন, কণ্ঠস্বর ম্লান করিয়া বলিল, আর ক'দিনই বা আপনার সঙ্গে বেড়াতে পারব ?

প্রণয় উৎকণ্ঠার সহিত কহিলেন, কেন ?

অনিলা বলিল, আর ত সুবিধে হবে না। আমাদের গানের ক্লাস যে উঠে যাচ্ছে।

—উঠে যাচ্ছে ? কেন ?

—মেয়ে অনেক কমে গেছে কি না! দু'মাসের বাড়ী ভাড়া পড়ে গেছে ; মিসেস্ সরকার তাই ক্লাস তুলে দিচ্ছেন।

একটু থামিয়া, অত্যন্ত দুঃখপূর্ণকণ্ঠে অনিলা বলিল, আজই হয়ত আমাদের শেষ বেড়ান ; ৩১শে মে ক্লাস বন্ধ হবে।

—৩১শে মে ! সে ত পশু'।

—হ্যাঁ।

—কত করে' ভাড়া, জান ?

—ঠিক জানিনে, তবে সত্তর কি পঁচাত্তর এই রকম।—অনিলার গলায় যেন জল জমিয়া উঠিয়াছিল। সে প্রণয়ের কাঁধের উপর মাথাটা এলাইয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

প্রণয় বলিলেন, অনিলা, তুমি মিসেস্ সরকারকে বল, একমাসের ভাড়া আমি কালই দিয়ে দোব।

অনিলা সোল্লাসে বলিল, দেবেন ?

—দোব। ফিরে গিয়ে মিসেস্ সরকারকে আমিই বলব'খন।

অনিলা সোহাগভরে কহিল, না, আমি বলব।

—বেশ, তাই।

গাড়ী হইতে অনিলা মিসেস্ সরকারকে টানিতে টানিতে অন্য একটা ঘরে লইয়া গিয়া কি বলিল। ফিরিয়া আসিয়া মিসেস্ সরকার প্রণয়কে বলিলেন, আপনাকে কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাব তা আমি ভেবেই পাচ্ছি না। এবার আমাদের প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউসনে আপনাকে প্রেসিডেণ্ট হতে হবে।

অমিলাকে বলিলেন, বাস্ এখনি ফিরে আসবে, তোমার জন্যেই আবার আস্তে বলে দিয়েছি। ততক্ষণ বসবে চল। আপনারও ত তাড়া নেই প্রণয়বাবু, আপনিও আসুন না, একটু বসবেন। একটু চা খাবেন ?

—তা খাই।

মিসেস সরকার চা করিতে গেলেন। প্রণয় ও অনিলা কৌচ-সেটি-সোফা সজ্জিত ড্রয়িং রুমে বসিলেন। চা প্রস্তুত হইতে অনেক বিলম্ব হইল। অবশ্য তাহাতে এই দুই জনের কেহ অসুখী হইলেন না।

এই পরিচ্ছেদের শেষাংশ না লিখিলেও পারিতাম, কিন্তু প্রগতির যুগে পিতামাতার অজ্ঞাতে যাহা ঘটিতেছে, তাহার একটি অবিকৃত চিত্র দিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তাই ধরি-মাছ-না-মাখি-কাদা করিয়া চিত্রটি আঁকিলাম। অনিলা সংসারে একটি নয়, মিসেস্ সরকারও সমাজে একাধিক আছেন ; আর প্রণয় ? প্রগতির নদীতে প্রণয়-প্লাবন ত লাগিয়াই আছে !

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

যে সন্ধ্যায় তাঁহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়াই প্রণয় চলিয়া যায়, সেই রাত্রির পর হইতে ইন্দুর মাতা যেন সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার গাম্ভীর্য্য দেখিলে, আশ্চর্য্য হইতে হয়। কাহারও সঙ্গে কোন কথা কহেন না বটে, তবে তিনি যে কাহারও প্রতি অপ্রসন্ন বা অসন্তুষ্ট, তাহাও মনে হয় না। সংসার যথানিয়মে চলিয়া যাইতেছে, কর্ত্তার তাস-পাশার আড্ডা পুরাদমে চলিতেছে, মেয়েরাও কখন হাসিতেছে, কখন গাহিতেছে, কখন গল্প করিতেছে, এ-সবেরও কোন ব্যতিক্রম নাই! বাগানে তেমনই ভারে ভারে ফুল ফুটিতেছে, হেলিতেছে, দুলিতেছে, ভ্রমরাগমনে কখনও সঙ্কুচিত, কখন উৎফুল্ল হইতেছে। সামনের রাস্তার লোক-চলাচলের বিরাম নাই, ফেরিওয়ালার চীৎকার সমান আছে। রান্নাঘরে উড়ে বামুন ও বাঁকুড়ার ঝিয়ের কলহ-কলরব, মান-অভিমান, ক্রন্দন-সান্ত্বনা-অভিনয় অক্ষুণ্ন রহিয়াছে। মোটর ড্রাইভার যথারীতি পেট্রোল-মবিলাদি চুরীর চেষ্টা করিতেছে। বাগানের মালী প্রভুর অজ্ঞাতসারে ডাব-নারিকেল-ফুল-পাতা বেচিয়া দিতেছে। ভিখারী-ভিখারিণী ভিক্ষা করিতে আসিয়া ছেঁড়া কাপড় জামার জন্য উমেদারী করিতেছে। আগে গৃহিণীর সকল কিছুতেই দৃষ্টি ছিল, মনোযোগ ছিল, এ কয় দিন তাহারই শুধু অভাব দেখা যাইতেছে। রাত্রে তাস-পাশা শেষ করিয়া কর্ত্তা যখন খাইতে বসেন, তখনও গৃহিণীর দর্শন মিলে না; শয়ন-কক্ষে আসিয়াও তাঁহাকে জাগ্রত দেখিতে পান না। আমরা জানি, গৃহিণী বিনিদ্র রজনী অতিবাহন করিলেও কর্ত্তাকে তাহা জানিতে দেন না।

হেরম্বনাথ আসিয়া শুইয়া পড়েন। ঘণ্টা পাঁচেক নাক বাজাইয়া ভোর হইতেই নীচে নামিয়া গড়গড়ার নল মুখে দিয়া, হয় পাশায় মহেন্দ্রকে হারাইবার ফন্দী-ফিকির, না হয় অকল্যাণ্ড, ব্যাকল্যাণ্ড জুটের সেয়ারের উত্থান-পতনের কারণ নির্ণয় করিতে বসিয়া পড়েন। অসীম বিশ্ব তাঁহার নিকট যে কত সসীম তাহা তাঁহার আত্মীয়পরিজন সবাই বুঝিতে পারে।

মাতার এই তুষ্ণীভাব ইন্দুকে ভিতরে ভিতরে বড়ই বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। প্রণয়ের শুভাগমন হয় না, ইহাতে সে বাঁচিয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু তাহার না আসার সঙ্গে মাতার এই অসাধারণ গাম্ভীর্য্যের সম্পর্ক যে নিকট তাহা বুঝিতেও তাহার বিলম্ব হয় নাই। মাতা কি ভাবিয়া কোন্ আশায় প্রণয়কুমারকে সম্বর্দ্ধনা করিতেছিলেন, তাহাও যেমন ইন্দুর অজ্ঞাত ছিল না, তাহার দিক দিয়াই মাতাকে যে নিদারুণ মনস্তাপ পাইতে হইবে তাহাও না ভাবিয়া সে পারিত না। মধ্য পথে কোন্ দেবতা প্রসন্ন হইয়া কি যে কাণ্ড করিয়া বসিলেন, তাহা ভাবিয়া না পাইলেও মনে মনে ইন্দু কখনো কখনো যে স্বস্তি অনুভব না করিত, তাহা নহে।

মাতার এই তুষ্ণীভাব দীর্ঘ দিন স্থায়ী হইল না। কয়েকদিন পরে একদিন মধ্যাহ্নে আবুদির শুভাগমন হইল, দুই ভগ্নীতে কক্ষ-দ্বার বন্ধ করিয়া গল্প করিতে বসিলেন।

প্লাবুর দোষেই যে সব পণ্ড হইতে বসিয়াছে, একবার নয় আর বার বার করিয়া তাহা বুঝাইয়া দিলেন। আজকালকার দিনে, যুবক যুবতীর মনে অনুরাগ সঞ্চার হইতে না হইতে বিবাহের কথা পাড়িলে কুফলই ফলিয়া থাকে। প্রণয় ঠাকুরপোর মনটি ইন্দুর দিকে পড়িয়া আসিতেছিল, আবুদি তাহা বুঝিতেছিলেন, আর কিছুদিন উভয়ের মেলামেশার উত্তম

সুযোগ দেওয়াই যে সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত ও সমীচীন ছিল, ইহা না বুঝিয়া তাড়াতাড়ি জাল টানিতে গিয়া কাৎলা মাছটিকে জাল ছিন্ন করিয়া পলায়নে উৎসাহিত করা হইয়াছে বলিয়া আবুদি মনমরা হইয়া বসিলেন। লাবুর জরুরী পত্র পাইয়াও তিনি যে এই কয় দিন আসেন নাই, তাহার একমাত্র কারণ, তিনি ঠাকুরপোর মন বুঝিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। গত কয় দিনই প্রণয় ঠাকুরপো অনেক রাত্রি করিয়া ফিরিতেছে, আবার সকাল হইতেই আদালতের কাগজ লইয়া বসিয়া পড়ে, কথা কহিবার সুযোগই মিলে না। আজ সকালে একটু ফুর্সৎ ছিল, কথা পাড়িয়া শুনিলাম, অনেক দিন সে তোমাদের বাড়ীতে আসে নাই। টেবিলের উপর একটি মেয়ের ফটো সই করা—অনিলা সেন, কালকের তারিখ। অনিলা কে, জিজ্ঞাসা করায় প্রণয় ঠাকুরপো হাসিল। পরে সব বলিয়াছে, অনিলা মিসেস্ সরকারের স্কুল অফ ওরিয়েণ্ট্যাল মিউজিকের ছাত্রী। গানে, নাচে মেয়েটি খুব ওস্তাদ।

আবুদি বলিলেন, আজকালকার ছেলেরা এই সবই খোঁজে ভাই।

লাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কি সব?

আবুদি বলিলেন, এই সব,—গান, বাজনা, নাচ, মেলামেশা, পিকনিক পার্টি। দেখছি ত ঘরে ঘরে। মিশতে মিশতে কারু সঙ্গে কারু ভালবাসা হয়ে যায়, তখন ছেলেরাই নিজে থেকে প্রপোজ করে।

লাবু বলিলেন, প্রপোজ কি?

আবুদি বলিলেন, প্রপোজ মানে প্রস্তাব করা। ছেলেরাই তখন মেয়ের বাপ-মার কাছে এসে বিয়ের প্রস্তাব করে।

লাবু সাশ্চর্য্যে বলিলেন, বল কি আবুদি? বাঙালীর ঘরেও এই সব হয়েছে?

আবুদি তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিলেন, হয়েছেই ত! কলকাতার ঘরে ঘরে হচ্ছে। আমাদের পাড়ায় এক দত্ত আছেন, তাঁর দু'টি মেয়ের প্রায় দু'বছর এনগেজমেণ্ট হয়ে রয়েছে—মেয়ে দু'টি রোজ ছেলে দুটির সঙ্গে বেড়াতে যায়, কত রাত্রি করে ফেরে।

বল কি! এসব ত সাহেবদেরই হত ভাই; শুনিছি ব্রাহ্মদেরও হয়।

এখন সবাই সাহেব; সবাই ব্রাহ্ম। আমি দত্ত-গিন্নীকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, মেয়েদের বিয়ে হবে কবে? বল্লেন, তারা যবে বলবে তবে হবে।

—দু'বছর পরে তারা যদি বলে, বিয়ে হবে না, তখন?

—তখন আর কি!—হবে না।

—ছিঃ ছিঃ, সে যে বড় বিশ্রী।

আবুদি বলিলেন, তুমি বলছ বিশ্রী, তারা বলে না।

লাবু বলিলেন, তোমার বিশ্রী বলে মনে হয় না?

আবুদি বলিলেন, আমার মনে হলেই বা কি! না হলেই বা কি! ভগবান্ রক্ষে করেছেন, ভাই, আমার মেয়ে নেই।

লাবু হাসিলেন, বলিলেন, হতে কতক্ষণ?

এত দুঃখের মধ্যেও হাসির কথায় উভয়েই হাসিলেন। আবুদি কৃত্রিম দুঃখের সহিত বলিলেন, আর হয়েছে!

ইহার পর দুই অন্তরঙ্গ সখীর মধ্যে যে কথাবার্তা হইল, লেখকের তাহা জানা থাকিলেও তাহা তিনি প্রকাশযোগ্য বিবেচনা করেন না। পুরুষদের গোপন কথা প্রায় অপ্রকাশযোগ্য নহে; কিন্তু যে কোন্ বয়সের দুই বা ততোধিক নারীর গোপন-কথা লোক-সমাজে প্রকাশ করা চলে না।

শেষাশেষি আবার প্রণয়কুমারের কথাতেই ইঁহারা ফিরিয়া আসিলেন, লাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, অনিলার ফটো ত দেখেছ, দেখতে কেমন ?

আবুদি বলিলেন, রঙটঙ কেমন তা কে জানে! এমনি চেহারাটা মন্দ নয়। লম্বা একহারা গড়ন, খুব লম্বা বলেই মনে হ'ল। গাল দু'টো চড়ানে—কেমন যেন চুয়াড়ে চুয়াড়ে ভাব। ঐ-ই নাকি এখনকার ফ্যাসান; আমেরিকান বিউটি না কি বলে, তাই।

—কি জাত? কায়স্থ?

ফটোয় ত জাত লেখা থাকে না ভাই।

লাবু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

আবুদি বলিলেন, আজকাল মেয়েরাও হয়েছে সব ধিঙ্গী। নইলে নিজে থেকে ফটো তুলিয়ে সই ক'রে প্রেজেণ্ট করে কেউ কখনও!

লাবু এখনও কথা কহিলেন না।

আবুদি তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া কহিলেন, তুমিই ত সব মাটি করলে ভাই, এখন যদি পাত্তর হাতছাড়া হয়ে যায়, সে দোষ তোমারই। আমি তোমায় বলে অবধি দিলুম যে, সময় মত আমিই কথা পাড়ব, তুমি কেন ভাই হান্‌চান্ করে কাজটি পণ্ড করলে?

যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার ত কোন উপায়ই নাই, এখন কি করিলে আবার পূর্ব্বের অবস্থা ফিরিয়া আসে তাহাই চিন্তনীয়। লাবণ্য তাহাই বলিলেন।

আবুদি বলিলেন, দেখি চেষ্টা করে। রবিবারে ওর ছুটি থাকে, যদি পারি, সঙ্গে করে ওকে নিয়ে আসব'খন। বাড়ীর মধ্যে আমাকে একটু মান্য টান্য করে, আমার কথা বড় ঠেলে না!

লাবু সকাতরে বলিল, তাই কর ভাই। রবিবারে আনা চাই।

ইহাই স্থির রহিল। কালস্য কুটিলা গতি! ইন্দুর মাতা আর কি করিবেন? কালধর্ম্ম যাহা চাহে, তাহা করিতেই হইবে। তাঁহাদের কালে এ সব ছিল না। গৃহে বিবাহযোগ্য পুত্র বা বয়স্কা কন্যা থাকিলে ঘটক ঘটকী বাড়ী চষিয়া ফেলিত। লক্ষ কথা না হইলে শুভকার্য্য সম্পন্ন হইত না বটে, কিন্তু এমন সব অনাসৃষ্টি কাণ্ড ঘটিত না। যুবক যুবতী যত দিন খুশী অবাধে মেলামেশা করিবে, যত্রতত্র ভ্রমণ করিবে, যদি ইচ্ছা হইল, বিবাহ করিবে, মর্জ্জি না হইলে হাত ধুইয়া ফেলিবে।—এই নোংরা কাজে কোন্ পিতামাতা সম্মতি দিতে পারেন? কিন্তু আবুদি বলিয়াছে, ইহাই আধুনিক রীতি ও নীতি, পালন করিতেই হইবে। স্রোতের বিরুদ্ধতা করিতে গিয়া বিরাটকায় ঐরাবত ভাসিয়া গিয়াছিল, তুমি আমি ত ছার!

বিদায় কালে আবুদি বলিলেন, লাবু, এইবেলা তোমার ছোট মেয়েকে নাচের স্কুলে ভর্ত্তি করে দাও ভাই। দু'পাঁচ বছর পরে নাচ দেখে লোকে বেউ পছন্দ করবে।

—মা গো! কালে কালে কতই হল!

—আরও কত হবে। তোমার মেয়েরা কৈ? তাদের যে বড় দেখছি না?

—শুয়েছে বোধ হয়। যে গরম, দুপুরবেলা ঘুমোয়।

গলাটা একটু খাটো করিয়া আবুদি জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁ ভাই, প্রণয় যে আসে না, ইন্দু কিছু বলে টলে?

আসল কথা অপ্রকাশ রাখিয়া, লাবু বলিলেন, কৈ, তা ত কিছু বলে না।

—কোথায় সে ?

পাশের ঘরে ঢুকিতে দেখা গেল, ইন্দু বিছানায় শুইয়া একখানি বাঙলা মাসিকপত্র পাঠ করিতেছে। আবু মাসীকে দেখিয়া উঠিয়া প্রণাম করিল ! আবুদি তাহার মুখে-চোখে হতাশার চিহ্নমাত্রও দেখিতে পাইলেন না। ভাবিলেন, মেয়েটি বড় চাপা।

মেয়ের মা অনেক দিনের গাম্ভীর্য্য পরিহার করিয়া, স্নেহস্বরে কহিলেন, ইন্দুর কেবল পড়া আর পড়া ! বই পেয়েছে কি অমনি পড়তে বসেছে। দুপুরবেলা গরমের দিনে একটু ঘুমোলে হয়, তা নয়, বই আর বই !—বলিয়া স্নেহময়ী জননী হাস্য করিলেন।

ইন্দু হাসিয়া পত্রিকাখানি বন্ধ করিয়া বালিশের নীচে রাখিয়া দিল।

ক্ষণা অঘোরে ঘুমাইতেছিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পয়লা আষাঢ়। কবে, কোন্ সে সুদূর অতীতে মহাকবির মানস-সন্তান বিরহবিধুর হৃদয়ে, কোন্ রামগিরি হইতে মেঘকে দূত করিয়া মেঘের মুখে তাহার সুদূরের প্রেয়সীসকাশে বিরহের বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছিল, আজিকার আকাশ দেখিলে, মেঘের এক গতি, এক লক্ষ্য দেখিলে সেই কথাই শুধু মনে পড়ে। আজও কে-যেন মেঘের মুখে তাহার বিরহের বার্ত্তা পাঠাইয়াছে, মেঘেরা বিরহী-বক্ষের গভীর বেদনা অনুভব

করিয়াই, অবিশ্রান্ত গতিতে বিরহিণীর উদ্দেশ্যে ছুটিয়া চলিয়াছে। আজ যেন তাহার একটি মুহূর্ত্ত অবসর নাই, শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। কেবলই ছুটিতেছে।

সারাদিন, আকাশে মেঘের ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি খেলাই চলিয়াছিল, অপরাহ্ণ হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ঘণ্টাখানেক মুষলধারায় বৃষ্টিপতনের পর বৃষ্টি বন্ধ হইল বটে, উদ্দাম বায়ু অবিশ্রান্ত গতিতে বহিতে লাগিল। এলোমেলো বাতাস, কখনও পূর্ব্বদিক হইতে, কখনও উত্তর, কখনও দক্ষিণ, কখনও বা পশ্চিম দিক হইতে সোঁ সোঁ শব্দে ছুটিয়া আসে। কখনও বাতাসের সঙ্গে সূক্ষ্ম বারিকণাও ভাসিয়া আসে। জানালা বন্ধ না করিয়া বসা যায় না, আবার জানালা বন্ধ করিতে ইচ্ছা হয় না; দুঃখ হয়। মনে হয়, কি যেন দেখা হইবে না, কিসে যেন ফাঁকি পড়িয়া যাইতে হইবে।

ছায়া আজ সমস্ত দিন মেঘের খেলা দেখিয়াছে। শেলীর কবিতা তাঁহার ভাল লাগিত, কখনও শেলীর মেঘাচ্ছন্ন আকাশের কবিতা পড়িয়াছে, কখনও মেঘদূত খুলিয়া বসিয়াছে। সমস্ত দিন এই ভাবেই কাটিয়াছে; বৃষ্টির সময়ও সে জানালা খুলিয়া বসিয়া ছিল, জানালার কাছের মেঝের কার্পেটটি ভিজিয়া গিয়াছে, টেবিলের বই খাতাগুলিও ভিজিয়া স্যাঁতাইয়া উঠিয়াছে, ছায়া তাহা দেখিয়াছে, তবুও সার্সিটা বন্ধ করে নাই। আজ সে সারাদিনমান খোলা জানালাটার কাছে বসিয়া বসিয়া ভাবিয়াছে, মেঘকে যদি তাহার ভাষা বুঝাইতে পারিত, তবে তাহাকে কাছে ডাকিয়া, আদর করিয়া, তাহার দুঃখের কথা বলিত; বলিয়া তাহাকে দূতরূপে বরণ করিত। তারপর দূতমুখে বার্ত্তা প্রেরণ করিত।

কিন্তু কোথায়, কাহার কাছে পাঠাইত মেঘদূতকে ? ছায়া নিজের মনে, নিজের এই প্রশ্নের জবাব খুঁজিয়া পায় নাই।

অশোকের কাছে ?

তাহার বিবাহের ব্যাপারটা কি বিশ্রী ! অশোকের সঙ্গে অনেক দিনের জানা-শোনা ছিল বটে ; কিন্তু কোন দিন কি তাহারা পরস্পরকে হৃদয় দিয়া জানিবার ও বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছে ? অশোকের মা ও তাহার মা মিলিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন, অশোক কচিৎ কোন দিন তাহার মা'র সহিত এ বাড়ীতে আসিয়াছে, ড্রয়িং রুমে সকলের সঙ্গে বসিয়াছে, সকলের সঙ্গে যেমন কথাবার্ত্তা কহে, ছায়ার সঙ্গেও তেমনই দুই চারিটা কথাবার্ত্তা হইয়াছে। অশোক তখন সিনিয়র কেম্বিজের শেষ পরীক্ষার জন্য বিশেষ ব্যস্ত, কালে ভদ্রে একদিন আসিত। সুন্দর চেহারা, দীর্ঘ ঋজু দেহ, দীর্ঘ আয়ত কৃষ্ণতার দু'টি চক্ষু, দীর্ঘ কৃষ্ণ কেশ, পাতলা টুকটুকে দুটি ঠোঁট, রক্তিম কপোল, উন্নত নাসা, সর্ব্বাপেক্ষা কথা বলিবার একটি বিশেষ কায়দা —এই সব মিলিয়া মিশিয়া ছায়ার হৃদয়পাতে রেখাঙ্কন হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। অশোকের পরীক্ষা যেদিন শেষ হইল, তাহার পরদিনই এনগেজমেণ্ট উৎসব। উৎসবের অঙ্গ হিসাবে উপাসনা, অঙ্গুরীয় দান, গীতবাদ্য ও জলযোগাদি হইয়াছিল। উৎসবান্তে অশোক তাহাকে লইয়া সেই প্রথম বেড়াইতে গিয়াছিল ! গাড়ীতে দুই তিনটার বেশী কথা হয় নাই, অশোক বাক্‌পটু নহে, একটু যেন বেশী লাজুক, ছায়া তাহা বুঝিয়াছিল। বুঝিয়া একটু ক্ষুণ্ণ, একটু প্রসন্ন হইয়াছিল।

অশোকের মা ও ছায়ার মার মধ্যে কথাবার্ত্তা বহুকাল ধরিয়া চলিলেও,

উভয় পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তাহার কারণ ছিল; অশোকের পিতা দরিদ্র এবং দরিদ্র থাকিতেই চাহিতেন। কিন্তু ধনী বংশের মেয়ে বলিয়া অশোকের মা'র প্রকৃতি ছিল অন্যরূপ। তিনি ছেলেকে বাল্যকাল হইতে পিত্রালয়ে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইতেছিলেন এবং সেখান হইতেই ছায়ার মা'র সঙ্গে বৈবাহিকা-সম্বন্ধ পাতাইবার আয়োজন করিয়াছিলেন। বিবাহের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত, অশোকের পিতা 'এন্‌গেজমেণ্ট' কি পদার্থ তাহা অনবগত ছিলেন; বিবাহের দিনে পদার্থটির সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান জন্মিল বটে, কিন্তু তখন সব হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। উভয় পরিবারে ঘনিষ্ঠতা না থাকায়, অশোকের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা ছায়ার হয় নাই এবং আধুনিক মতে হৃদয়ের আদান-প্রদান নামক আধুনিক উদ্বাহের অত্যাবশ্যকীয় পূর্ব্বানুষ্ঠানও সাধিত হয় নাই। আগেকার কালে কি হইত, এখনও অশিক্ষিত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজে ও পরিবারে কি হয় না হয়, তাহার সহিত তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া নাসা কুঞ্চিত করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহাতে কোনই ফল নাই। হৃদয় আদান-প্রদানের কথাই এখনকার কালে বড় কথা হইয়াছে এবং সেই আদান-প্রদানটা বিবাহের পরে নয়, আগে হওয়াই রীতি দাঁড়াইয়াছে।

বিলাতের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিটের জন্য ব্যর্থ চেষ্টা বহুদিন হইতে চলিতেছিল, ছায়ার পিতাই চেষ্টা করিতেছিলেন। হঠাৎ সংবাদ আসিল, অবিলম্বে রওনা হইবার জন্য। পাসপোর্টের তদ্বির, পরিচয়-পত্রাদি-সংগ্রহ, আত্মীয়দিগের গৃহে ভোজন, বন্ধুবান্ধব সহপাঠীদিগের পার্টি, ক্লাবে বিদায় সভা ইত্যাদি শিষ্টাচারমূলক পাঠাদি সারিতে সারিতে দুই পক্ষ অতিবাহিত

হইয়া গেল। সেই সমস্ত শেষ হইতে না হইতে বিবাহ! বিবাহের পরই অশোক বিলাত যাত্রা করিল।

এই বিবাহ!

বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে আত্মীয়ারা অশোককে ধরিয়া জোর করিয়া ছায়ার ঘরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ঘরে ঢুকিয়াই হাসি! হাসি আর থামে না। কি বিশ্রী লাগিয়াছিল সেই হাসি। কত দিন, কত কালের জন্য চলিয়া যাইতেছে, কত সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ, ভালবাসার একটি কথা নাই, একটি স্নেহ-সম্ভাষণ নাই, একটু আদর নাই। সে কথা ছায়ার মনে আছে আজও। ঘর হইতে বাহির হইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে অশোক বিলাতী কায়দায় ইংরাজীতে একটি চুম্বন মাগিয়াছিল! লজ্জায়, ক্ষোভে ছায়া সাড়া দেয় নাই; অশোক দ্বার খুলিয়া চলিয়া গিয়াছিল। ছায়ার আজও মনে আছে, সে সময়ে ছায়ার মন ভাবিতেছিল, ভিক্ষায় প্রয়োজন কি! জোর করিয়া লইতে কে তাহাকে মানা করিয়াছিল?

এই বিবাহ! এই মিলন! আর, এই বিচ্ছেদ!

আজ যদি মেঘেরা দৌত্য স্বীকার করিত, ছায়া তাহাদের কোথায় বা কাহার কাছে পাঠাইত? অশোকের কাছে নিশ্চয়ই নয়। তবে কাহার কাছে পাঠাইবে?

তাহার মত দুঃখী এ পৃথিবীতে কেহ আছে কি? যদি কেহ থাকে, ছায়া শুধু তাহারই কাছে তাহার ব্যথাভরা হৃদয়ের কাহিনী মেঘমুখে পাঠাইতে পারে। মেঘেরা সকল দেশে যায়, সব ঘর দেখিতে পায়, সকলের কাছেই যাইতে পারে, যেদেশে যেখানে যে ঘরে তাহার মত দুঃখী আছে, শুধু তাহারই কাছে ছায়া খবর পাঠাইতে চায়।

এই মেঘেরা কি বিলাতেও যায়? বিলাত মেঘের রাজ্য শুনা যায়, সেখানকার আকাশ সকল সময়ই মেঘে আচ্ছন্ন। এখানকার মেঘ বোধ হয় সে দেশে যাইতে পারে না। কিন্তু যদি যাইত, আর মেঘকে তাহার ভাষা যদি সে বুঝাইতে পারিত!

—ছায়া!

ছায়ার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। সিক্ত মস্তক, সিক্ত বসন সুবিমলের প্রবেশ।

—মিঃ রায়! এই বৃষ্টিতে!

—বৃষ্টি বেশী পড়ছে না, হাওয়াটা শুধু—

—এই বাদলায় মানুষ বাড়ীর বার হয়?

বিমল হাসিয়া বলিল, নইলে যে তোমার পড়ার—কথাটা শেষ করিল না। তাহার প্রয়োজনও ছিল না। যে কথাটা সে মুখে বলিল না, যে কথাটা তাহার—শুধু তাহার কেন, গরীব মাত্রেরই মনে অহরহ ধ্বনিত হয়, সে কথাটা যে বুঝান যায় না। চাকরীর ভয় দৈবদুর্বিপাকের চেয়ে কত ভীষণ, গরীব চাকুরীজীবী ছাড়া কে তাহা বুঝিতে পারে?

বিমল জামার পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মাথাটা, হাত দু'টা, মুখটা মুছিয়া লইয়া, চেয়ারে বসিতে, ছায়া বলিল, চা দিতে বলি?

—বয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, চা আনছে। আলোটা জ্বেলে দিই।—বিমল উঠিয়া, সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিল।

ছায়া দু'হাতে চোখ দু'টায় আড়াল করিয়া বলিল, আজ আলো ভাল লাগছে না।

বিমল বলিল, অঙ্ক ক'টা কষেছিলে?

—না।

—পার নি?

—দেখিই নি।

বিমল দুঃখিত ভাবে বলিল, চেষ্টা ক'রে দেখলে না কেন একবার?

ছায়া দৃঢ় স্বরে বলিল, কি হবে চেষ্টা করে!

একটু থামিয়া আবার বলিল, আজ পড়ব না।

এক মুহূর্ত্ত থামিয়া পুনশ্চ কহিল, শুধু আজই নয়, কোনও দিনই আর পড়ব না।

বিমল নীরবে ছায়ার পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল। ছায়া আলোর দিকে হাত দু'টা আড়াল করিয়া বাহিরের পানে চাহিয়া বলিল, পড়তে আমার ভাল লাগে না, একটুও না, একটুও না।

কেহ দেখিল না, কেহ জানিল না, বিমলের মুখখানি আস্তে আস্তে বিবর্ণ পাণ্ডুর হইয়া আসিল।

ছায়া বলিল, আজ বাবা বাড়ী এলেই একটা হেস্ত-নেস্ত হয়ে যাবে। পড়ব না আমি, কিছুতেই না।

বয় চায়ের সরঞ্জামাদি লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া, টেবিলের উপর ট্রে নামাইয়া দিয়া চলিয়া যাইতেই, ছায়া উঠিয়া আসিয়া, চা প্রস্তুত করিয়া, চায়ের বাটী আগাইয়া দিতে গিয়া বিমলের শুষ্ক পাণ্ডুর মুখ দেখিতে পাইল। ছায়া নিজে দুঃখী, অপর দুঃখীর ব্যথা সে বুঝিল। নিজের চেয়ারে ফিরিয়া আসিয়া শূন্য মনে চায়ের পেয়ালায় চামচটি নাড়িতে নাড়িতে নতমুখে বলিল, বাবাকে বলে কাজ নেই, যেমন চল্‌ছে চলুক।

বিমল বলিল, তার মানে?

ছায়া বলিল, মানে—আমি যদি বলি, পড়ব না, তা হলে ত আপনার কাজটি যাবে। তার চেয়ে, আপনার যত দিন অন্য কাজ না হয়, আমি বসে বসে বইয়ের পাতা উল্টে যাব; আপনি বসে বসে দেখবেন।

তোমাকে না পড়িয়েও আমি পড়ানর পারিশ্রমিক নিয়ে যাব?—কথাগুলা এত নীরস, এত কঠিন ও এত তীক্ষ্ণ করিয়া সে বলিল, যে ছায়া চমকিয়া উঠিল। বিমল পুনরায় বলিল, না ছায়া, এমন চাকরী আমি করি নে! আমি গরীব, কিন্তু জোচ্চোর নই।

দরিদ্রের অভিমানের সহিত ছায়ার সুস্পষ্ট পরিচয় ছিল না; থাকিলে সে ঐ কথা উচ্চারণও করিত না। অশোক গরীব; কিন্তু অশোককে জানিবার, বুঝিবার, চিনিবার সুযোগ তাহার কবে মিলিয়াছে? এক্ষণে, বিমলের কথার ভাবে দরিদ্রের দৃপ্ত অভিমান যে কি, তাহা বুঝিয়া, অনুতাপ-আর্দ্র কণ্ঠে কহিল, আপনি রাগ করলেন মিঃ রায়?

বিমল কথা কহিল না।

চায়ের পেয়ালাটা খট করিয়া টেবিলের উপরে নামাইয়া রাখিয়া, ছায়া উঠিয়া আসিয়া বিমলের হাত দুখানি চাপিয়া ধরিয়া মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, না জেনে যে কথা বলে ফেলেছি, তার জন্য আপনি আমায় মাপ করুন, মিষ্টার রায়।

তবু বিমল কথা বলে না দেখিয়া ছায়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া উঠিল, আমায় ক্ষমা করুন, আপনার হাতে ধরে মিনতি করছি মিঃ রায়! আমার মনটা আজ ভাল ছিল না, অসাবধানে বলে ফেলেছি, আমায় ক্ষমা করুন।

বিমল ছায়ার হাত হইতে নিজের হাত দু'খানি টানিয়া লইয়া বলিল,

তুমি বস ছায়া ! আমি তোমার ওপর রাগ করি নি, সত্যি বলছি, রাগ করি নি ।

ছায়া বসিয়া অশ্রুগদগদকণ্ঠে নিজমনেই বলিতে লাগিল, আজ সমস্ত দিন মনটা আমার কি খারাপই যে হয়ে রয়েছে, তা আমিই জানি। তাই কি বলতে কি বলে ফেলেছি ; নইলে আপনার মনে আমি কষ্ট দিতে পারি ? একে আমার মন ভাল নেই, তার ওপর আপনি রাগ করলেন…

বিমল অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত বলিল, আমারও মনটা ভাল নেই ছায়া, নইলে ঐ তুচ্ছ কথাটার জন্যে এত কড়া কথাই বা তোমায় বলব কেন ? তুমি আমায় ক্ষমা কর ছায়া ।

একটা যেন বুঝাপড়া হইয়া গেল । দুজনেই পরিত্যক্ত পেয়ালা তুলিয়া চুমুক দিল ।

চা খাইতে খাইতে বিমল বলিল, ছায়া, তুমি মিঃ বোসের চিঠি পেয়েছ ?

ছায়া বিলাতফেরতের মেয়ে, আধুনিক সমাজেরও বটে, তবুও একটু লজ্জারুণ হইয়া নতমুখে বলিল, না ।

—কত দিন পাওনি ?

—অনেক দিন । কেন বলুন তো ?

—বলছি, তুমি চিঠি দাও ?

—না , আগে আগে জবাব না পেয়েও ক'খানা লিখেছিলুম, তারপর ছেড়ে দিয়েছি । কেন, বলুন না ?

—পরে বলছি । মিঃ বোসকে তোমার চিঠি লিখতে ইচ্ছে হয় না ?

—না ।

—বিমল আবার জিজ্ঞাসা করিল, ইচ্ছে হয় না ?

ছায়া বলিল, না। কিন্তু কেন জিজ্ঞেস করছেন এসব?

—আমি এক মস্ত সমস্যায় পড়ে গেছি ছায়া।

ছায়া সাগ্রহে কহিল, কি বলুন না মিঃ রায়?

বিমল বসিয়া ভাবিতে লাগিল। ছায়া কিন্তু আগ্রহ দমন করিতে পারিতেছিল না, কহিল, কৈ, বললেন না?

—বলছি, বলিয়া আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

ছায়া বলিল, বলুন না মিঃ রায়?

—বলা উচিত হবে কি না তাই ভাবছি।

—তবে থাক্, বলতে হবে না, বলিয়া ছায়া জানালার দিকে ফিরিয়া বসিল। বাহিরে তখন ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দে বৃষ্টি নামিয়াছে; সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে।

বিমল বলিল, বলছি শোন।

ছায়া ঘুরিয়া বসিল।

—একটি ছেলে একটি মেয়েকে ভালবাসে; মেয়েটিও বাসত। মেয়েটি বড়লোকের মেয়ে, ছেলেটি খুব গরীব। কিন্তু তারা দু'জনেই প্রতিজ্ঞা করেছিল, তারা পরস্পরকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না। মেয়েটির মা চাইতেন, খুব বড়লোকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হয়; মেয়েটি প্রতিজ্ঞা করেছিল, কিছুতেই না। মা পছন্দ করতেন না যে গরীব ছেলেটি তাঁর বাড়ীতে আসে; ছেলেটিও কাজ-কর্ম্ম না হওয়া পর্য্যন্ত তাদের বাড়ীতে যাবে না, স্থির করেছিল। কিছুদিন থেকে ছেলেটি মেয়েটির বাড়ীতে যায় না বটে, তবে তাদের ভালবাসা ঠিক ছিল। হঠাৎ একদিন দেখা গেল—বিমল থামিল।

ছায়া বলিল, কি দেখা গেল?

বিমল বলিতে লাগিল, দেখা গেল, খুব বর্ষায় একদিন মেয়েটি অন্য একটি বড়লোকের ছেলের সঙ্গে মোটরের কাচটাচ বন্ধ করে গল্প করতে করতে বেড়াতে যাচ্ছে। সঙ্গে আর কেউ নেই।

—তারপর?

—তারপর আর কিছু নেই।

—তবে যে বললেন, সমস্যা?

—ঐ ত সমস্যা।

—ঐ বেড়াতে যাওয়া? তাতে দোষ কি?

—দোষ নেই?

—কি দোষ! কিন্তু মেয়েটি কে?—বলিয়া মিটি মিটি হাসিতে হাসিতে ছায়া বলিল, আমি বলব কে? ইন্দু? না, মিঃ রায়?

বিমল নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

ছায়া হাসিয়া বলিল, বড়লোকটি বোধ হয় আমার সুবিখ্যাত প্রণয় মামা।

বিমল সবিস্ময়ে কহিল, তুমি কেমন করে জানলে?

ছায়া সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, গরীব লোকটি কে, তা বোধ হয় না বললেও চলবে। কিন্তু কখন দেখলেন তাদের? আজ আসবার সময়?

—হ্যাঁ।

বিকট শব্দে বাজ ডাকিয়া উঠিল; পরমুহূর্ত্তে সারা পৃথিবী যেন আলোয় আলো হইয়া গেল। মিসেস্ ঘোষ শশব্যস্তে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, বাজটা কাছেই কোথাও পড়েছে মনে হচ্ছে, না?

এই অহেতুক প্রশ্নের জবাব কেহই দিল না।

মিসেস্ ঘোষ বলিলেন, উনি হয় ত এতক্ষণে কোর্ট থেকে বেরিয়েছেন। দেখি একবার ফোন করে। না বেরিয়ে থাকলেই ভাল।—তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

বিমল ভাবিতেছিল, এ সময়ে ইঁন্দু বাড়ীর বাহির হইল কেন?

ছায়া ভাবিতেছিল, প্রণয় মামা এদিকে আসে না কেন?

আকাশ আর একবার বিরাট গর্জ্জন করিয়া উঠিল, আবার ধরিত্রী আলোকোদ্ভাসিতা হইল।

বিমল বলিল, এ রকম বেড়ান দোষের নয়, তুমি বলছ?

ছায়া মৃদুস্বরে বলিল, নিশ্চয়ই নয়। বন্ধুর সঙ্গে সবাই বেড়াতে যায়, কোন দোষ হয় না।

"না, তিনি আপিসেই ছিলেন।" বলিয়া মিসেস্ ঘোষ সেই ঘরে আসিয়া বসিলেন।

ছায়া বলিল, আজ আমরা গল্প করছি, মা।

—কি গল্প?

ছায়া বিমলের পানে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, এই বৃষ্টি, বিদ্যুৎ এই সব।

মিসেস্ ঘোষ বলিলেন, আজ আর তুমি হেঁটে যেও না বাবা। ওর গাড়ী ফিরলে, সেই গাড়ীতে সকাল সকাল বাড়ী চলে যেও।

———

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বিমল ভুল দেখে নাই।

কিন্তু কিরূপে কি হইল সেটা জানা দরকার। আবু-দি'র কৃতিত্ব অসাধারণ, তিনি যাহা বলেন, তাহা করেন। ধার্য্য রবিবার দিবস অপরাহ্নে হঠাৎ প্রণয় সাহেবের গাড়ীখানা ইন্দুদের ফটকে ঢুকিয়া পড়িয়া ইন্দুকে ব্যস্ত করিয়া ফেলিল। ব্যস্ততার কারণ, মা ক্ষণাকে লইয়া কিছুক্ষণ হইল ইন্দুর পিতৃবন্ধু ও পাশায় পিতৃজয়ী মহেন্দ্র বাবুর কন্যার পাকা-দেখার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে বাহির হইয়াছেন। ইন্দু সচরাচর কোথাও যায় না, যাইতে চায় না বলিয়া মা আজও তাহাকে ডাকেন নাই। না যাইতে হইলেই ইন্দু বাঁচে। কোথায় গেলেই, চারিদিক হইতে দরদীদের আক্রমণ হইতে থাকে এবং নানা স্থানের ও নানা রকমের পাত্র-পরিচয় প্রকাশ পাইতে থাকে, ইহা সহ্য করা অতীব কষ্টকর। তাহার অসাক্ষাতেও দরদের বন্যা বহিতে থাকে সন্দেহ নাই; কিন্তু সে ত শুনিতে পায় না, এই সান্ত্বনা।

সারাদিন মেঘ করিয়াছিল, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, এখন বৃষ্টি থামিয়াছে, হাওয়া চলিতেছে, ইন্দু কাশ্মীরী বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছিল। নীচের ফুলবাগানে এখন আর ফুলের ছড়াছড়ি নাই। সীজন ফ্লাওয়ারের গাছগুলি তুলিয়া ফেলা হইয়াছে, স্থানটি খালি পড়িয়া আছে, পাতাবাহার গাছের বেড়ার ধারে ধারে বেল যুঁই মল্লিকার ঝাড়গুলিতে দুটি চারটি করিয়া ফুল দেখা যায়। ফুল থাক্ আর নাই থাক্— নববর্ষার প্রথম প্রবল বারিধারাস্নাত তরুলতাগুলির স্নিগ্ধরূপে নয়ন ভরিয়া

যায়। কে যেন যত্ন করিয়া তেল মাখাইয়া তাহাদের স্নান করাইয়া দিয়াছে। ধরণী যেমন জলধারাকে নিঃশেষে গ্রাস করিয়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া ভারী হইয়া উঠিয়াছে, এই গাছপালাগুলিও যেন সদ্য সদ্য বাড়িয়া গাঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথম বর্ষার সঙ্গে মানুষের মনের কেমন একটা সম্প্রীতি আছে ; নববর্ষাকে বরণ করিয়া লইবার জন্য মানুষ উন্মুখ হইয়া থাকে, ইন্দুও ছিল ! কি ভাল লাগিতেছিল ঐ ভেজা ফাঁপা মাটি আর সদ্যোবিধৌতগাত্র গাছপালাগুলি !

এমন সময়ে প্রণয় সাহেবের শুভাগমন। ইন্দুর মনে হইল, মহেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে যাইলে এ বিপদে পড়িতে হইত না।

কিন্তু মা নাই, আদর আপ্যায়ন করিয়া বসাইতে হইল।

প্রণয় সাহেব বলিলেন, তুমি নাকি আমার ওপর বড্ড রেগেছ—আমি আসি না বলে ?

ইন্দু প্রথমটা নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছিল, পরে বলিল, আপনাকে কে বললে ?

—বৌদি ! আবার কে ! ক'দিন আসতে পারি নি। মিসেস্ সরকারের মিউজিক ক্লাসের প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউসন সেরিমণির জন্যে একটা প্লেলেট (নাটিকা) লিখতে হচ্ছিল। কালই সেটা শেষ হয়েছে। তুমি রাগ করেছ ইন্দু ?

ইন্দু বলিল, লেখা হয়ে গেল ?

প্রণয় কহিলেন, হ্যাঁ. কাল লিখে, মেয়েদের মধ্যে ভূমিকা ডিষ্ট্রিবিউট্ (বণ্টন) করে দিয়ে এসেছি। "অদৃষ্টের পরিহাসে" শুধুই বালক চরিত্র ছিল ত, "কিশোরী"তে শুধু কিশোরী চরিত্র আছে। ২০এ জুলাই গ্লোবে প্লে হবে। তুমি যাবে ত ইন্দু ?

ইন্দু বলিল, আপনাকে খাবার কিছু দিতে বলি? কি খাবেন?

—বাদলায় কি ভাল লাগে, বল দেখি?

—তা কি জানি?

—জান না? বাদলায় ভাল লাগে, কবিতা লেখা, পাঁপর ভাজা, আর—

ইন্দু তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, তাই বলে আসি।

প্রণয়কুমার কহিলেন, আর ভাল লাগে প্রিয়াসঙ্গ।

ইন্দুর কাণমাথা ঝাঁ ঝাঁ করিয়া উঠিল। অতিথি নারায়ণ, অসম্মান করিতে নাই—এই নীতিবাক্য তাহার মনে আসিল না; মনে হইল, যে লোকটা ঐ মুখে ঐ কথা বলিয়াছে, সেই মুখে একটি চপেটাঘাত করিতে পারিলে তার যেন রাগ যাইত। ইন্দুর সকল অঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

প্রণয়কুমার ইহাকে লজ্জা পরিকল্পনা করিয়া বর্দ্ধিতোৎসাহে বলিতে লাগিলেন, বাঙলার কাব্যসাহিত্য বর্ষা-বন্দনায় সমৃদ্ধ হয়ে আছে; আর তার মূলে আছে, এই প্রিয়াসঙ্গ।

ভাবে বিভোর প্রণয়কুমার বর্ষণক্লান্ত ধূসর আকাশের পানে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "কিশোরী" নাটিকায় আমি সেই কথাই লিখেছি।

—আপনার খাবার দিতে বলি, বলিয়া আরক্তমুখে একরকম উর্দ্ধশ্বাসে ইন্দু চলিয়া গেল। জনহীন অন্ধকার সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া সে তাহার বক্ষের স্পন্দন প্রশমিত করিতে লাগিল। কেন মহেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে যায় নাই, কেন মরিতে বাড়ীতে ছিল, কোন্ কুক্ষণে এই লোকটা তাহাদের গৃহে আসিয়াছিল, কোন্ অশুভক্ষণে সে ইহার সঙ্গে আলাপ করিয়াছিল, আর

কেনই বা ভদ্রতার আভরণটা ফেলিয়া দিয়া অভদ্র হইয়া ইহাকে বিতাড়িত করিতে পারিতেছে না, এই সব কথাই ভাবিতেছিল। লোকটা হয় ত ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতেছে, জুতার মস্ মস্ শব্দ শুনা যাইতেছে, হয় ত বা এই দিকেই আসিয়া পড়িবে, ইন্দু দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেল। ঠাকুরকে পাঁপর ভাজিতে ও চা করিতে বলিয়া, বাবার বৈঠকখানায় ঢুকিল। কক্ষ জনশূন্য! বাবা একটি দিন যদি সকাল সকাল ফিরেন। রোজই দেরী, রোজই রাত!

ইন্দু যে ভয় করিতেছিল, তাহাই ঘটিল। লোকটি বারান্দা হইতে ডাকিল, ইন্দু, ইন্দু!

ইন্দু দু'হাতে বুক চাপিয়া চক্ষু মুদিয়া সে ডাক শুনিতে লাগিল। ডাক ত নয়, যেখান দিয়া, যে পর্য্যন্ত শব্দ যাইতেছে, সব যেন পুড়াইয়া দিতেছে।

আবার আহ্বান, চমৎকার অতিথিসেবা করছ ইন্দু, চমৎকার।

ইন্দু দাঁতে দাঁত চাপিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু অধিকক্ষণ থাকিতে পারিল না। কি জানি, লোকটার অসাধ্য কর্ম্ম নাই, যদি এইখানেই আসিয়া হাত ধরিয়া বসে।

উপরে আসিতে, প্রণয় বলিলেন, হ্যাঁ ভাল কথা! তোমার ইয়ে-র সঙ্গে আলাপ হল যে!

এ লোকটির মুখের পানে চাহিতেও প্রবৃত্তি হয় না, কিন্তু ইয়ে-টি কে জানিবার কৌতূহল দমন করিতে না পারায় চাহিতে হইল। প্রণয় বলিলেন, বুঝতে পারছ না, ঐ যে তোমার ইয়ে গো। কি নামটা ভাল, সুবিমলপ্রকাশ না কি, ভাল যে!

ইন্দুর নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছিল

প্রণয়কুমার হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আমার একটি গার্ল ফ্রেণ্ডকে সে পড়াত, আলিপুরের জজ মিঃ ঘোষের মেয়ে, সম্পর্কে আমার ভাগ্নীও হয়। তাকে পড়াত, তা' সে আর পড়বে না, সেই জন্য তোমার কি বল্লে, ইয়ে-র চাকরীটি গেছে।

সমস্ত দেহ, রক্ত মাংস অস্থি মেদ মজ্জা, সমগ্র লোমকূপ দিয়াও ইন্দু শুনিতেছিল।

—ছায়া তার মাষ্টার মশায়ের জন্য আমাকে অনেক বললে-টললে, যাতে কোথায়ও একটি চাকরী-বাকরী হয়···

—চাকরী-বাকরীর যে বাজার, হওয়া মুস্কিল···

—ছায়ার কাছে আরও অনেক কথা শুনলুম···

ইন্দুর মনে হইতেছিল, তাহার সংজ্ঞা লোপ পাইবে, না-হয় তাহার পক্ষাঘাত হইবে।

—তুমি অত দূরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ইন্দু! এখানে এসে বস না। বলিয়া যে সোফাটায় তিনি বসিয়াছিলেন, তাহারই পার্শ্বের খালি স্থানটুকু নির্দ্দেশ করিলেন।

ইন্দু কথা বলিল না, নড়িল না, বুঝি তাহার ইন্দ্রিয়সমূহ অবশ হইয়া আসিতেছিল।

প্রণয়কুমার আদর ও অভিমানমিশ্রিতস্বরে কহিলেন, আসবে না ত? তাহলে আর বলব না।

ইন্দু অতিকষ্টে শুষ্ককণ্ঠে কহিল, আসছি, আপনি বলুন। বলিয়া সে দ্বারের দিকে চাহিতে লাগিল। খাবার লইয়া ঠাকুর আসিয়া পড়িলে বেশ হয়

মুহূর্ত্তমধ্যে ঠাকুর আসিয়া পড়িল। খাবার গুছাইয়া প্রণয়ের সামনে ধরিয়া দিয়া, পাশের একাসন কৌচটায় বসিয়া অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিল।

—তুমি নাকি তাকে বিয়ে করবে?

প্রশ্নের উত্তর সহজ এবং সরল, 'হাঁ' বলিতে কিছু মাত্র দ্বিধা ছিল না; কিন্তু প্রশ্নকারীর ভাষা, প্রশ্ন করিবার ভঙ্গী ও কণ্ঠস্বর এতই কদর্য্য বলিয়া মনে হইল যে, উত্তর দিতেও ঘৃণা হইল; ইন্দু কোন কথা বলিল না।

—তার একটা ভাল চাকরী হলেই তোমাদের বিয়ে হতে পারবে, এই রকম ঠিক আছে, না?

তবুও ইন্দুর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

—একটা কাজ আছে, চেষ্টা করলে যে না-হয়, তা'ও নয়, তাই ভাবছি।—বলিয়া তিনি গম্ভীরভাবে ভাবিতে লাগিলেন।

ইন্দুর মুখ দিয়া এতক্ষণে কথা বাহির হইল, চা যে জল হয়ে গেল।

—না, এখনও জলের পূর্ব্বাবস্থা—অর্থাৎ বাষ্পাবস্থা রয়েছে। ঐ দেখ, ধোঁয়া উঠ্‌ছে।

—খেয়ে নিন্ না।

—নিই। বেড়াতে যাবে? চল, বেড়াতে বেড়াতে পরামর্শ করব'খন।

আবার সেই জঘন্য প্রস্তাব।

—যাবে? বর্ষার দিনে বেড়াতে বেশ লাগে।

ইন্দু বলিল, বৃষ্টি পড়ছে যে!

প্রণয় বলিলেন, বন্ধ গাড়ীর ভেতর বৃষ্টি ঢোকে না।

ইন্দু বলিল, বাড়ীতে যে কেউ নেই।

—না-ই বা থাকল! বাড়ী চুরী যাবার ভয় আছে কি?

ইন্দু হাসিল।

প্রণয় বলিলেন, ঘরে বসে গল্প করতে ভাল লাগে না। চল, বেরিয়ে পড়ি। সত্যি, পরামর্শ আছে।

যাওয়া উচিত, অথবা নয়, সে কথা আগেই ভাবা হইয়া গিয়াছিল ইহার সঙ্গ ভাল লাগে না, সেই যা; নইলে শুধু বেড়াইতে যাওয়ার আপত্তি কিসের!

—পাঁচ মিনিট, আমি আসছি, বলিয়া ইন্দু বাহির হইয়া গেল। খুব যে আগ্রহ ছিল, তাহা নহে; তবে অনাগ্রহও ছিল না। বেড়াইতেই যখন যাওয়া হইতেছে, একটু প্রসাধন করিতে হয়, ভাল কাপড়ও পরিতে হয়, কপালে একটা ফোঁটাও দিতে হয়! বেশবিন্যাস করিয়া সে যখন এ ঘরে ঢুকিল, মধুলোভে মত্ত অলি পুষ্পসন্নিধানে আসিয়া যেমন গুঞ্জন তোলে, প্রণয়ও তেমনই গুঞ্জন করিয়া উঠিল। কি বলিল না বলিল তাহা বুঝা গেল না বটে, তবে ইন্দুর সৌন্দর্য্যের উচ্চপ্রশংসাই যে তাহার কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত হইল তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। ইন্দু যদি পারিত, সেই মুহূর্ত্তে সাজসজ্জা দূর করিতেও দ্বিধা করিত না।

পথে একটা লোক ছাতি মাথায় ভিজা জুতায় চব্ চব্ করিতে করিতে চলিয়াছে, বহু দূর হইতে ইন্দু তাহাকে দেখিয়া সচকিত হইয়া উঠিয়াছিল। গাড়ী যখন পথিককে অতিক্রম করিল, ইন্দু দুই উৎসুক নেত্রে তাহাকে দেখিয়া লইল। সে-ই বটে! ইন্দু যে তাহার ছায়ামাত্র দেখিলেও চিনিতে পারে। গাড়ী থামাইতে বলিতে ইচ্ছা হইল, পারিল না।

প্রণয় বলিতেছিলেন, কাজটা ভালই; দেড়শ টাকায় আরম্ভ, চার পাঁচশ' পর্য্যন্ত হওয়ার আশা আছে। আমি কালই সব খোঁজ নিয়ে এসে সন্ধ্যার সময় তোমায় বলব, কেমন?

ইন্দু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, আচ্ছা।

প্রণয় কহিলেন, আমার মনে হয়, আমি তোমার ইয়ে-কে বসিয়ে দিতে পারব।

ইন্দুর চোখে অজস্র কৃতজ্ঞতা ফুটিয়া উঠিল।

—কিন্তু আমার পুরস্কার?

স্নিগ্ধ হাসি হাসিয়া ইন্দু চক্ষু নত করিয়া লইল।

—বিয়ের পরে কি আর আমাদের মনে থাকবে?

—না, থাকবে! বলিয়া ইন্দু হাসিল।

—দেখা যাবে, কেমন মনে থাকে!

—দেখবেন।

রাত্রি করিয়া প্রণয় যখন ইন্দুকে বাড়ীতে নামাইতে আসিলেন, মা তখনও ফিরেন নাই।

রান্নাবান্নার ব্যবস্থা হয় নি বোধ হয়, আমি যাই, বলিয়া কণ্ঠের স্বরে মিনতি জ্ঞাপন করিয়া ইন্দু ভিতরে চলিয়া গেল।

দুই তিন দিন পরে প্রণয় বলিলেন, ইন্দু, এইবার তোমার ইয়ে-কে—

ইন্দু রাগিয়া বলিল, ইয়ে ইয়ে করেন কেন বলুন ত?

প্রণয় বলিলেন, কি বলব? লভার? ফিয়াঁসি?

—তা কেন!

—তবে?

আপনি ত তাঁর নাম জানেন।—হাসিয়া ইন্দু মুখ নীচু করিল। একটু পরে বলিল, কি বল্‌ছিলেন ?

—কৈ ?

—এই যে এইমাত্র কি বলছিলেন, তাঁকে—

—তাঁকে ?—প্রণয় বঙ্কিম কটাক্ষে, কৃত্রিম অজ্ঞতার ভাণ করিয়া বলিলেন, তাঁকে—কাকে ?

—যান্‌, আমি জানি নে !

প্রণয় হাসিয়া বলিলেন, ওঃ, তাই ! হ্যাঁ, তোমার ডার্লিংকে দু' এক দিনের মধ্যে আমার সঙ্গে দেখা করতে ব'লে দাও।

ইন্দু সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, ঠিক হয়েছে ?

প্রণয় দুষ্টামি করিয়া বলিলেন, বিয়ের দিন ?

ইন্দু বলিল, যান।

—তাই যাই। কিন্তু তুমিও যাবে ত ? চল "কিশোরী"র ষ্টেজ রিহার্স্যালটা দেখে আসি, এম্পায়ারে।

ইন্দু 'না' বলিতে পারিল না। রিহার্স্যালের লোভে নয়, কিন্তু যে কথাটা অর্দ্ধেক শোনা হইয়াছে, সেই কথাটার শেষ না শুনিলেই যে নয়।

এম্পায়ার হইতে ফিরিবার পথে, প্রণয় বলিলেন, কাল পশু'র মধ্যেই দেখা করতে বলো।

ইন্দু কৃতজ্ঞস্বরে কহিল, বল্‌ব।

প্রণয়কুমার বলিলেন, কিন্তু আমাদের ভুলে যাবে না'ত গো ইন্দুমতী ?

—বন্ধুকে কি কেউ ভোলে।—ইন্দু অবিচলিত কণ্ঠে কথা কয়টি বলিয়া আকাশের পানে চাহিয়া রহিল।

প্রণয়কুমার সুদক্ষ চালক। চক্ষু তাঁহার যেদিকে থাক্, মন যেখানেই নিবদ্ধ থাক্, গাড়ী ঠিকই চলে, কখনও এদিক ওদিক হয় না। এম্পায়ারের রিহার্সালে চল্লিশ পঞ্চাশটি তরুণী ছিল, কিন্তু শুধু সৌন্দর্য্যেই নয়, ইন্দু যেন সকলের মধ্যেও আলাদা, একা। সে যেন একা এক শ'। সকলে তাহার পানে চায়; সে কাহারও পানে তাকায় না। সকলে তাহার সহিত আলাপ করিতে ব্যগ্র, সে আনতমুখে একাকী বসিয়া থাকিতেই চায়।

গাড়ী ছুটিতেছে, ইন্দু কাঁচের বাহিরে মুখ রাখিয়া বসিয়া, তাহার পানে চাহিয়া চাহিয়া প্রণয়কুমার ঐ কথাগুলিই ভাবিতেছিলেন। যত ভাবেন, ইন্দু তাঁহার নিকট ততই মনোরম, ততই কাম্য হইয়া পড়ে। একবার যেন ভাবাতিশয্যে কি একটা কথা বলিয়া ফেলিতেছিলেন, ইন্দু সরিয়া বসিল, তাঁহারও ভাবাবেগ আহত হইল।

রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। প্রণয় ইন্দুকে নামাইয়া দিয়া, চলিয়া যাইতে ইন্দু যখন উপরে উঠিতেছিল, মালী তাহার হাতে একখানি শতভাঁজ কাগজ দিল। বলিল, বিমল দাদাবাবু দিয়া গিয়াছেন।

ইন্দু নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া উপরে ছুটিল। মা কণাকে বুকের কাছে লইয়া শুইয়া গভীর নিদ্রামগ্ন। তবুও শয়নকক্ষে বসিয়া চিঠিখানা খুলিতে তাহার সাহস হইল না। বাথরুমে গিয়া চিঠি খুলিল!

"আজও দেখিলাম, প্রণয় বাবুর সঙ্গে গড়ের মাঠ হইতে বাহির হইয়া তুমি এম্পায়ারে গেলে। খবর লইয়া জানিলাম নাটকের রিহার্সাল হইতেছে; রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত হইবে। আমি দু'তিন দিন মধ্যে কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতেছি—ভাগ্যান্বেষণে।"

কি কঠিন নির্ম্মম পত্র! ইন্দু আর একবার পড়িল। তারপর মাথায় মগের পর মগ জল ঢালিয়া বিছানায় শুইয়া মুখের উপর বালিশ চাপা দিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

কিছুক্ষণ শুইয়া থাকিয়া, ইন্দু উঠিয়া বসিল। বেড্ সুইচ্ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া, চিঠিখানা আর একবার পাঠ করিল। প্রথমটা তার মনে বড় আঘাত লাগিয়াছিল। লাগিবারই কথা। প্রণয়ের সঙ্গে বেড়াইতে গিয়াছে বলিয়া বিমল তাহার উপর রাগ করিয়াছে, ইহা মনে করিতেও তাহার ঘৃণা ও লজ্জা হয়। মেয়েরা কি এতই লঘুচিত্ত যে পুরুষের ছোঁয়াচও সয় না! নারীদের এত লঘুচিত্ত ভাবিবার কি কারণ তাহার আছে? বিমলের উপর ইন্দুর রাগ হইল।

রাগ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না, তাহার হাসি পাইল। পুরুষ কত সহজে ভুল বুঝিতে পারে! তাহার উপর রাগ করিয়া বাবু বিদেশ চলিয়া যাইতেছেন! ওঃ কি রাগ গো! রাগই পুরুষের লক্ষণ! ইন্দুর খুব হাসি পাইতেছিল। ছেলেবেলা হইতেই বিমলের রাগটা কিছু বেশী। এত অল্পে এত বেশী রাগ সচরাচর দেখা যায় না। ছেলেবেলায় মার্ব্বেল খেলার সময় টিপে একটু ভুল হইলে, বাবুর অমনি রাগ হইত; বিমল যখন তাহাদের ছাদে উঠিয়া ঘুড়ি উড়াইত, ইন্দুকেই ধরতা দিতে হইত; ধরতায় ভুল হইবার কথা নয়, ভুল হইতও না; কিন্তু যদি ঘুড়ি না উড়িত

বা কোন কারণে লাট্ খাইয়া পড়িত, বাবুর রাগের শেষ থাকিত না। বিমল যখন ইন্দুকে পড়াইত, মাঝে মাঝে দুষ্টামী করিয়া ইন্দু অঙ্কের খাতা হারাইত, ট্রানস্লেসনের বই হারাইত, ছুরীর অভাবে পেন্সিল কাটা না হওয়ায় টাস্ক্ অসমাপ্ত রাখিত—তাহাতে বিমল এত রাগিত যে, কখনও কখনও পুরা দুই বা তিন দিন পর্য্যন্ত ইন্দুর সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত বলিত না। ইন্দুর আজও মনে আছে, ম্যাট্রিক পরীক্ষার কিছুদিন পূর্ব্বে পরীক্ষা দিবে না বলায়, বিমল আট দিন ইন্দুদের বাড়ীতে পা দেয় নাই। সেই আট দিনে ইন্দু ষোল দিনের পড়া,অঙ্ক করিয়া রাখিয়া, লোক পাঠাইয়া বিমলকে ডাকিয়া আনাইয়া, চমকাইয়া দিয়াছিল। রাগ করিতে বিমল চিরকাল সিদ্ধপুরুষ।

বলিয়াছি, ইন্দুর রাগ অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় নাই—বরং তৎপরিবর্ত্তে যে ভাবটি তাহার মনে জাগিল, তাহার কল্পনাতেও সে তৃপ্তি অনুভব করিতেছিল। ইন্দু ভাবিতেছিল, কাজকর্ম্মের সন্ধানে বিদেশে যাইতে চাহিতেছে, যাক্-না, সে ত ভালই। কলিকাতায় যখন কাজ হইল না, তখন বিদেশে চেষ্টা করাই ত ভাল। সেই করাই ত উচিত। সেদিন ইন্দু একখানা অতি সহজ ইংরাজী নভেল পড়িতেছিল, তাহাতে এইরূপ একটি ঘটনা ছিল :

একটি বড়লোকের ছেলে এক গরীবের মেয়েকে ভালবাসিত। তাহারা বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময়ে ছেলের বাপ এই গোপন ভালবাসার কথা জানিতে পারিয়া ছেলের অন্যত্র, এক ধনীর কন্যার সহিত বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন করিতেছেন জানিয়া ছেলেটি মেয়েটির নিকট হইতে বিদায় লইয়া আফ্রিকায় চলিয়া গেল। সেখানে, সোনার খনিতে

কাজ করিয়া কয়েক বছরের মধ্যে অনেক টাকা রোজগার করিয়া ফিরিয়া আসিয়া তাহার প্রিয়তমাকে বক্ষে ধারণ করিল, বিবাহ করিয়া, ঘর-সংসার পাতিয়া সুখী হইল।

গল্পটি কি সুন্দর! বিদেশে, খনির কাজে ছেলেটি যখন দ্রুত উন্নতি করিতেছে, খনির মালিকের একটি যুবতী মেয়ে কত রকমে কত ভাবে ছেলেটির মনোহরণের কত চেষ্টাই না করিয়াছিল; ছেলেটি কিন্তু কিছুতেই টলিল না। একদিন নৈশনাচের আসরভঙ্গে তরুণীটি যখন বাহুসংবদ্ধাবস্থায় ছেলেটিকে প্রেম নিবেদন করিল, তখন তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরিয়া ছেলেটি তাহার প্রিয়তমার ছবিখানি বুকে করিয়া রাত্রি কাটাইয়া দিল।

আর সেই মেয়েটির বাবা ও মা নানান্ জায়গায় নানা লোকের সঙ্গে মেয়েটির আলাপ করাইয়া দিতে লাগিল—যদি কাহারও সঙ্গে প্রেম হইয়া, মেয়েটি কাহাকেও বিবাহ করে। মেয়েটি সকলের সঙ্গে মিশিল, ভাবও হইল, অনেকের প্রেমভিক্ষাও শুনিল; কিন্তু অচল অটল গিরিশৃঙ্গের মত মেয়েটি দূর-দিগন্তের সুদূর আফ্রিকার পানে চাহিয়া রহিল। বৎসরের পর বৎসর কাটিল, কত ছোট কত বড় হইল, কত বড় বুড়ো হইল, পৃথিবীর কত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, যৌবন চলিয়া গেল, অঙ্গে বুঝি জরার আক্রমণ সুস্পষ্ট হইয়া আসিল! এমন সময়ে অসময়ে বসন্তবিকাশ হইল। লতায় লতায় পাতায় পাতায় রঙের মেলা লাগিয়া গেল; পুষ্পতরু ফুলে ভরিয়া উঠিল; শাখে শাখে অলির গুঞ্জন উঠিল; শীতের কুজ্ঝটিকা অন্তর্হিত হইল; বিহগের কণ্ঠে কলগীত ধ্বনিত হইল। বসন্তে বাঞ্ছিত অতিথি আসিয়া প্রেম-সম্ভাষণ করিল।

গল্পের উপসংহারটি আরও মিষ্ট। ছেলের বাপ খুব বড় লোক—এ

একমাত্র ছেলে, বাপের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া কোন্ দূরদেশে চলিয়া গিয়াছে, কোন খবর নাই। বাপ যখন অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন, শয্যা হইতে উঠিতেও বড় পারেন না, এমন সময় একদিন সংবাদপত্রে শুভ-বিবাহ-সংবাদ-স্তম্ভে পুত্রের বিবাহের খবর দেখিলেন। দেখিয়া বুড়া কি করিলেন?—তাঁর সমস্ত বিষয়-আসয়ের দানপত্রের সঙ্গে পিতৃ-হৃদয়ের অফুরন্ত আশীর্ব্বাদ এক মস্ত লেফাফার মধ্যে পুরিয়া বিবাহবাসরে পাঠাইয়া দিলেন। গীর্জ্জার ধর্ম্মযাজক পাত্র-পাত্রী উভয়ের শিরে মঙ্গলময় ধাতার করুণার বাণী বৃষ্টি করিতেছেন, সেই সময়ে মর্ত্ত্যের দেবতার আশীর্ব্বাদও তাহাদের হস্তগত হইল। বিবাহশেষে বর-কন্যা যখন গীর্জ্জা হইতে শোভাযাত্রা করিয়া বাহিরে আসিতেছিল, তখন বরের আঁখিকোণে অশ্রুবিন্দু সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল। এই স্নিগ্ধ, পবিত্র, ক্ষুদ্র অশ্রুবিন্দু উপহার দিয়াই গল্প-লেখক গল্প শেষ করিয়াছেন।

আজ এই নিদ্রাহীন নির্জ্জন নিশীথে গল্পটার আদ্যোপান্ত ইন্দুর মনের উপর দিয়া খেলা করিয়া গেল। ইন্দুর মনে হইতেছিল, বিমল আফ্রিকা-যাত্রায় প্রস্তুত হইয়া তাহার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিতে আসিয়াছে। বিদায় দিতে ইন্দুর চোখে জল আসিয়া পড়িতেছে সত্য, ইন্দু প্রাণপণে অশ্রু গোপন করিয়া, হাসিমুখে বিদায় দিবার চেষ্টা করিতেছে। বলিতে চাহিতেছে, যাও, যত দূরে ইচ্ছা যত দিনের জন্য হয়, তুমি যাও; তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিয়া এস। আমি তোমার, চিরদিন তোমারই থাকিব। খবর দিতে ইচ্ছা হয় দিও, খবর লইতে ইচ্ছা হয়, লইও। আমি চিরদিন তোমার! চিরদিন এই জায়গায়, এই ভাবে তোমাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য দাঁড়াইয়া থাকিব। কথাগুলা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিতেছে না।

বাঙ্গালীর মেয়ের লজ্জা আসিয়া দু'হাতে গলা চাপিয়া ধরিতেছে, তবুও ইন্দু যেন সজল চোখ দিয়া, তাহার বিকম্পিত সকল অঙ্গ দিয়া ঐ কথাগুলা তাহার বিদায়কামী প্রিয়তমকে বলিয়া দিতেছে।

ভাবিতে ভাবিতে আবেশে তাহার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া আসিল। সেই আবেশের রেশ-টুকুকে পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করিবার জন্য, আলোটি নিবাইয়া দিয়া, অন্ধকারে সে চক্ষু মুদিয়া শুইয়া পড়িল। অন্ধকার আর অন্ধকার রহিল না। অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন বনবীথিকা অরুণালোকে সহসা যেমন উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, ইন্দুর মনও আলোকজ্যোতিসমাকীর্ণ হইয়া উঠিল। সে যেন সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদি দিয়া বিমলকে উপভোগ করিতে লাগিল।

কিন্তু একটা কথা কাঁটার মত থাকিয়া থাকিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিতেছিল। গড়ের মাঠে প্রণয়ের সঙ্গে গাড়ীতে দেখার সহিত বিমলের বিদেশযাত্রার কথাটা তাহার প্রাণে কাঁটার মত ফুটিয়াছিল। কেন সে প্রণয়ের সঙ্গে গিয়াছিল, তাহা জানিলে বিমলের যে তাহার উপর বিরক্তির কোনই কারণ থাকিবে না, বরং তাহার আনন্দই হইবে—মনে মনে ইহা নিশ্চিত জানিলেও এ কথাটা তাহার মনকে কেবলই অপ্রসন্ন করিয়া তুলিতেছিল যে, মানুষ এত অল্পে ভুল বুঝে কেন?

বিমলের সঙ্গে তাহাকে দেখা করিতেই হইবে; তাহার বিদেশযাত্রাও অন্ততঃ কয়েক দিনের জন্য বন্ধ করিতে হইবে, কিন্তু কি বলিয়া বন্ধ করিবে, ইহাই এখন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রণয়কে দিয়া চাকরীর চেষ্টা হইতেছে এ কথা সে এখন কিছুতেই বলিবে না। কাজটি হইলে প্রণয়ের গাড়ী চড়িয়া প্রণয়কে সঙ্গে লইয়া তাহাকে সংবাদ দিতে যাইবে, ইহাই

আছে ইন্দুর কল্পনা। কিন্তু এখন যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে এখনই দেখা না করিলেই নয়। আজই এই মুহূর্ত্তে গিয়া বলিয়া আসিতে পারিলেই যেন স্বস্তিলাভ হয় যে, ওগো, আরও কয়েকটা দিন এখানেই থাক। বিমল হয় ত জিজ্ঞাসা করিবে, কেন? ইন্দু কি উত্তর দিবে? কাজের চেষ্টা হইতেছে ইহা বলা হইবে না। সে কথা বলিতে গেলেই প্রণয়ের কথা, তাহার গাড়ীতে বেড়ানর কথা, এই রকম অনেক কথা উঠিয়া পড়িতে পারে। তাহা বলা হইবে না। তবে কি বলা হইবে? অকস্মাৎ ইন্দুর মুখখানি হাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কেনর জবাব ঠিক হইয়া গিয়াছে। বলিলেই হইবে, আমার ইচ্ছা, তুমি আরও কয়েক দিন অপেক্ষা কর। বিমল যে রকম একগুঁয়ে লোক, হয় ত নানান্ ওজর আপত্তি তুলিবে, তখন আর একটি কথায় তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া দিলেই হইবে। সেই কথাটি মনে হইবামাত্র ইন্দুর সর্ব্বাঙ্গে যেন হাসির লহরী-লীলা উত্থিত হইল। কিন্তু সে কথাটি কি? যত ভাবে, ততই হাসি আসে। শেষে হাসি আর চাপিতে পারিল না, নিজের মনে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বিমল যখন কেবলই ওজর আপত্তি করিতে থাকিবে, তখন একটু হাসিয়া, একটু গম্ভীর হইয়া, একটু কটাক্ষ করিয়া ইন্দু বলিবে, আমার হুকুম, তুমি এখনই যাইতে পারিবে না। কেমন, আর তোমার বলিবার কিছু আছে?

বিমল নিশ্চয়ই বলিবে, না, আর কিছুই বলিবার নাই।

বলিবার আর কি-বা থাকিতে পারে?

বাকী রাতটা ভালই কাটিল। সমস্ত দেহের ভিতর দিয়া একটা যেন অতিসূক্ষ্ম পুলকের প্রবাহ ছুটাছুটি করিতেছিল। একটির পর একটি

করিয়া সুখতরুটিতে কত সুখপুষ্প যে ফুটিল, নিশীথের শান্ত নীলনভে কত সুখতারা যে উঠিল, তাহার সংখ্যা নাই। চিন্তার গতি যে কত দ্রুত, কত সুদূর-প্রসারী তাহা বলা যায় না। ভাবিতে ভাবিতে বিমলের মা, সেই ক্ষুদ্র গৃহ, ক্ষুদ্র সংসারের একটি মধুরতম চিত্র ইন্দুর চিত্তাকাশে ফুটিয়া উঠিয়া আবেশে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

আকাশে তখনও ভোরের দেখা নাই, নীড়নিদ্রিত পক্ষী-কূজন শুনিয়াই ইন্দু আলো জ্বালিয়া ঘড়ী দেখিল, ভোর হইতে বেশী দেরী নাই। ইন্দু শয্যা ত্যাগ করিল। স্নান-কামরায় ঢুকিয়া হাতমুখ ধুইয়া বস্ত্র-পরিবর্ত্তন করিয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে মাতার কক্ষে প্রবেশ করিয়া কণাকে তুলিল। কণাকে বাহিরে আনিয়া বলিল, বেড়াতে যাবি? ভাত খাবি?—না, হাত ধোব কোথা?

—যাব দিদি, যাব।

—তবে চট্ করে মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে নে, শব্দ করিস নে। আস্তে আস্তে নীচে আয়, আমি ততক্ষণ গাড়ী বার করাই!

কণা বাথরুমে, ইন্দু নীচে চলিয়া গেল। ইন্দুর কেবলই ভয় হইতেছিল, মা না উঠিয়া পড়েন। মা উঠিয়া পড়িলে বাহির হওয়া মুস্কিল। মিথ্যা কথা বলিতে পারিবে না, কিন্তু সত্য বলাও মুস্কিল। মা উঠিলেন না, কণা আসিয়া পড়িল।

গাড়ী ফটক পার হইলে, কণা জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাবে দিদি? ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল?

—চল্ না, দেখতেই ত পাবি।

ড্রাইভারকে ইন্দু পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ দিয়া রাখিয়াছিল, গাড়ী একেবারে

বিমলের গৃহদ্বারে আসিয়া থামিল। সবে মাত্র ভোর হইয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটির ধাঙ্গড়রা রাস্তা ঝাড়ু দিতেছে; কচিৎ কোন গৃহদ্বারে ঠিকা-ঝি দাঁড়াইয়া খটাখট শব্দে কড়া নাড়িয়া, বাড়ীর লোকের নিদ্রা ভাঙ্গাইতেছে; দুই এক জন প্রাতর্ভ্রমণবিলাসী বৃদ্ধ লাঠি ঠক্ ঠক্ করিয়া ধীরমন্থর গমনে বেড়াইতে চলিয়াছেন; সহরের সর্ব্বাঙ্গে সুপ্তি যেন তখনও জড়ান রহিয়াছে।

ড্রাইভার নামিয়া গিয়া কড়া নাড়িতে লাগিল।

ইন্দু সাগ্রহে দ্বারের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। তাহার এই সময়কার মনের কথাও কি আমার পাঠিকারাণীদের বুঝাইতে হইবে? তাঁহাদের বোধ বা অনুমানশক্তির উপর আমার এতখানি হীন ধারণা নাই. তাই আমি নিরস্ত হইলাম।

শরতের নীলাকাশ, কত রৌদ্র, কত মেঘ, কত বর্ণের কত লীলা! আজি সুপ্রভাত, এক মুহূর্ত্ত পরে ইন্দু এই কথাটিই বলিবে, হয়ত এই কথাটিই শুনিবে। সত্যই—সত্যই আজি সুপ্রভাত! ইন্দুরা যেদিন পুরাতন বাসা ছাড়িয়া নিজেদের প্রাসাদোপম গৃহে উঠিয়া গিয়াছে, সেইদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রথম প্রভাতে প্রিয়মুখদর্শন-সুখ হইতে তাহারা বঞ্চিত। যখন পাশাপাশি বাড়ী ছিল, তখন প্রত্যেকটি প্রভাত সুপ্রভাত হইয়াই তাহাদিগকে অভিনন্দিত করিত, প্রত্যেকটি রজনীও তাহাদের নিকট শুভরাত্রি বিজ্ঞাপিত করিত। সে সুখস্বপ্নের অবসান হইয়াছিল।

ইন্দু পাশের সেই বাড়ীটার দিকে চাহিয়া দেখিল, ইন্দু শুনিয়াছিল, সে বাড়ীটায় মাড়োয়ারীরা বাস করে; দেখিয়া তাহাই মনে হয় বটে। বারান্দায় চট, ছেঁড়া থলের পর্দ্দা, ঝুড়ি—কত কি টাঙ্গানো।

দ্বার খুলিয়া গেল—বিমল নয়, তাহার জননী। ইন্দু তাড়াতাড়ি নামিয়া তাঁহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল, বিমলের মা তাহাকে বুকে চাপিয়া ক্ষণাকে ডাকিয়া বলিলেন, আয়, আয় ক্ষণু মা, আয়।

ফ্রক-পরা ক্ষণা কাহাকেও প্রণাম করিতে বড় চায় না, দাম্ভিকতা নয়, লজ্জা। পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে তাহার বড় কুণ্ঠা। আসল কথা, কুণ্ঠাটা প্রণাম করিতে হয় না, প্রণামের পর, বয়স্ক লোকেরা যে চিবুক ধরিয়া আদর ও আশীর্ব্বাদ করেন, তাহাতেই তাহার যত লজ্জা। কোন গতিকে মাথাটা না-চৌকাঠে না-পায়ে ঠেকাইয়া সে আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিমলের মা প্রণামের অপেক্ষা না করিয়াই ক্ষণাকে বুকে তুলিয়া লইলেন। দুই বাহুতে দুই বোন্‌কে চাপিয়া ধরিয়া চলিতে চলিতে বিমলের মা বলিলেন—হতভাগা ছেলে এক পোর রাত থাকতে বেরিয়ে গেছে, জজ-সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। আটটায় আগেই জজ-সাহেব বেরিয়ে যান কি-না, তাই রাত থাকতেই বাছাকে বের হতে হয়েছে। সে যে অনেক-দূর, চিড়িয়াখানা ছাড়িয়ে যেতে হয়, বিমল বলে কি-না! জজ-সাহেব সুন্দরবনে না কোথায় পাঠাবেন তাকে। তাই গেছে।

ইন্দু নতমুখে বলিল, সুন্দরবনে কেন মা?

'মা!' মাতৃসম্বোধনে কত মোহ, কত মধু, কত সন্তোষ! বৃদ্ধার হৃদয় ভরিয়া গেল, স্নেহসরসী কানায় কানায় ছাপাইয়া উঠিল। ইন্দুর উপর স্নেহ চিরদিনই ছিল, তাহার মুখে মাতৃসম্বোধনে স্নেহ যেন আরও উচ্ছ্বসিত হইল, পরম পরিতুষ্টচিত্তে তাহাকে আরও জোরে বুকের উপরে

চাপিয়া বলিলেন, হাঁ্যা মা, জজ-সাহেবের এক সাহেব বন্ধু অনেক জমি নিয়ে সেখানে চাষের কাজ করছেন, জজ-সাহেব বিমুকে সেইখানে পাঠাচ্ছেন। কে জানে মা, সে কত দূর দেশ, কেমন জায়গা!

বৃদ্ধা একটু থামিয়া, একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, কলকাতায় ত বাছার কাজকর্ম্ম হল না, তোমার বাবাও কিছু করলেন না, যে মেয়েটিকে পড়াচ্ছিল, সেও আর পড়বে না। একটা ত কিছু করতে হবে মা, সমর্থ ছেলে, বসে থাকতে ত পারে না, আর বসে থাকলে দুটো পেট চলেই বা কোত্থেকে? তাই যাচ্ছে বিদেশে।

ইন্দুকে নতাননে নীরব থাকিতে দেখিয়া বৃদ্ধা পুনশ্চ বলিলেন,ঠাকুরপো চেষ্টা করলে কি কিছু করতে পারতেন না মা?. কি জানি, বাছা, আমি ওসব বুঝি নে। সেদিন তোমরা চলে যাওয়ার পর বিমু বাড়ী এল, আমি বললুম, তোর কাকা বাবু তোকে ডেকেছেন, একবার দেখা করিস বাছা। তখন বললে যাব, তারপর কি যে হ'ল, কত বার বললাম, কথা কানেই তোলে না। কাল যখন সুন্দরবনের কথা বললে, আমি তোমাদের সঙ্গে দেখা করে খবর দিয়ে আসতে বললুম, বললে, কি দরকার মা! অনেক রাত করে ফিরল; আমি ভাবলুম, গেছল বুঝি তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে; জিজ্ঞেস করলুম, বললে, গেছলুম। কিন্তু দেখা করি নি!

ইন্দু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বৃদ্ধা বার বার তাহার মুখের পানে চাহিয়া, অবশেষে বলিলেন, একটু মোহনভোগ ক'রে দোব ইন্দু, খাবে?

—না মা, বাড়ীতে বলে আসি নি, ভোরে বেড়াতে বেরিয়েছি—ফিরে গিয়ে বাড়ীতেই খাব।

বৃদ্ধা আর কোন কথাই বলিলেন না। ইন্দু তাঁহার পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিতেই, তিনি তাহার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন সত্য; কিন্তু যে স্নেহের উত্তাপের সহিত তিনি ইন্দুকে প্রত্যুদগমন করিয়া লইয়াছিলেন, সে উত্তাপটুকু যেন অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। স্নেহের উত্তাপের অভাবটুকু স্নেহকামী মাত্রেই বুঝিতে পারে।

ক্ষণা প্রণাম করিবার দায় এড়াইবার জন্য আগে-ভাগেই গিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছিল। ইন্দু গাড়ীর দিকে যাইতে যাইতে ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, জজ-সাহেবের বাড়ীর ঠিকানাটা আপনি জানেন মা?

—আমি ত জানি নে বাছা, তবে জজ-সাহেব পরশু যে চিঠি লিখেছিলেন, সে চিঠিটা আছে, দেখবে এস ত মা, তাতে যদি ঠিকানা লেখা থাকে।—বলিয়া ইন্দুকে লইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিলেন।

ছোট, অন্ধকার ঘর, দু'পাশে দু'খানা তক্তপোষ পাতা। বুঝিতে বিলম্ব হয় না, একখানিতে মাতা, অন্যখানিতে পুত্র বিশ্রাম গ্রহণ করেন। বিমলের শয্যার একপাশে এক গাদা বই, খাতা, পেন্সিল, দোয়াত, কলম, চিঠি, খবরের কাগজ রক্ষিত। ইন্দু সেই বিছানায় বসিতে, বিমলের মা বলিলেন, ঐ বড় খামটা দেখ ত বাছা, ঠিকানাটা আছে কিনা।

—দেখছি। ক্ষণা বুঝি গাড়ীতেই বসে রইল।

—আমি ডাকছি তাকে, তুমি দেখ।—বৃদ্ধা বাহির হইয়া গেলেন।

ইন্দু ইহাই চাহিতেছিল। এই ঘরখানিকে নিভৃতে, একান্তে সে যেন প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইতে চায়। ঘরখানির সর্ব্বত্র দারিদ্র্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দণ্ডায়মান।

ইন্দু ঘরখানিকে, আসবাবপত্রগুলিকে একবার যেন হৃদয় মেলিয়া

দেখিয়া লইল। তারপর একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নির্দ্দিষ্ট পত্রখানি খুলিয়া তাহাতে যে ঠিকানা ছিল, সেই ঠিকানাটা মনে টুকিয়া লইয়া বাহির হইবার আগে আর একবার ঘরখানি, শয্যাটি দেখিয়া বাহিরে গেল।

বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠিকানা পেলে ইন্দু?

ইন্দু হাসিয়া বলিল, পেয়েছি মা।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি সেখানে যাবে মা?

ইন্দু লজ্জারুণ মুখে কহিল, হাঁ মা, একবার দেখা ক'রে যাব।—বলিয়া তাড়াতাড়ি একটা প্রণাম সারিয়া দ্রুতপদে গিয়া গাড়ীতে উঠিল। একটু আগে স্নেহের উত্তাপটুকুর অভাব বুঝিতে ইন্দুর বিলম্ব হয় নাই। এবার বিদায়কালে সেই উত্তাপ সুদে-আসলে দশ গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতেও দেরী হইল না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সুবিমল জজ-সাহেবের বাড়ীর বাহিরে আসিতেছিল, ইন্দুদের গাড়ী থামিল। ইন্দু মুখ বাড়াইয়া বসিয়াছিল, দেখিয়া বিমল আস্তে আস্তে গাড়ীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, তোমরা এখানে?

ইন্দু হাসিয়া কহিল, ছায়ার সঙ্গে আলাপ করতে!

—ছায়া কি এত সকালে উঠেছেন? শুনেছি, তিনি অনেক বেলায় ওঠেন। খবর দেওয়া আছে নাকি?

ইন্দু হাসিয়া বলিল, না।

বিমল বলিল, যাও ভিতরে, ছায়ার মা আছেন।

—তুমি কোথায় যাবে?

—দেখি,—বলিয়া বিমল অন্যদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইল।

ইন্দু হাসিতে হাসিতে বলিল, গাড়ীতে ওঠ না। তারপর দেখো অখন।

বিমল সাশ্চর্য্যে কহিল, তুমি ছায়ার সঙ্গে দেখা করবে না?

—না করলেও ক্ষতি হবে না।

—এলে দেখা করতে, অথচ—

—ইচ্ছা, সে ভাবনায় তোমার দরকার কি! তুমি ওঠ ত—বলিয়া সে গাড়ীর দ্বার খুলিয়া দিল।

—কিন্তু—

ইন্দু বলিল, কিন্তু-মিন্তু-টিন্তু সব শুনব 'খন। উঠে এস।

—সেটা কি ঠিক হবে?

—কিছু অঠিক হবে না।

—কিন্তু—

—আঃ।

বিমল ক্ষণার পানে চাহিয়া বলিল, ক্ষণা কি বলে?

ক্ষণা হাসিয়া বলিল, খনার বচন হচ্ছে—

আগে চড় গাড়ী

পরে চল বাড়ী…

—বাক্যেক্ষণা!—বলিয়া বিমল গাড়ীতে উঠিবে, ছায়া ফটকের সামনে আসিয়া ডাকিল, মিষ্টার রায়!

বিমল ফিরিয়া দাঁড়াইল।

—গাড়ীতে কে?

ইন্দু নামিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিয়া বলিল, দেখুন ত, চিনতে পারেন কি না!

—নমস্কার। আপনি ইন্দু! আসুন, আসুন।

—আজ বড্ড দেরী হয়ে গেছে। আর একদিন তখন—

—তখনকার কথা তখন, আজ আসুন ত। কারু বাড়ীতে এসে না বসে গেলে কি হয় জানেন?

—না, কি হয়?

ছায়া ইন্দুর একখানা হাত ধরিয়া ফেলিয়া মধুরকণ্ঠে বলিল, বিয়ে হয় না।

লজ্জায় ইন্দু রাঙা হইয়া উঠিল।

ছায়া বিমলের দিকে ফিরিয়া বলিল, দেখছেন মিঃ রায়, তবুও উনি নামছেন না!

বিমল বলিল, আমি যাই।

—ও কথা আপনার উপরও খাটে জানবেন।—ইন্দুর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল, এস না ভাই।

ইন্দু বলিল, বাড়ীতে বলে আসিনি, দেরী হলে বাড়ীর লোকে ভাববেন, তাই—

কিছু ভাববেন না, আমি সঙ্গে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসব। বকুনি খেতে হয় আমি খাব। আমার খুব অভ্যেস আছে।—বলিয়া ছায়া হাসিল! বিমলের উদ্দেশে কহিল, ক'দিন ধরে, বুঝলেন মিঃ রায়, মা'র বকুনি ছাড়া আর কিছু খেতে হয় নি।

বিমল বলিল, পড়া ছেড়েছেন বলে ?

—না, অন্য কারণও আছে। চলুন না, সব বলছি। এস ভাই।

ইন্দু আর আপত্তি করিতে পারিল না, কণাও নামিল।

পড়ার ঘরে তাহাদের বসাইয়া, বয়কে খাবার ও চা আনিতে বলিয়া ছায়া বলিল, তোমাদের বাড়ীতে ফোন আছে ভাই ? আছে ? নম্বর কত বল ত ? আমি একটা ফোন করে দিই।

ইন্দু, সেই সঙ্গে বিমল সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ইন্দু বলিল, ফোন করবার দরকার নেই ; একটু পরেই ত যাব।

ছায়া মুখখানি বিমর্ষ করিয়া কহিল, একটু পরেই যাবে কেন ভাই ? তুমিও স্কুল-কলেজে পড় না, আমিও না, তাড়া কিসের ? এক কাজ কর, তোমাদের গাড়ী ছেড়ে দাও, আমাদের গাড়ীতে আমি তোমাদের রেখে আসব।

গাড়ী ছাড়িয়া দেওয়াও সমীচীন বলিয়া ইন্দুর মনে হইল না। মা খুঁটিয়া খুঁটিয়া প্রশ্ন করিয়া ড্রাইভারের নিকট হইতে যা তা কতকগুলো কথা বাহির করিয়া অনর্থ ঘটাইতে পারেন।

ইন্দু বলিল, আজ সকাল সকাল যাই, এর পরে একদিন এসে আপনার কাছে থাকব।

—আমি কারও আপনি, আপনার হতে চাই নে।

—বেশ, তোমার কাছে, হল ত ?

চা ও খাবার আসিল। খাওয়ার পরে বিমল বলিল, আমি যাই।

ছায়া বলিল, এবার বুঝি আপনাকে খোসামোদ করতে হবে !

বিমল হাসিয়া বলিল, না, না, তা করতে হবে না। মিষ্টার ঘোষ

একখানা চিঠি দিয়েছেন, এক সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হবে, তাই।

—কখন্ দেখা করতে হবে ?

—দুপুর বেলা।

—দুপুরের এখনও পাঁচ ঘণ্টা দেরী আছে। পাঁচ ঘণ্টায় গয়ায় পৌঁছান যায়—ছায়া হাসিয়া, ইন্দুর পানে চাহিয়া বলিল, প্রণয় মামার "কিশোরী"র রিহার্স্যাল দেখছ, কেমন ?

ইন্দুর মুখ লাল হইয়া উঠিল। এ কথা বিমলই ছায়াকে বলিয়াছে ভাবিয়া আরক্ত মুখে বিমলের পানে একটি তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া কহিল, রিহার্স্যাল দেখে কিছু বুঝা যায় না।

—মাতুল মহাশয় কাল রাত্রে দয়া ক'রে আমাদের এখানে এসেছিলেন।

তবে বিমল বলে নাই! ইন্দুর মন অনেকখানি হাল্কা হইয়া আসিল।

—তোমরা একটু ব'স ভাই, আমার মা সকালেই কোথায় বেরুচ্ছেন, একটু দেখা ক'রে দু'টো বকুনি খেয়ে আসি। তোমার বোন্‌টি ভাই বড় লক্ষ্মী। সেই যে ঘাড় গুঁজে বসেছে, মাথাটি তোলবার নাম নেই। তোমার নাম কি গা লক্ষ্মী মেয়ে ?

ক্ষণার মাথা বুকের সঙ্গে মিশিয়া গেল। জবাব আর দিল না, ইন্দু বলিল, ওর নাম ক্ষণপ্রভা, আমরা বলি, ক্ষণা।

—এস, ক্ষণা-লক্ষ্মী, তোমাকে আমার সুখ-ঐশ্বর্য্য দেখিয়ে আনি।—বলিয়া সে একরকম টানিতে টানিতেই ক্ষণাকে লইয়া চলিয়া গেল।

ইন্দুর মুখে সলজ্জ হাস্য ফুটিয়া উঠিল। সে হাসির অর্থ দুর্বোধ্য নয়।

ছায়া যে তাহাদের দুই জনকে নিভৃত বাক্যালাপের সুযোগ দিতে ক্ষণাকে লইয়া অন্তর্দ্ধান করিল, তাহা বুঝিয়াই এই হাসিটুকু। বিমলেরও হাসিবার কথা; কিন্তু মুখখানা ভার করিয়া সে বসিয়া রহিল; কোনরূপ ভাবান্তরই দেখা গেল না।

যত বড় ভালবাসার লোকই হোক, ঐ রকম অবস্থায় কথা আরম্ভ করা কি যায়! বিমল এমন নিঃসম্পর্ক, এমন বিচ্ছিন্ন হইয়া বসিয়া আছে, যে, কথা আরম্ভ করিতে সত্যই ইন্দুর কুণ্ঠাবোধ হইতেছিল। কিন্তু এই অত্যল্প অমূল্য সময়টুকু হেলায় হারাইতেও পারা যায় না। তাহা যায় না বলিয়াই ত আরও দুঃখ, আরও কষ্ট।

ইন্দু দুই তিন মিনিট অপেক্ষা করিল, তারপর বলিল, তুমি সুন্দরবনে যাবে?

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর, হ্যাঁ।

—কাজের চেষ্টায়?

—হ্যাঁ।

—কবে যাবে?

—বোধ হয় কালই।

—আর কয়েক দিন পরে গেলে হয় না?

—কেন?

এই প্রশ্নই ইন্দুর মনে কাল রাত্রেও জাগিয়াছিল। রাত্রে প্রশ্নের সদুত্তরও ঠিক হইয়াছিল; সে উত্তর এখনও মনে ছিল, কিন্তু এই লোকটির নিঃসম্পর্ক নিস্পৃহ ভাব দেখিয়া উত্তর গলার উপরে আসিল না।

বলিল, এর মধ্যে কলকাতায় কোন কাজ হতেও ত পারে।

—না।

ইন্দু বলিল, কি না?

বিমল কহিল, কলকাতায় হবে না।

ইন্দু রাগ করিয়া বলিল, হতেও পারে, ক'দিন থেকে গেলে দোষ কি?

—দোষ কিছুই নেই; তবে মিছে সময় নষ্ট করতে ভাল লাগে না।

ইন্দু এইবারে কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, সময় নষ্ট হবে না।

বিমল বলিল, আমি আজই যাচ্ছি নে, হয়ত দু' তিন দিন এখনও আছি।

ইন্দু মনে স্বস্তি অনুভব করিয়া বলিল, যাবার আগে আমায় না বলে যাবে না ত'?

বিমল কঠিন স্বরে কহিল, তা বলতে পারি নে। নিজের ইচ্ছের উপর ত সব নির্ভর করে না, যখন ডাক পড়বে, তখনই যেতে হবে।

ইন্দু বলিল, বেশ, কিন্তু যাবার আগে একবার দেখা করে যাবে না কেন?

—কি দরকার?

ইন্দু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিমলের পানে চাহিল। সে ব্যক্তি পূর্ব্বের মত নির্ব্বিকার, নিস্পৃহ ও নিঃসম্পর্ক।

ইন্দু বলিল, রাগ করেছ?

—না, রাগ কিসের?

ইন্দু হাসিয়া বলিল, বড্ড রাগ করেছ; কিন্তু কেন রাগ করেছ? মানুষের নিজের ইচ্ছের উপর সব নির্ভর করে না, একথা কেন—পূর্ব্বে না?

বিমল ইন্দুর মুখের উপরে চক্ষু রাখিল।

ইন্দুর চোখ ছল ছল করিতেছিল, বুকের ভিতর হইতে অশ্রু যেন উৎসাকারে উপরে উঠিতে চাহিতেছিল। হায়, একথা লইয়া আলোচনা করা যায় কেমন করিয়া! কিন্তু সময় সংক্ষেপ, প্রয়োজন বড় বেশী, আলোচনা না করিয়াও উপায় নাই।

দুজনে দুইটি আলাদা সোফায় বসিয়াছিল। ইন্দু উঠিয়া, বিমলের সোফায় আসিয়া বসিয়া, তাহার একখানা হাত ধরিয়া বলিল, কেন তুমি আমায় ভুল বুঝলে?—বলিতে বলিতে দু' ফোঁটা অশ্রু টপ টপ করিয়া তাহাদের যুগ্মকরের উপর ঝরিয়া পড়িল। বিমল তাহা দেখিল।

ইন্দু বলিল, আমার মা আমার ব্যবহারে সুখী ন'ন; বাবা আপনভোলা মানুষ, তিনিও ব্যস্ত হয়ে রয়েচেন; আমার মনে কত যে অশান্তি তা'ত তুমি জান। সব জেনে শুনেও তুমি যদি আমায় ভুল বুঝ—কথাটা সে শেষ করিতে পারিল না।

বিমল তবুও নিরুত্তর।

ইন্দু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, সব কথা বলবার এখন সময় নেই; কিন্তু তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমায় ভুল বুঝে আমাকে কষ্ট দিও না, নিজেও কষ্ট পেও না। বল, লক্ষীটি, আমার এ কথা রাখবে? চুপ করে রইলে কেন? বল, লক্ষী-সোনা-মণি আমার, বল, ভুল বুঝবে না?

এইবার বিমল কথা কহিল; বলিল, ইন্দু, তোমার মা যা করতে চাইছেন তোমার পক্ষে সেই ত ভাল।

ইন্দু বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

বিমল বলিল, সবদিক ভেবে দেখলে, সেই ব্যবস্থাই ত ভাল!

—না, না, ভাল নয়, একটুও ভাল নয়।

—কেন ভাল নয় ?

—মানুষ জীবনে কি চায়, বল ত ইন্দু ?

ইন্দু কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে বিমল বলিতে লাগিল, মানুষ চায় স্বাবলম্বী হতে ; মানুষ চায় সন্তোষ, মানুষ চায় দীর্ঘ যৌবন আর সুদীর্ঘ জীবন। দরিদ্রের ঘরে, আর দরিদ্রের হাতে পড়লে জীবনের সাধ মিটবার আশা থাকে কি ?

ইন্দু বলিল, কে বললে মানুষ ঐ সব চায় ? আমি জানি, মানুষ ওসব কিছু চায় না। মানুষ চায় সুখ, শান্তি। এর বেশী সে চায় না ; চায় না।

ঘরের বাহিরে ছায়ার মধুর কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। ইন্দু তাড়াতাড়ি বলিল, আমার কথা মনে থাকবে ?

—থাকবে।

—দেখা না ক'রে কোথাও যাবে না ?

—না।

ইন্দু উঠিয়া অন্ত সোফায় বসিল।

ছায়া ঘরে ঢুকিয়া কোন দিকে না চাহিয়া বলিল, সকালেই এক পসলা হয়ে গেল। ক্ষণা শুনেছে। না ক্ষণা ?

ক্ষণা মুখ গুঁজিয়া বসিয়া রহিল।

ছায়ার মুখে আষাঢ়ের ঘনঘটা। ছায়া বলিল, আপনার সঙ্গে আমার অনেক পরামর্শ আছে মিঃ রায়। আমার এ বিপদের সময় আপনিই আমার একমাত্র বন্ধু।

একটু থামিয়া বলিল, বিলেতের খবর জানেন না বোধ হয় ?

বিমল বলিল, না।

—অনেকদিন থেকে খরচ পাঠান বন্ধ হয়ে গেছে। মা-ই বন্ধ করেছেন; আমি জানতুম না, কাল চিঠি এসেছে তাতেই জানলুম। এই দেখুন চিঠি।—ড্রয়ারের ভিতর হইতে ছায়া একখানা রঙীণ খাম বাহির করিয়া তাহার হাতে দিতে গেল, বিমল বলিল, চিঠি থাক্, তুমি বল।

—না, দেখুন-না!

বিমল অগত্যা চিঠিখানি পড়িতে লাগিল। পড়া শেষ হইল দেখিয়া ছায়া বলিল, পড়লেন?

—হ্যাঁ।

—এখন আমার কর্ত্তব্য কি তাই বলুন।

বিমল নীরবে বসিয়া রহিল।

ছায়া বলিল, শুনুন মিষ্টার রায়, আমার গয়না ক'খানা আজই আপনি নিয়ে যান, বেচে আজই বিলেতে টাকা 'কেব্‌ল' করতে হবে। তারপর কাল বা পরশু আমাকে আমার শ্বশুরবাড়ীতে আপনাকেই রেখে আসতে হবে। আমি আর এ বাড়ীতে থাকতে পারব না।

ঘরশুদ্ধ লোক ছায়ার পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

ছায়া বলিল, আমি আজ সকালেই আপনাকে ডেকে পাঠাতুম মিঃ রায়। ভোরে ঘুম ভেঙে উঠেই বাবার ড্রয়িংরুমে আপনার গলা শুনলুম; বাইরে এসেই দেখি আপনি চলে যাচ্ছেন। ভালই হয়েছে দেখা হয়ে গেল। এগুলো আপনি নিয়ে যান। বলিয়া ড্রয়ার খুলিয়া রেশমের রুমাল বাঁধা একটা পুঁটলী তাহার সম্মুখে রাখিল।

বিমল বলিল, তুমি ভাল ক'রে ভেবে দেখেছ ছায়া ?

—কাল সারা রাত ভেবেছি। আমার পথ আমি বেছে নিয়েছি মিঃ রায়। তিনি গরীবের ছেলে, বড়লোকের জামাই হয়ে বিলেত গেছলেন— নানা কারণে সেখানে সময় নষ্টই হয়েছে, এখন টাকার জন্যে খেতে পাচ্ছেন না, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছেন। আমার এত গয়নাগাঁটি থাকতে সে কষ্ট তিনি কেন পান ? পাস-টাসের দরকার নেই, তিনি ফিরে আসুন, আমি তাঁর দেশের সেই ভাঙ্গা ঘরে গিয়ে তাঁরই প্রতীক্ষা করব।

কথাগুলো এত দৃঢ়তার সহিত ছায়া বলিয়া গেল, কোনখানে একটা ফাঁকও রহিল না যে, কেহ কোন কথা বলিতে পারে। ঘর যেন স্তব্ধতার মাঝখানে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

—মা তাঁকে সাজা দিতে পারেন, মাসোহারা বন্ধ ক'রে না খেতে দিয়ে মারতেও পারেন ; আমি ত তা পারি নে। আমাকে তিনি ভুলেছিলেন, ভুলে যে সব কীর্ত্তি করেছেন, তাও যে আমি জানি নে, তা নয়, জানি সব। তবুও যে পারি নে তাঁকে শাস্তি দিতে—সে কথা যে ভাবতেও আমি পারি নে। আমার যে তিনি ভিন্ন আর গতি নেই !—

ছায়ার মত মেয়ে যে এইভাবে মেলোড্রামেটিক বক্তৃতা করিতে পারে তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। কথাগুলা বলিয়া রুমালে মুখটা চোখ দুইটা মুছিয়া লইল।

তারপর ইন্দুর দিকে ফিরিয়া বলিল, তোমার সঙ্গে আজ গল্প করবার সময় হবে না ভাই। আর কোন দিন হবে কি না, তা'ও জানি নে, তবে এখানে এ বাড়ীতে যে হবে না, তা ঠিক। এর পরে কোন দিন যদি বিমলবাবুকে নিয়ে আমার আপন কুঁড়ে ঘরে যাও, প্রাণ ভরে গল্প করব

ভাই। মিঃ রায়, এটা তা হ'লে আপনি নিয়ে যান—বলিয়া কোন দিকে না চাহিয়া ছায়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় বিমল ইন্দুর পানে চাহিয়া যেন তাহারই নির্দ্দেশ প্রার্থনা করিল। ছায়া যে-পথে বাহির হইয়া গিয়াছিল, ইন্দু সেইদিকে চাহিয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল।

বিমল বলিল, কি বিপদ?

ইন্দু বলিল, কিসের বিপদ?

গহনার পুঁটুলি দেখাইয়া বিমল বলিল, এই ত বিপদ! বড় লোকের মেয়ের জিনিষ, আর ঝোঁকের মাথায় বলছে বেচে দাও, তার পর—

ইন্দু বলিল, ঝোঁকের মাথায় বলে নি; তাই ওর আর 'তারপর' কিছু নেই। ছায়া তার কর্ত্তব্য বেছে নিয়েছে।

বিমল বলিল, তা হ'লে নিয়ে যাই, কি বল?

—হ্যাঁ। আজই যাতে টাকাটা বিলেত পাঠাতে পার, তাই কর।

—ছায়া আবার ঘরে ঢুকিল; চিঠিখানা সোফার উপরে পড়িয়াই ছিল, তুলিয়া লইয়া বিমলের হাতে দিল; বলিল, ঐতেই তার ঠিকানা আছে, আজই পাঠাতে পারবেন ত মিঃ রায়?

—চেষ্টা করব ছায়া।

—চেষ্টা নয়, মিঃ রায়, পাঠাতেই হবে। তিনি আজ এক মাস অনাহারে পথের কুকুরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আর আমি এখানে—বলিয়া ছায়া চোখে কাপড় দিয়া বাহির হইয়া গেল।

বিমল পুঁটুলীটি তুলিয়া লইল। দ্বারের বাহির হইতে ছায়া বলিল, কাল সকালে একবার আসতে পারবেন মিঃ রায়? আমি কালই শ্বশুরবাড়ী যাব মনে করছি।

—আসব।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

তিনজনে একসঙ্গে ফটকের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। আলি...রের ছায়াসমৃদ্ধ পথের ধারে ইন্দুদের গাড়ী ওদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ইন্দু বলিল, আমাদের সঙ্গে যাবে ত?

বিমল ইতস্ততঃ করিতেছিল।

—রাস্তায় কোথাও নেমে গেলেই ত হবে।

বিমল বলিল, তা বেশ।

কণা আগে-ভাগে উঠিয়া ড্রাইভারের পার্শ্বের স্থানটি অধিকার করিয়া বসিল; বিমল তাহাকে ভিতরে ডাকিল; কণা আড়চোখে ভ্রূকুটি করিয়া বসিয়া রহিল। ইন্দু একটুখানি হাসিয়া বলিল, কণা থাক না। তুমি ওঠ।

ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ দিকে যাব?

ইন্দু বিমলের পানে চাহিল, বিমল ইন্দুর উদ্দেশে কহিল, বাড়ী যাবে ত?

—বাড়ী ত যাব, তুমি?

—আমি রাস্তায় নেমে যাব।

—গয়নার ঐ অত বড় পুঁটুলী নিয়ে হেঁটে যাবে? না, না, তার কাজ নেই, চল তোমায় বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে যাই।

ড্রাইভারকে তদ্রূপ উপদেশ দেওয়া হইল। জনবিরল প্রশস্ত রাজপথ, গাড়ী ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে, ইন্দু বিমলের একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, কি ভাবছ?

বিমল বলিল, ছায়ার কথা ভাবছি।

—কি ভাবছ বল না?

বিমল বলিতে লাগিল, আশ্চর্য্য মেয়ে ও। ক'দিন আগেও দেখেছি, কথাবার্ত্তা শুনেও বুঝেছি, অশোকের জন্যে ও একটুও ভাবে না। স্পষ্ট বলত, বিয়েই হয়েছে মাত্র, তার জন্যে ওর একটুও টান নেই। দেখতুমও তাই। ছায়ার কাজিনরা আসত, তাদের বন্ধুরা আসত, তাদের সঙ্গে হাসি, গান, গল্প করেই ওর দিন কাটত; অশোককে একখানি চিঠি পর্য্যন্ত লিখত না! কাজিনরা কেউ নাচের আসরে নিয়ে যাচ্ছে, কেউ রাত দুপুরে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছে, দল বেঁধে সিনেমা যাচ্ছে,—কেউ 'প্রেজেণ্ট' দিচ্ছে 'সেণ্ট', কেউ দিচ্ছে শাড়ী, কেউ তুলছে ফটো, কেউ গান শেখাচ্ছে,—কেউ—বলিতে বলিতে বিমল থামিল, এক মুহূর্ত্ত পরে আবার বলিল, দেখে এক এক সময় ওদের সমাজের উপর ঘৃণা হত!

বিমল থামিল, ইন্দু সাগ্রহে তাহার মুখের পানে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া রহিল; তাহার দুই আঁখিতে সহস্র প্রশ্ন নীরবে জাগিতে লাগিল। বিমল তাহা বুঝিল, পুনশ্চ বলিতে লাগিল, সেই ছায়া আজ তার গায়ের শেষ গয়নাখানি পর্য্যন্ত খুলে দিলে, বেচে তাকেই টাকা পাঠাতে, যার

এতটুকু খবর নেবার ইচ্ছে পর্য্যন্ত কোন দিন দেখিনি। আশ্চর্য্য মেয়ে!

ইন্দুর আগ্রহের, আকুলতার অবসান তখনও হয় নাই, তখনও সেই তৃষ্ণাব্যাকুলিত দুইটি চক্ষু বিমলের মুখের পানে পাতিয়া বসিয়া আছে।

বিমল বলিল, টাকা পেতুম পড়াতুম, তা ছাড়া আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার কেউ এতটুকুও করে নি, নইলে যা সব দেখতুম তাতে ঘৃণা হয়ে যেত! ঐ যে সেই প্রণয় বাবু না কি, তোমরা ত তাঁকে ভালই চেন, এক দিন রাত একটা পর্য্যন্ত ছায়াকে নিয়ে কোথায় মাঠে ঘাটে ঘুরে এলেন, পরের দিন মাথার যন্ত্রণায় ছায়া উঠতেই পারল না, তার পর গোড়ালিঢাকা প্যাণ্ট পরা ধুম্বো-ধুম্বো কাজিনরা কেউ এসে চোখ টিপে ধরছে, কেউ মাথায় ওডিকলোন ঢালছে, কেউ শাড়ীর কোঁচকানো সোজা ক'রে দিচ্ছে—দেখতে, যে কি বিশ্রীই লাগত! এক দিন দেখি, ঘর অন্ধকার ক'রে দু' তিনটেতে মিলে ছাই পাঁশ সেবা করছে—ছায়ার মাথা ধরেছে না কি হয়েছে কে জানে! এসব ছায়ার মা জানতেন, দেখতেন, অথচ কিছুই বলতেন না, ওদের সমাজে এসব বোধ হয় দোষের নয়। ঐ সবের জন্যেই ত ছায়া অশোকের কথা ভাবতও না, তার খবরও রাখত না।

ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি করে জানলে—সে ভাবত না?

—আমি দেখতুম না রোজ?

—লোকে প্রিয়জনকে ভাবে বুঝি লোককে জানিয়ে-জানিয়ে? সাক্ষী রেখে? নোটিশ দিয়ে? না?

—তবু, দেখে বোঝা যায় না?

ইন্দু মৃদু অথচ দৃঢ় স্বরে কহিল, না, বুঝা যায় না। ক্ষণকাল

থামিয়া নতমুখে আবার বলিল, বাইরে দেখে মানুষ কতটুকু বুঝতে পারে ?

—পারে না ?

—না, পারে না।

ইন্দু একটু চুপ করিল, তার পর আস্তে আস্তে আবার বলিল, বাইরে থেকে যদি বুঝা যেত, তা হ'লে তুমিও আমায় বুঝতে ! আমায় ভুল বুঝে দেখা হলে মুখ ভার করে পালিয়ে যেতে চাইতে না।

তাহার কণ্ঠস্বর আর্দ্র বুঝিয়া বিমল, মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, আঁখি-পাতে জল টল টল করিতেছে, আর একটু হইলেই ঝরিয়া পড়িবে। বিমলের তাহাতে কষ্ট হইল। হইবারই কথা, বিমল ইন্দুকে ভালবাসিত, ভালবাসার ধনের চোখে জল দেখিলে যাহার চোখে জল না আসে, হয় সে ভালবাসে না, না-হয় তাহার ভালবাসা খাঁটি সোনা নয়, তাহাতে খাদ আছে, কৃত্রিমতা আছে।

বিমল কিছু বলিতে উদ্যত হইয়াছিল, ইন্দু তাহার আগেই বলিয়া উঠিল, এতদিন পরে তুমি আমায় ভুল বুঝলে !—বলিতে বলিতে তাহার স্বর ধরিয়া আসিল এবং যে বারিবিন্দুগুলি এতক্ষণ চোখের পাতায় জমা ছিল, তাহা এক্ষণে ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল। বর্ষার জল যেন গাছের পাতায় জমা ছিল, বাতাসে তাহা ঝরিয়া পড়িল। ইন্দু বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিল।

বিমল ইন্দুর হাত ধরিয়া করুণস্বরে বলিল, আমায় মাপ কর ইন্দু ; আমি আমার ভুল বুঝতে পারছি !

এইটুকু আদরের ভর ও ইন্দু যেন সইতে পারিল না ; তাহার বক্ষ

নিঙাড়িয়া উৎসাহাকারে অশ্রু উদ্গত হইয়া আসিতেছিল, পাছে তাহাই আবার প্রকাশ হইয়া পড়ে, সে চক্ষু মুদিয়া রহিল; ধীরে ধীরে মাথাটি কাৎ হইয়া বিমলের স্কন্ধের উপর আশ্রয় গ্রহণ করিল।

প্রকাশ্য দিবালোকে শতসহস্র যানবাহিত, লক্ষ লক্ষ নরনারী অধ্যুষিত রাজপথে, লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষু দৃষ্টির সম্মুখে এইভাবে পথ চলিতে বিমলের যেন মাথা কাটা যাইতেছিল, পথচারীদের মধ্যে পরিচিত লোকও থাকিতে পারে, তাহারা কি ভাবিতেছে, অপরিচিতরাই বা কি ভাবিতেছে, ইহা ভাবিয়া মনে মনে অতিমাত্রায় শঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত হইলেও, ঠিক এই সময়ে প্রণয়াভিমানিনী নারীকে জাগাইবার—তাহার ভাবাবেশে বাধা জন্মাইবার সাহস বা প্রবৃত্তি তাহার হইল না। সেও সকলের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য চক্ষু মুদিয়া থাকিতে পারিলে যেন বাঁচিয়া যাইত।

একটু পরে ইন্দু বিগলিত অভিমানভরে কহিল, কেন তুমি আমায় ভুল বুঝলে? কেন তুমি—সে চুপ করিল। কথাটা যেন বড় কঠিন, বড় মর্ম্মান্তিক।

বিমল বলিল, আমার সঙ্গে কোন সুন্দরী সুবেশিনী মেয়েকে ঘুরে বেড়াতে দেখলে, তুমি ভুল বুঝতে না?

ইন্দু দৃঢ়স্বরে কহিল, না, কখখন না। আর সে পরীক্ষা তু হয়েছিল হয়ে গেছে।

—কবে?

—কেন প্রণয়বাবুদের বাড়ীর থিয়েটারের দিন। তুমি ছায়াকে নিয়ে এলে, আমি ত দেখলুম।

বিমল সহাস্যে প্রশ্ন করিল, তুমি কি ভেবেছিলে ঠিক করে বল দেখি? কিন্তু বাড়ী এসে গেল যে। আর একটা মোড় ঘুরলেই—

ওদিক হইতে কণা বলিয়া উঠিল, দিদি, স্বদেশী প্রদর্শনীটা কোন্ মাঠে হবে ভাই ?

—সে ত শ্রদ্ধানন্দ পার্কে রে !

—আমি কথনও দেখি নি, চল না ভাই দেখে আসি।

বিমল হাসিয়া ইন্দুর পানে চাহিল, বিমল হাসিল, ইন্দুও হাসিল, বলিল, চল, দেখেই আসা যাক্।

ড্রাইভার, প্রভুকন্যার মনের ভাব বুঝিয়া গাড়ীর মুখ ঘুরাইয়া লইল।

বিমল বলিল, এইবার বল।

ইন্দু বলিল, প্রথমেই মনে হ'ল—সব বলব ?

—নিশ্চয় !

—মনে হ'ল, মেয়েটি আমার চেয়ে সুন্দরী, পোষাক-আষাক আমার চেয়ে অনেক ভাল, হাব-ভাবও অনেক ভাল ! তোমার কোন আত্মীয় নয়, সে ত আমি জানি ! তবে কে ? যেমন মনে হল কে, আমার মন অমনি বললে, তোমার মুখেই শুনতে পাব কে, ভেবে কি হবে ! সত্যি বলছি, এ ছাড়া আর কিছুই আমার মনে হয় নি।

এক মুহূর্ত্ত থামিয়া আবার বলিল, একথা ঠিক, গার্ভিস সাহেবের উপন্যাসের জেলাসি জাগে নি গো মশায়, একটুও জাগে নি।

—কেন জাগে নি, সেইটেই ত আশ্চর্য্যের কথা।—বলিয়া বিমল হাসিল।

ইন্দু কহিল, কেন জাগে নি তা' জানি নে, তবে জাগতেই যে হবে তার কি মানে আছে ?

—মানে জানি নে, তবে সৃষ্টির নিয়মে নরনারীর মধ্যে ঐ বৈচিত্র্য চিরদিন আছে তাই জানি।

ইন্দু হাসিয়া বলিল, তাই না কি? আচ্ছা, ছায়ার কাজিনদের ব্যবহারে তোমার জেলাসি হ'ত?

বিমল বলিল, দূর! তা কেন হবে? আমি কি তাকে ভালবাসি?

ইন্দু মুখটি নত করিল। ঐ কথাটিই সে শুনিতে চাহিতেছিল, আরও স্পষ্ট করিয়া, আরও শুদ্ধ প্রাঞ্জল ভাষায় শুনিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিতেছিল। ভালবাসার একমাত্র অধিকারিণী জানিয়াও নারী কেন যে আমরণ প্রেমাস্পদের মুখে ঐ কথাটি বারবার শুনিতে চায় ইহা এক পরম বিস্ময়।

বিমল স্বল্পভাষী। তাহার গভীর হৃদয়ে প্রসারতার অভাব না থাকিলেও কণ্ঠের বাধা তাহার অপরিসীম। কত কথাই সে বলিতে চায়, কথা কণ্ঠে আসিয়াই লয় পায়। কিন্তু আজ তাহার কণ্ঠেরও মাদকতা আসিয়াছে। নিজেই কথাটার জের টানিয়া বলিল, আমি যদি ছায়াকে ভালবাসতুম, তার কাজিনদের সঙ্গে লাঠালাঠি হ'ত; আর তা হ'লে কাজিনরাও আমাকে ছাড়ত না।—বলিয়া সে হাসিল, আবার বলিল, আমি যাকে ভালবাসি, যে শুধুই আমার, তা'কে অন্যের সঙ্গে বাদলা-রাত্রে নির্জ্জন গড়ের মাঠে বেড়াতে দেখলে আমার ভাল লাগে না, লাগতে পারে না। বুঝলে?—বলিয়া সে বাহুমূল দিয়া ইন্দুর কাঁধে একটু চাপ দিল! আবেশে ইন্দুর চক্ষু মুদিয়া আসিল!

শ্রদ্ধানন্দ পার্কও আসিয়া পড়িল। কণা বলিয়া উঠিল, এই যে সাজান আরম্ভ হয়ে গেছে। হ্যাঁ তা' হবেই ত! পরশু খুলবে না ভাই দিদি!

ড্রাইভার উদ্যানের ফটকের সম্মুখে গাড়ী থামাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, কণা বলিল, না না, থামাতে হবে না। শিয়ালদার দিক দিয়ে বিমলদা'র বাড়ী হয়ে যেতে হ'বে।

ক্ষণা বক্তব্যটা ঐখানেই শেষ করিল না, একবার এদিকে মুখ ফিরাইয়া, ইহাদের দেখিয়া লইয়া বলিল, বিমল দা, আর কোথায়ও একজিবিসন-টিবিসন হবে না, সে পার্কগুলোও দেখে নিতুম !

ইন্দু ও বিমলের চোখে চোখে কথা হইয়া গেল; ইন্দু হাসিয়া বলিল, বড্ড জ্যাঠা হইছিস তুই ক্ষণা !

ক্ষণা বিমলকে বলিল, আপনারও কি সেই মত বিমলদা ? আমি জ্যাঠাইমা হইছি ?

বিমল ঝুঁকিয়া পড়িয়া ক্ষণার পিঠে দু'টা আদরের চড় মারিয়া কহিল, না, না, না, তুমি বড় ভাল মেয়ে !

হঠাৎ একটা গির্জ্জার গম্বুজে ঘড়ি দেখিয়া বিমল মনে মনে চমকিত হইয়া বলিল, সাড়ে ন'টা বেজে গেছে যে !

ইন্দুও মুখ বাড়াইয়া ঘড়িটা দেখিয়া লইল। মন তাহারও শঙ্কিত হইল, কিন্তু মুখে বলিল, বাজুক গে ! তারপর কাণের কাছে মুখ রাখিয়া বলিল, আজ কত কাল পরে, বল ত ?

বিমলও প্রতিধ্বনির মত বলিল, কত কাল!

ইন্দু পূর্ব্ববৎ নিম্নস্বরে কহিল, কত কাল পরে তোমায় কাছে পেলুম বল ত !

বিমলদের বাড়ীর সামনে আসিয়া গাড়ী থামিতে, বিমল পুঁটলী লইয়া নামিয়া দাঁড়াইতে ইন্দু বলিল, ভিতরে গিয়ে একটু বসবার কি যে ইচ্ছে করছে তা বলবার নয়। কিন্তু অনেক বেলা হয়ে গেছে, আজ আর নামব না। কিন্তু আবার ক'বে দেখা হবে বল ?

—তুমি বল।

ইন্দু হতাশ কণ্ঠে কহিল, কোথায়ই বা হবে ?

ক্ষণা অন্য দিকে মুখ করিয়া অন্যমনস্কভাবে বসিয়াছিল, এক্ষণে কহিল, দিদি, ছায়া-দি'র নতুন বাড়ীতে যাবি বলিছিস্ না ?

উভয়ের অধরেই হাসি ফুটিয়া উঠিল। ইন্দু বলিল, ছায়ার শ্বশুরবাড়ী যেতে পারি ত আমরা ?

—তা বোধ হয় পার। কাল পরশু ত আমি যাচ্ছি, সব দেখে আসি। এসে খবর দেব।

—দেবে ?

—দোব।

—কিন্তু কি ক'রে দেবে ? তুমি ত চিঠি লিখবে না প্রতিজ্ঞা করেছ।

বিমল হাসিয়া বলিল, আমি ভীষ্মদেব নই, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারি।

ইন্দু বলিল, তোমার পায়ে পড়ি, তাই ক'রো।

ক্ষণা দ্বার খুলিয়া এদিকে আসিয়া দিদির পার্শ্বে বসিতে বসিতে নিম্ন-কণ্ঠে বিমলকে শুনাইয়া বলিল, আর দাঁড়িয়ে কেন মশাই, বেলা যে পড়ে এল, ভাল মানুষ মেয়ে দু'টি বাড়ী ফিরবে না ?

বিমল স্নেহভরে ক্ষণার গলাটি জড়াইয়া ধরিয়া পরমুহূর্তে চলিয়া গেল।



বিংশ পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদটিকে চার খণ্ডে বিভক্ত করিয়া লইতে হইবে। প্রথম খণ্ড—প্রভাত, দ্বিতীয় খণ্ড—মধ্যাহ্ন, তৃতীয় খণ্ড—অপরাহ্ন, চতুর্থ খণ্ড—রাত্রি।

প্রথম খণ্ড—প্রভাত

গাড়ী বাড়ীর যত কাছে আসিতেছে, যে মায়াজালখানি আজ সারা সকাল ধরিয়া রচিত হইয়া, তাহারই মধ্যে মাকড়সার মত ইন্দুকে আবদ্ধ আচ্ছন্ন রাখিয়াছিল, তাহা ততই ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইতেছে। বেলা দশটা বাজে, ফুলবাগানখানি রৌদ্রের মধ্যে দাঁড়াইয়া যেন কাঁপিতেছে। লাল কঙ্করাবৃত পথ হইতে, গাছপালার শীর্ষ হইতে, সর্ব্বত্রই যেন একটা কম্পমান শিখা উঠিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে রৌদ্রে মিশিয়া যাইতেছে। বাগানের মালীরা মাথায় গামছা জড়াইয়া এধার-ওধার যাওয়া-আসা করিতেছে, দারোয়ান তাহার খাটের উপর ভুঁড়ি কাৎ করিয়া শুইয়া পড়িয়া আছে, গাড়ী ফটকে প্রবেশ করিতেই সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। প্রথামত দরোয়ান ছুটিয়া আসিয়া গাড়ীর দ্বার খুলিয়া দিল।

—বাবু কাঁহা দরোয়ান?

—হুজুর ত বহার গয়া দিদিমণি।

দুই বোনে নীরব ভাষায় যে কথাটি কহিল, তাহা এই যে, বাবাকে হয় ত ট্যাক্সি করিয়া বাহির হইতে হইয়াছে।

রুপা তাহার 'পেটেণ্টেড' ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা করিল, বাবু ট্যাক্সিমে গিয়েছেন ত্যায়?

দরোয়ান বলিল, জী ! অর্থাৎ হ্যাঁ ।

মা ঠিক সিঁড়ির মুখেই দাঁড়াইয়া ছিলেন—মুখে আষাঢ়ের আকাশ নামিয়াছে। ইন্দু আগে, ক্ষণা পিছনে উঠিতেছিল, মা ইন্দুকে কিছু বলিলেন না, যেন দেখিলেন না, ক্ষণার ঘাড়টা ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া পুরুষকণ্ঠে কহিলেন, কোন্ চুলোয় গেছলে শুনি? ভোর বেলা না খাওয়া, না পড়া—কোথায় গেছলি এগারটা পর্য্যন্ত ?

ক্ষণা বোধ হয় প্রস্তুত ছিল, সপ্রতিভ ভাবে কহিল, কোনও চুলোয় নয় মা, বেড়াতে গেছলুম ।

মা অধিকতর রুষ্ট হইয়া বলিলেন, কোথায়, কোন্ চুলোয়, কোন্ মেসোপিসের বাড়ী গেছলি আড্ডা দিতে, তাই শুনতে চাই ।

—চিনতে পারবে না বোধ হয়, আমরা ছায়া-দি'র বাড়ী গেছলুম ।

মা বুঝিলেন। চোখ দুইটা ঘুরিতে ঘুরিতে ইন্দুর উপরেও পড়িল। বলিলেন, বড্ড আস্পর্দ্ধা বেড়েছে তোমাদের, স্বাধীন জেনানা হয়েছ। কাউকে বলা নেই, কওয়া নেই, গাড়ী নিয়ে যেখানে খুসী গেলেই হ'ল, না ?

ক্ষণা উত্তর দিবার জন্য হাঁ করিয়াছিল, মা পুনরায় বলিলেন, আপিসের কাজ, দশ জায়গায় ঘুরতে হবে, আর গাড়ী নিয়ে ওঁরা গেলেন আড্ডা দিয়ে বেড়াতে, আর ট্যাক্সি নিয়ে কাজে বেরুতে হ'ল ।

ক্ষণা বলিল, তার জন্যে তুমি অত ভাবছ কেন মা, দশ বিশ টাকা খরচ করতে আমার বাবার কষ্ট হয় না। আমার বাবা পয়সা রোজগার করতেও ডরান না, খরচ করতেও ডরান না, খরচ করতেও পেছোন না।—

বলিয়াই সে দ্রুতপদে—এক রকম দৌড়িয়াই চলিয়া গেল। ইন্দু ধীরে ধীরে ক্ষণার অনুসরণ করিয়া চলিল।

মা আর কিছু বলিলেন না বটে; কিন্তু বয়স্ক সন্তানদের বশেও যখন আনা যায় না, শাস্তিও যখন দেওয়া চলে না, সেই সময়কার যে ভীষণ মনোভাব, সেই পর্ব্বতপ্রমাণ অবরুদ্ধ বহ্নি লইয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ঘরে ঢুকিয়া ক্ষণা দ্বার বন্ধ করিয়া, খিল দিয়া, দিদির সম্মুখে আসিয়া বলিল, কেমন বলিছি, দিদি?

ইন্দু বলিল, বেশ বলেছিস্। আজ সিল্কের স্কার্ফ বুনে তোকে উপহার দেব।

দু'জনে অনেকক্ষণ ধরিয়া হাসিল, গল্প করিল, তারপর স্নানাহারের সময় হইয়াছে বুঝিয়া স্নান-কক্ষে ঢুকিয়া পড়িল।

দ্বিতীয় খণ্ড—মধ্যাহ্ন

বাড়ীর কর্ত্তা আহারে বসিয়াছেন। কর্ত্তার মস্ত ভুঁড়ি, মস্ত আসন, মস্ত থালা, মস্ত গেলাস, অনেকগুলা বাটী, ছোট, নঁ', সেজ, মাঝারি, বড়, অনেকগুলা রেকাবি—কোনটায় ফল, কোনটায় মিষ্টান্ন, কোনটায় ভাজা-ভুজি।

সামনে পাখা হাতে গৃহিণী। পাখা হাতেই আছে, বড় নড়িতেছে না; নড়ার দরকারও বড় নাই, কারণ মাথার উপরে বিদ্যুৎ-পাখা ঘুরিতেছে।

কর্ত্তার দুই দিকে, প্রায় আধ হাত করিয়া দূরে দুই কন্যা উপবিষ্টা।

কর্ত্তা কখনও কাহারও হাতে একখানি বেগুনি, কাহারও হাতে খানিক পাঁপর, কাহারও হাতে একটু মাছ বা একটু মাংসের টুকরা তুলিয়া দিতেছেন, হিন্দুরা যে ভাবে দেব-মন্দিরের প্রসাদ 'ধারণ' করে, মেয়ে দু'টি ঠিক সেই ভাবে পিতার দান গ্রহণ করিতেছে।

কর্ত্তার দুই জানু প্রায় স্পর্শ করিয়া দুইটি হৃষ্টকায় মার্জ্জার বসিয়া আছে। কর্ত্তা মাছের কাঁটা, মাংসের হাড়, কতক এ পাশে, কতক ও পাশে রাখিতেছেন, মেয়ে দু'টিও তাহাই করিতেছে। মার্জ্জার দুইটি বোধ হয় নিদ্রামগ্ন। চক্ষু চতুষ্টয় মুদ্রিত, দেহ নিঃসাড়, নিস্পন্দ। নিদ্রামগ্ন যদিও নাও হয়, তাহারা ভাবমগ্ন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এমন একখানি সুখ-নীড় দেখিলে কাহার না নয়ন মুদিয়া ভাবাবেশ হয় গা?

কর্ত্তাটি আমাদের হেরম্ব বাবু। দৃশ্যস্থিত অন্যান্য কুশীলবগণের পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন। তবে মার্জ্জারদ্বয়ের সম্বন্ধে দু'টি কথা বলার প্রয়োজন আছে। তাহারা চিরদিন এমন শান্ত শিষ্ট সভ্য ভব্য ও ভাবপ্রবণ ছিল না, আহারের মাঝে মাঝে কাঁটাটা-আসটার জন্য মুখ বা মুলো যে না বাড়াইত, এমন নহে, ক্ষণা তাহাদের গার্জ্জেন টিউটর হওয়ার পর হইতে তাহাদের অসম্ভব পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ক্ষণা শিখাইয়াছে, বাবার খাওয়া হইয়া গেলে, মা প্রসাদ পাইবার পরে তাহারা যা খুসী করিতে পারে, তৎপূর্ব্বে বেয়াদপি করিলে তাহাদের পৃষ্ঠের রোম, ছাল, মাংস কিছুই থাকিবে না, এই বুঝিয়া তাহারা যেন কাজ করে। তাহারা অবুঝ নয়, বুঝিয়াছে ও তদনুসারে কার্য্য করিতেছে। ক্ষণা তাহাদের বলিয়াছিল, দেখ, তোমাদের দৃষ্টি ভাল নয়, লোকে যখন খাইবে, তখন তোমরা বাপু, সেদিকে দৃষ্টি দিও না। এটা নিশ্চিত জানিও যে, লোকে যাহাই থাক্

আর যতই থাক্, তোমাদের প্রাপ্য হইতে কেহ তোমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। সুতরাং একটু ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিতে দোষ কি! তাঁহারাও ইদানীং এমনই গুড চিলড্রেন হইয়াছে যে, একদিনও একটু এদিক ওদিক করে না।

কর্ত্তার খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে বুঝিয়া ঠাকুর ও চাকর যাহারা আদেশ-প্রতীক্ষায় এতক্ষণ দ্বারপার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল, তাহারা নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

সেই ঘরেই একখানি ইজি-চেয়ার থাকিত, দুই পার্শ্বে দুইখানি চেয়ার ও একটি মার্ব্বেল পাথরের টিপয় থাকিত। আচমনান্তে কর্ত্তা আসিয়া ইজি চেয়ারে শুইলেন, কন্যাদ্বয় দুই পার্শ্বে দুই চেয়ার দখল করিল; কেহ পাকা চুল বাছিতে মন দিল, কেহ পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল; টিপয়ের উপর পাণের [illegible]ড়িকা ও জলের গ্লাস বসিল; ভৃত্য সাগ্নিক কলিকাশোভিত রূপার আলবোলাটি দূরে বসাইয়া নলটি কর্ত্তার ইজি-চেয়ারের আঙটায় আট্‌কাইয়া দিয়া গেল; গৃহিণী ভোজনে বসিলেন; মার্জ্জারদ্বয় নয়ন মেলিয়া পরিবর্ত্তনাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিল।

যেদিন আপিসে বাহির হইতে হইত না এবং অসময়ে 'তাস পাশা পাঁচালী'র আড্ডা বসিত না এবং বাহিরে বাঈ নাচ বা যাত্রার আসরের আকর্ষণ থাকিত না, সেদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর আসর ঐরূপ ভাবে জমিত এবং আসরের শেষাংশে কন্যাদের সেবাসন্তুষ্ট পিতা গল্প করিতে করিতে ইজি-চেয়ারেই ঘুমাইয়া পড়িতেন। আজ আপিসে যাইবেন না। সামান্য যা ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ ছিল, তাস-সঙ্গী মহেন্দ্রের ঘাড়ে চাপাইয়া

দিয়া আসিয়াছেন, সেই কথাটাই আলবোলা টানিতে টানিতে বলিলেন।

ক্ষণা সুযোগ খুঁজিতেছিল, বলিল, বাবা কত টাকা ট্যাক্সি ভাড়া লাগল আজ ?

—মহেন্দ্রের বাড়ী পর্য্যন্ত, কত আর, দেড় টাকা বুঝি ! তারপর ত মহেন্দ্রের গাড়ীতেই ঘুরলুম, সেই ত বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে গেল।

ক্ষণা বলিল, মা ত ভেবেই অজ্ঞান, না জানি কত-কত টাকা তোমার আজ ট্যাক্সিতে খরচ হয়ে গেল।

পিতা বলিলেন, গুরুতর ভাবনারই কথা বটে !

কথাটা স্পষ্ট হইল না—বোধ হয় অর্থও নির্ণীত হইল না। পাছে কেহ স্পষ্ট অর্থ করিয়া লইতে চায়, তিনি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু মা-লক্ষ্মীরা সকাল বেলা কোথায় ঘুরে এলে বলত ?

ইন্দু বলিল, বেশ স্পষ্ট মধুর কণ্ঠে কহিল, আলিপুরের সেই জজ-সাহেবের বাড়ী গেছলুম বাবা। সেই যে আর এক দিন তোমাতে আমাতে যাব বলে বেরিয়ে ঠিকানা পেলুম না, ফিরে এলুম।

এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া পিতা বলিলেন, দেখা হল ? জজ-সাহেব কি বললেন ? ছ'মাস ফাঁসী না, এক সেকেণ্ড জেল ?

ক্ষণা হাসিয়া বলিল, আমরা বুঝি জজ-সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেছলুম ?

—ও, তাঁর সঙ্গে নয় ? তবে ?

—জজ-সাহেবের মেয়ে ছায়া দি'র সঙ্গে দেখা করতে।

পিতা গম্ভীর পরিহাস কণ্ঠে কহিলেন, তারপর ছায়া-দিদি কি বললেন ?

ক্ষণা বলিল, ছায়া দি' শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছেন, সেইখানে আমাদের যেতে বলেছেন। আমরা এক দিন যাব, কেমন বাবা?

—এই নতুন দিদিটির শ্বশুরবাড়ীটি কোথায় ক্ষণুরাণী?

জায়গার নাম জানা ছিল না, ক্ষণা দিদির পানে বিভ্রান্ত ভাবে চাহিতে লাগিল।

ইন্দু বলিল, জান বাবা, ছায়ার স্বামী বিলেতে পড়ছিলেন, ছায়ার মা তাঁর খরচ বন্ধ করে দিতে সেখানে তাঁর খুব কষ্ট হয়েছে, তিনি ছায়াকে চিঠি লিখেছেন। ছায়া বাপ মাকে না বলে তার সমস্ত গয়না বেচে বিলেতে স্বামীকে টাকা পাঠিয়েছে।

পিতা আলবোলার মুখনলটি সরাইয়া প্রশংসমান দৃষ্টিতে কন্যার পানে চাহিয়া রহিলেন।

ইন্দু বলিতে লাগিল, ছায়া তার বাপের বাড়ীতেও থাকবে না বাবা। তার শ্বশুর খুব গরীব, কোন অজ পাড়াগাঁয়ে তাঁদের বাড়ী. ছায়া অত বড় লোক, বিলেতফেরত জজ-সাহেবের মেয়ে ত, তবু কালই চলে যাচ্ছে সেখানে; এখানে আর আসবেও না।

কথাগুলি বলিতে ইন্দু যে বিশেষ গর্ব্ব বোধ করিতেছে তাহা তাহার দৃপ্ত কণ্ঠের স্বরেই সুপ্রকাশ। কথা বলিতেছে এমন ভাবে, যেন সে কত কাল হইতে সেই ছায়াকে, তাহার পিতামাতা, শ্বশুরশাশুড়ী, তাঁহাদের ঘরসংসার সমস্ত জানে। সেই একদিনের, একবেলার দেখা নারীটির উজ্জ্বল ত্যাগের মহিমায় পরম গৌরব অনুভব করিতে তাহার আনন্দ হইতেছে।

মা এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন, এতক্ষণে কথা কহিলেন। গলার স্বর

বেশ খানিক বাঁকা করিয়া বলিলেন, ও-ও একরকম বিলাতী ঢং আর কি! বাপ মার সঙ্গে বনল না, মেয়ে এক-বস্ত্রে চললেন—

ইন্দুর মনখানি তখনও ছায়ার গৌরবে গৌরবদীপ্ত ছিল, মধুর দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, তোমাদের রামায়ণ মহাভারতের সীতা দময়ন্তীও ত অমনি একবস্ত্রে গেছলেন মা, সেও কি বিলিতি ঢং?

মা বলিলেন, তাঁরা হলেন দেবতা! তাঁদের সঙ্গে কার কথা!

ইন্দু হাসিয়া বলিল, তা হলে তোমার মতে দেবতা আর বিলাতী সাহেব এক, না মা?

—তারা সাহেব!

—দেবতাদের দোষ নেই, সাহেবদেরও দোষ নেই, যত দোষ কি এই মানুষের বেলা!

ক্ষণা নিবিষ্ট মনে পিতার কেশাবরল মস্তকে পাকা চুল খুঁজিতে খুঁজিতে বলিল—

দেবতার বেলা লীলে খেলা
পাপ লিখেছে মানুষের বেলা

মা আসন ত্যাগ করিয়া উঠিতে উঠিতে বলিলেন, থাম্ পাকা মেয়ে বই-খাতা নিয়ে আয় ক্ষণা, দেখি কদিন কি করিছিস্!

মা মুখ হাত ধুইতে বাহিরে গেলেন, মার্জ্জারদ্বয় পরিত্যক্ত পাতের দুই দিক হইতে আক্রমণ করিল। ক্ষণা নিঃশব্দে কক্ষান্তরে ঢুকিয়া অকাতরে 'ঘুমাইয়া' পড়িল।

তৃতীয় খণ্ড—অপরাহ্ণ

বাঙালীর ছেলে বাঙালীকে কোন্ পোষাকে মানায় ভাল বল ত? আমি অনেক শ্রীমান, কান্তিমান, সুদর্শন বাঙালীর ছেলেকে ফেরঙ্গ পোষাকে দেখিয়াছি, মনে মনে কখনও যে তাহাদের পোষাকের প্রশংসাও না করিয়াছি এমন নহে; আবার তাহাদিগকে বাঙ্গালীর ধুতি-চাদর-পাঞ্জাবী-পরিশোভিত দেখিয়া বারম্বার বলিয়াছি, ইহারা অন্য পোষাক পরে কেন? বাঙালীর ছেলেকে বাঙালী পোষাকে যেমন মানায়, এমনটি যে আর কিছুতেই মানায় না একথা তাহারা বুঝে না কেন?

প্রণয়কুমার সাহেবী পোষাক ছাড়া পরিতেন না। তিনি সুশ্রী, কান্তিমান, প্রিয়দর্শন, কিন্তু আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা সাহেবীয়ানার মধ্যে তাঁহার কমনীয়তাটুকু ফুটিতে পাইত বলিয়া কোন্ দিনই মনে হয় নাই। আজ তাহাকে ধুতি-পাঞ্জাবী চাদরে দেখিয়া মনে হইল, বাঙালী জাতিটার স্বাস্থ্য নাই সত্য, কিন্তু শোভা-সৌন্দর্য্যের অভাব এ জাতির এখনও হয় নাই।

ইন্দুর মনটি আজ যেন মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত বাতাসে ভর করিয়া বেড়াইতেছিল, খুব সহজেই সে প্রণয়কুমারকে অভ্যর্থনা করিয়া বাগানের বেঞ্চেই বসাইল। বাগানে আজ ফুলের কতকগুলি কচি চারা বসান হইতেছিল, মালীরা গাছ বসাইতেছিল, ইন্দু তদারক করিতেছিল, এমন সময় প্রণয়কুমারের শুভাগমন।

চাকরকে ডাকিয়া চায়ের ফরমাস করিয়া ইন্দু বলিল; গাছ ক'টা বসান হয়ে যাক্, আপনি ততক্ষণ এখানেই বসুন, তারপর উপরে গিয়ে চা খাবেন, কেমন?

প্রণয়কুমার বলিলেন, বেশ ত! কিন্তু তুমি একটি ঝারি নিয়ে আলবালে জল-সিঞ্চন কর, দেখে আমিও আবৃত্তি করি—

ইন্দু হাসিয়া বলিল, দুঃখের বিষয় এই হবে যে, এটা কণ্ব মুণির আশ্রমও নয়, পিতা কণ্ব প্রবাসবাসীও ন'ন্। তিনি আজ গৃহবাসী আর আমিও দুষ্মন্ত-প্রার্থিত শকুন্তলা নই। আপনার শ্লোক-আবৃত্তি নিষ্ফল হবে।

কথাগুলার মধ্যে আর যাহাই থাক্, উত্তাপ ছিল না, অবজ্ঞা ছিল না, অবহেলাও ছিল না। কিন্তু প্রণয়-প্রত্যাখ্যানের যে গূঢ় ইঙ্গিতটি ছিল, প্রণয়কুমার তাহা অনুধাবন করিতে পারিলেন না। বলিলেন, সেকালের কণ্বমুণির আশ্রম ত দেখ্‌ছি নে ইন্দু, আমি দেখছি—

—বেশ ত, দেখুন। আপাততঃ আমাকেও দেখতে হচ্ছে, মালীটা সারটা বেঁকিয়ে ফেলছে। ওরে পুণ্ডরীক, ও কি করলি—বলিতে বলিতে ইন্দু চলিয়া গেল।

দৃশ্য রম্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। অপরাহ্নের স্বর্ণরশ্মি যদি কোন তরুণীর অজ্ঞাতে তাহার মুখের উপরে আসিয়া স্থায়িত্ব লাভ করে, সেই তরুণী যদি আবার সুন্দরী হয় এবং তাহার বসনভূষণে অস্বাভাবিক চাপ বা গুরুত্ব না থাকে, তাহা হইলে যুবচিত্তে যে দোলা লাগে, তাহাকে ঠেকাইয়া রাখে কে? প্রণয়কুমারকে দোষ দেওয়া যায় কি? প্রণয়কুমার বেঞ্চি ছাড়িয়া উঠিলেন। যেখানে বসিয়া ইন্দু মালীকে দড়ি ধরিয়া সারির সরল রেখা বুঝাইতেছিল, সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ইন্দুর বস্ত্রাঞ্চল ধূলায় লুটাইতেছিল,—বাগানে কাজ করিতে গেলে অমন কত ধূলাকাদা লাগে—প্রণয়কুমার তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চলখানি তুলিয়া ধরিতেই ইন্দু দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, চলুন, এতক্ষণে চা হয়ে গেছে।

—চায়ের জন্তে আমার তাড়া নেই, ইন্দু।

—চায়ের কিন্তু ঠাণ্ডা হবার তাড়া আছে।

তাহারা যখন দ্বিতলের সিঁড়ি উঠিতেছিল, ক্ষণার অঙ্কের খাতা হইতে মুখ তুলিয়া মা একবার ইহাদের দেখিয়া লইলেন মাত্র। আবার ক্ষণাকে সহজ ত্রিগুণাঙ্ক শিখাইতে মনঃসংযোগ করিলেন।

চায়ের পেয়ালায় চামচ নাড়িতে নাড়িতে প্রণয় বলিলেন, আজ "কিশোরী"র ড্রেস-রিহার্সাল।

ইন্দু নিঃশব্দ।

—দেখতে যাবে ত?

ইন্দু স্পষ্টস্বরে কহিল, না।

প্রণয়কুমার বিস্ময়াভিভূতের মত কহিলেন, যাবে না? কেন?

—এমনই; কোন কারণ নেই।

—কারণ যখন নেই, বারণও যখন নেই, তখন যাবে না কেন?

—অকারণেও ত অনেক কাজ হয়।—গম্ভীরভাবে কথা কয়টি বলিয়া ইন্দু নীচের বাগানের দিকে চাহিয়া রহিল।

—কিন্তু তোমারি সঙ্গে যে অনেকগুলো দরকারী কথা ছিল। তোমার সেই কি-বলে-তার চাকরীর কথা।

ইন্দু কথা বলিল না।

প্রণয় বলিতে লাগিলেন, সে সব কথা অবশ্য এখানে বসেও যে হতে পারে না, তা নয়; কিন্তু বদ্ধ জায়গায় বসে ভাল করে কথা বলতে আমার ভাল লাগে না। রিহার্সালে না যাও, নাই গেলে, চল খানিকটা বেড়িয়ে আসি।

ইন্দু বলিল, না।

প্রণয় বলিলেন, গেলে কিন্তু খুব ভাল হ'ত। তার—অর্থাৎ তোমার কি-বলে তার কাজের সব ঠিক করে ফেলেছি প্রায়. চল-না ঘুরে আসি একটু, সব বলব'খন।

ইন্দু পুনশ্চ কহিল, না।

প্রণয় খানিকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন।

তারপর বলিলেন—যাবে না ত?—তাঁহার কণ্ঠস্বর যেন দুঃখে গদগদ।

ইন্দুর সেই উত্তর—না।

প্রণয়কুমার অর্দ্ধসমাপ্ত পেয়ালাটি ঠেলিয়া সরাইয়া রাখিয়া আবার বলিলেন—যাবে না?

এইবার লইয়া পাঁচবার; ইন্দু বলিল, না।

প্রণয়কুমার অভিমানক্ষুণ্ণ কণ্ঠে কহিলেন, কেন যাবে না সেটা কি জানতে পারি না ইন্দু? না, তাও বলবে না?

ইন্দু বলিল, আমি ত বলেছি, কোন কারণ নেই।

বাড়ীর কেউ কি—

—আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, প্রণয়বাবু।

প্রণয়-অভিমানী প্রণয়ীসুলভ কণ্ঠে কহিলেন, তবে যাবে না কেন বল? তার মানে কি এত দিন পরে এই বুঝব আমি যে, ইউ ডোণ্ট লাইক্ মি? (তুমি আমায় পছন্দ কর না?)

ইন্দু কথা কহিল না। পাশের ঘর হইতে ক্ষণার পড়ার শব্দ আসিতেছিল, ইন্দু কাণ পাতিয়া যেন তাহাই শুনিতে লাগিল।

প্রণয়কুমার উদ্বেলিত অভিমানভরে কহিলেন, কিন্তু আমি যে তোমাকে—

ইন্দু উঠিয়া দাঁড়াইল; করজোড়ে ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া বলিল, মাপ করবেন; বাগানে আমার কাজ বাকী আছে।—বলিয়া ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া সে নীচে নামিয়া গেল।

প্রণয়কুমার দুই এক মিনিট মূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন; তারপর চাদরটি গুছাইয়া ছড়িটি লইয়া নীচে নামিতেছেন, ক্ষণা বই হাতে জানলার ধারে আসিয়া জিজ্ঞাসিল, পি আর ই ওয়াই—প্রে মানে কি প্রণয়বাবু?

প্রণয়কুমার দাঁড়াইয়া পড়িলেন; চক্ষুদ্বয় হইতে অনল ধাবিত হইতে লাগিল।

ক্ষণা আড়চোখে এক দৃষ্টিতে দেখিয়া লইল, বইয়ের পাতাটি খুলিয়া আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—এই দেখুন, বাঘের গল্প—He is in search of a new prey মানে কি প্রণয়বাবু?

খুব তৈরী হয়েছ দেখছি জ্যেঠা মেয়ে!—বলিয়া ক্ষণাকে প্রায় ভস্ম করিয়া দিয়া প্রণয়কুমার অদৃশ্য হইলেন।

চতুর্থ খণ্ড—রাত্রি

রাত্রে কর্ত্তা-গৃহিণীতে আলাপ হইতেছিল।

গৃহিণী। ছায়ার গল্প ত শুনলে। কি বুঝলে বল দিকিন?

কর্ত্তার তন্দ্রাবেশ হইতেছিল, কহিলেন, বড় ভাল মেয়ে!

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, তুমি থাম, গুণ ব্যাখ্যানা শুনতে কে চেয়েছে?

চট করিয়া তন্দ্রা ছুটিয়া গেল ; কর্ত্তা বলিলেন, কি বলছ ?

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, মেয়ের কথা কি ভাবছ ?

—তাই ত !

—মেয়েটা অধঃপাতে যাবে, বাপ হয়ে বসে বসে তাই দেখবে ?

কর্ত্তা শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন, ওকে বলি, কি বল ?

গৃহিণী চিন্তিতভাবে কহিলেন, বলে' কি বালীগঞ্জের লেকের জলে সেই কাণ্ড করাবে ? যে দিনকাল, মা-বাপের কড়া কথা মেয়েরা বরদাস্ত করে ?

কর্ত্তা নীরব।

গৃহিণী বলিলেন, একটা উপায় যা-হয় কর গো, নইলে সেই হা-ভাতে হা-ঘরে ছোঁড়াটা আমার মেয়ের মাথা খাবে। বুঝলে না, মেয়ে ভোরের রাত্রে কাউকে না বলে' তারই উদ্দেশে ছুটল, ও ছায়া-টায়া সব বাজে।

কর্ত্তা তথাপি নীরব। গৃহিণী উষ্ণ হইয়া উঠিলেন, অন্ধকারে স্বীয় ললাটে করাঘাত করিয়া বলিলেন, তুমি চুপ ক'রে আছ কেমন ক'রে গো, আমার যে মাথামুড় খুঁড়তে ইচ্ছে করছে। তবুও চুপ করে রইলে, হ্যাগা ? সব দায় কি একা আমারই, সব ভাবনা কি একা আমিই ভাবব ? তুমি কি ওদের বাপ নও, তোমার কি কোন কাজ নেই ! মাগো, আমি কি করি গো ?

যেন এই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ ঠিক এই সময়ে কর্ত্তার নাসিকা গর্জ্জন করিয়া উঠিল। গৃহিণী বিছানায় আছাড়িয়া পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।



একবিংশ পরিচ্ছেদ

চায়ের পেয়ালায় ঝড় উঠিয়াছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যের ধর্ম্মাধিকরণের আইনজ্ঞানের অভাব আছে, ইহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইতেই যত বিরোধ। ব্যাপারটা খোলসা করিয়া বলিতেছি।

মিসেস ঘোষ বলেন, সে বিয়ে বিয়েই নয়, আমি আবার আমার মেয়ের বিয়ে দোব।

জজ-সাহেব মিষ্টার ঘোষ বলেন, সে হয় না, হবার নয়। হিন্দু পুরুষ যত বার খুশী, বিয়ে করতে পারে, কিন্তু হিন্দুর মেয়ে এক স্বামী বেঁচে থাকতে কোন অবস্থাতেই আবার বিয়ে করতে পারে না।

—পুরুষে যা পারে, মেয়েরা তা পারবে না কেন?

—কেন, তা বলা শক্ত; তবে একটা কারণ এই যে আইন পুরুষদের স্বাধীনতা দিয়েছে, মেয়েদের তা দেয় নি।

—সাহেবদের পুরুষরা এক স্ত্রী বর্ত্তমানে আবার বিয়ে করে ডাইভোর্স করে, মেয়েরাও তাই করে। হিন্দু আইনে ডাইভোর্স নেই কেন?

—যাঁরা আইন তৈরী করেছিলেন, তাঁদের জিজ্ঞেস করতে পার।

—আইন বদলান দরকার। তোমরা আছ কি করতে? এই সব বুনো আইন ঘাঁটতে তোমাদের লজ্জা হয় না?

জজ-সাহেব হাসিয়া বলিলেন, আমরা লজ্জাহীন হয়েই কাটিয়ে গেলাম; কিন্তু বেশী দেরী নেই তরু, (তাঁহার স্ত্রীর নাম তরুলতা) হয়ে এল বলে। হিন্দু সমাজে যাতে ডাইভোর্স চলে, তার চেষ্টা হচ্ছে। আইন-সভায় আইন পেশ হল বলে। সে আইন পাস হলে হিন্দু পুরুষও এক স্ত্রীকে ত্যাগ

করে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে, হিন্দু স্ত্রীও স্বামী ছেড়ে পত্যন্তর চেখে বেড়াতে পারবে।

জজ-পত্নী তরুলতা উল্লাসভরে কহিলেন, তাই হওয়াই উচিত। এই দেখ না, কার সঙ্গে ছায়ার একরাত্রের একটা মালা-বদল হয়ে গেছে, সে বিলেতে যা খুশী করুক, যত রোগই নিয়ে আসুক, ছায়াকে বাধ্য হয়ে সেই পাষণ্ডের স্ত্রী হয়ে থাকতে হবে।

জজ-সাহেব বলিলেন, হিন্দু আইন যখন তৈরী হয়েছিল, তখন এ সমস্যা জাগবার সম্ভাবনা ছিল না। তখন পতিকে পত্নীরা দেবতা জ্ঞান করতেন, দেবদর্শন যেমন কোন দিনই সুলভ নয়, পতিদেবতাদর্শন সুদুর্লভ হলেও পত্নীরা তাঁদের ধ্যান করে পূজো করেই জীবন কাটিয়ে দিতে পারতেন; পত্যন্তর গ্রহণের কল্পনাও জাগত না তাঁদের মনে। আবার এক জন স্বামী দশটি স্ত্রী গ্রহণ করলেও স্ত্রীরা রাগ করে ডাইভোর্স-আদালতের শরণ নিতেন না। বলিয়া জজ সাহেব একটি কৃত্রিম নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, হায় রে সেকাল।

শয়নকক্ষে বসিয়াই এই সব আলোচনা হইতেছিল, তখনও প্রভাতের রৌদ্র কড়া হয় নাই, এইবার মুখহাত ধুইয়া খানাকামরায় প্রবেশনান্তর ছোট হাজরী খাইবার কথা।

ছায়া কক্ষের বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিল, বাবা, আমি আসব?

—আয় রে!—বলিয়া জজ-সাহেব রাত্রিবসনের উপর কিমনোটি জড়াইয়া উঠিয়া বসিলেন।

ধীরমন্থরপদবিক্ষেপে ছায়া ঘরে ঢুকিল। তাহার বেশভূষা দেখিয়া পিতামাতার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। মিলের লাল পাড় একখানি শাড়ী,

পায়ে জুতা নাই, তার বদলে পুরু করিয়া আল্‌তা পরা, কপালে সিঁদুরের প্রকাণ্ড একটি আধলা টিপ, বামহস্তের মণিবন্ধে সোনাবাঁধা লোহা গাছি ছাড়া দেহে স্বর্ণের চিহ্নটুকুও নাই।

বিস্ময়ের ঘোর কাটিলে মিষ্টার ঘোষ জিজ্ঞাসা করিলেন, এ যোগিনী বেশ কেন ছায়া? প্রণয় মামার থিয়েটারে পার্ট নিইছিস্ নাকি রে? স্ত্রীর পানে চাহিয়া বলিলেন, বেশ দেখাচ্ছে ছায়াকে. না ?

মিসেস ঘোষ সে কথার কোন উত্তর না দিয়া, কন্যাকে ইংরাজীতে প্রশ্ন করিলেন, হোয়াট ইজ দিস ন্যুইসেন্স ছায়া? (এ সব নোংরামী কি?)

ছায়া নতমুখে, নম্রকণ্ঠে বাঙ্গলায় কহিল. মা, আজ সুপ্রভাতে আমি তোমাদের প্রণাম করতে এসেছি।

—ডোণ্ট বি সিলি (বাজে ব'ক না)। হোয়াট ডু ইউ মিন? (তুমি কি বলতে চাও?)

—মা, তোমাদের প্রণাম করে আমি এখান থেকে চলে যাব।

পিতা লাফাইয়া উঠিলেন, চলে যাবি? কোথায় রে?

ছায়া কহিল, আমার শ্বশুরবাড়ীতে বাবা।

মিসেস ঘোষ তিক্ত কটু কণ্ঠে কহিলেন, শ্বশুরবাড়ী! তোমার শ্বশুর বাড়ী? কোথায় তোমার শ্বশুরবাড়ী?

ছায়া মুখ তুলিল না, নতাননে কহিল, রামনগর।

না, না, না। সেখানে তোমার কেউ নেই। সে বিয়েকে আমি বিয়ে বলেই মনে করি নে।

পিতা ডাকিলেন, এখানে আয় ছায়া, বস।

ছায়া পিতার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতে,পিতা সস্নেহে বলিলেন,বস ছায়া।

ছায়া বসিল না। পিতা তাহার মনের ভাব বুঝিলেন, আর অনুরোধ করিলেন না। কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য স্নেহসিক্ত করিয়া বলিলেন, কিন্তু ছায়া, সে যে ভারী পাড়াগাঁ, খালি ম্যালেরিয়া, আর কেই বা আছে সেখানে, সেই বনের মধ্যে? সেখানে গিয়ে থাকতে পারবি কেন?

ছায়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, পারব বাবা।

মা পরুষকণ্ঠে কহিলেন, পারলেই বা কে তোমায় থাকতে দিচ্ছে!

ছায়া নীরব।

—ছুটো ড্যাম ওল্ড স্যাভেজ ফুলস্ (অসভ্য বর্ব্বর বোকা) সেবার কম অপমানটা আমাদের করেছে, আমরা তাদের ছেলের মাথা চিবিয়ে খেয়েছি, আমরা ডাইনী! বুনো উইজার্ড উইচ কোথাকার! সেইখানে গিয়ে থাকবে আমার মেয়ে!

ছায়া নীরবে দুটি চক্ষু তুলিয়া পিতার পানে চাহিল। দুটি চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিয়াছে—পদ্মের পাপড়িগুলির মধ্যে বারি সঞ্চিত হইয়াছে। তারপর আস্তে আস্তে নত হইয়া, মাটিতে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিয়া চরণ স্পর্শ করিল।

পিতা বলিলেন, তুই কি এখনই যাবি না কি ছায়া?

—হ্যাঁ বাবা।—বলিয়া সে মাকেও প্রণাম করিল, পাদস্পর্শ করিয়া আবার নতমুখে জোড় হাতে দাঁড়াইল।

মা রোষভরে কি বলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, পিতা তাঁহাকে থামাইয়া দিয়া, শান্তস্বরে কহিলেন, রাগারাগির কথা নয়, শোন্ ছায়া। তুই যে যাবি সেখানে, তাঁদের কোন খবর দিয়েছিস?

—না।

—তবে? তাঁরা যদি—তোর শ্বশুরশাশুড়ী পাড়াগেঁয়ে লোক, আমরা বিলেতফেরত ব্রাহ্ম বলে যদি তোকে তাদের বাড়ীতে না ঢুকতে দেন? তার চেয়ে আমি বলি, তুমি যেতে ইচ্ছে করেছ—যাও, আমি মানা করব না, কিন্তু একটি চিঠি লিখে তাঁদের মত নিয়ে যাওয়াই কি উচিত নয়?

ছায়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

মিসেস ঘোষ বলিলেন, কি তুমি পাগলের মত যা-তা বক্‌ছ? আমার মেয়ে যাবে সেই গো-ভাগাড় দেশে? সেই ছোটলোকদের সঙ্গে কিসের সম্পর্ক আমাদের? সেই ছোটলোক, যারা ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইতে জানে না, যারা মানীর মান রাখতে শেখে নি, তাদের বাড়ীতে যাবে আমার মেয়ে? তুমি কি পাগল হয়েছ? না, তোমার ভীমরতি হয়েছে?

ছায়া বিনীতকণ্ঠে কহিল, আমি যাই বাবা!—বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

তাহার পিতামাতা সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, গাড়ী-বারান্দায় ট্যাক্সি দাঁড়াইয়া, ট্যাক্সির পার্শ্বে বিমল দণ্ডায়মান।

তাহাকে দেখিয়াই মিসেস ঘোষের দুই চক্ষুতে আগুন ধরিয়া গেল। ভদ্র নারীর খোলসটা যেন এক মুহূর্ত্তে খসিয়া পড়িল; রুক্ষ পরুষকণ্ঠে কহিলেন—তুমিই কি পরামর্শদাতা?

ছায়া বলিল, উনি শুধু পৌঁছে দিয়েই ফিরে আসবেন। পরামর্শ ওঁর নয়, আমিই ওঁকে নিয়ে যাচ্ছি। আসি বাবা! দুই হাত তুলিয়া দুই বার কপালে ঠেকাইয়া দুইজনকে নমস্কার করিয়া ছায়া ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিল। পাছে চোখের জল ধরা পড়ে, উঠিয়া অন্য দিকে মুখ করিয়া বসিল। বিমল ট্যাক্সির দ্বার বন্ধ করিয়া চালকের পার্শ্বে বসিতে যাইতেছে,

অনুমানে তাহা বুঝিয়া ছায়া বলিল, না দাদা, আপনি এইখানেই বসবেন আসুন।

ট্যাক্সি চলিয়া গেল, প্রথমে বাগানের হাতা ঘুরিয়া, ফটক অতিক্রম করিল; আবার তখনি পিছু হঠিয়া সেই গাড়ী-বারান্দার নীচে আসিয়া থামিল। ছায়ার পিতামাতা সেইখানেই দাঁড়াইয়া ছিলেন।

ছায়া বলিল, বাবা, আমার গয়নাগাটি যা ছিল, সব আপনার দেওয়া—আপনি আমাকে দিয়েছেন, সেগুলো বেচে আমি তাঁকে বিলেতে টাকা পাঠিয়েছি, দেশে ফেরবার জন্যে। এলে তিনি তাঁর দেশেই থাকবেন। আর আমার কাপড়-চোপড় সবই রইল, আমি শুধু বিয়ের দিনের লজ্জা-বস্ত্রটি পরে আপনার বাড়ী থেকে একবস্ত্রে গেলাম।—বলিয়াই সে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মাথার কাপড়ে চোখ ঢাকিয়া বিমলকে বলিল, চলুন দাদা, জোরে চালাতে বলুন।

মেয়ে-বিদায়ের সঙ্গে বাঙ্গালাদেশের মায়ের হৃদয়ের কি করুণ যোগা-যোগ! কোথায় রহিল আধুনিকতা, কোথায় রহিল ইঙ্গবঙ্গ-ভাব, আর কোথায়ই বা রহিল সভ্য সমাজ—মার চোখ দিয়া হু হু করিয়া জল বাহির হইতে লাগিল। পিতা কিমনোয় চক্ষুদ্বয় মার্জ্জনা করিয়া পত্নীর বাহু ধরিয়া কহিলেন, চল, ঘরে যাই।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

বরাবর মোটরের পথ আছে বটে, কিন্তু বড় দুর্গম পথ। কলিকাতা হইতে কিছুদূর পীচ-ঢালা রাস্তার পরই মেঠো-রাস্তা সুরু হইল। কোথাও চষা-ক্ষেতের উপরে গরুর গাড়ীর 'নিক্' ধরিয়া, কোথাও শুষ্ক নদীর বুকের বালুস্তরের উপর দিয়া, কোথাও গৃহস্থের আঙ্গিনা ভেদ করিয়া রাস্তা গিয়াছে। মাথার উপরে প্রচণ্ড রৌদ্র, মোটরের ছাদ ভাঙিয়া আরোহী দু'টিকেও দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। ছায়ার প্রভাতকুসুমের মত স্নিগ্ধ কোমল মুখখানি আতপতাপদগ্ধ কমলিনীর মত শুকাইয়া বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কণ্ঠ তালু বিশুষ্ক, নিশ্বাস ফেলিতেও কষ্ট হইতেছে, তবুও বিশ্রাম লইবার প্রস্তাবে ছায়া সম্মত হয় নাই। কোন গ্রামাভ্যন্তরে গাড়ী থামাইয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিবার পরামর্শ বিমল দিয়াছিল, ছায়া বলে, না দাদা, একেবারে বাড়ী গিয়ে জল খাব। বিমল পুরুষ, দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রামে রত থাকিয়া কঠোর হইয়াছে, এই সকল তুচ্ছ ও দৈহিক কষ্টকে সে কষ্ট বলিয়া মনে করে না। কিন্তু যত্নে লালিত পালিত, বিলাস-ব্যসনে চিরাভ্যস্ত স্বভাবদুর্ব্বলা কোমলা বঙ্গবালা এত কষ্ট সহিতে পারিবে কেন? গাড়ী যখন রামনগর গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন বেলা দুইটা। গ্রামসীমান্তে অবস্থিত বিরাট দুই বৃদ্ধবটের প্রশস্ত শিকড়ের উপর কতকগুলি রাখাল-বালক শুইয়া দিবানিদ্রা যাইতেছিল, মোটরের শব্দে উঠিয়া পড়িয়া প্রথমে বিস্ময়ে হতবাক্ হইল, পরে কোলাহল করিয়া অনুপস্থিত বন্ধু ও আত্মীয়গণের নাম ধরিয়া ডাকাডাকি সুরু করিয়া দিল। মোটর থামাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল। বাড়ী কেহই জানে না, রাখাল-

বালকদের প্রশ্ন করা হইলে, তাহারা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল ; তারপর একজন বলিল, যেনাদের ছেলে বিলেত গিয়ে মেম বিয়ে করেছে, তেনাদের বাড়ী যাবেক ত ? সে ঐ হোথা !

'হোথা' বলিলে বুঝিতে পারিবে এমন বিদ্যা ইহাদের ছিল না। সপ্রতিভ বালক বলিল, সোজা গিয়ে জোড়াশিবের মন্দির দেখবেক ত, তারই বাঁয়ে যে রাস্তা, সেই রাস্তায় তেনাদের বাড়ী।

পাঁচনবাড়ী হস্তে একটি নগ্ন শিশু কহিল, মোকে হাওয়া গাড়ীতে তুলে নাও, মুই বাড়ী দেখিয়ে দিবক।

বিমল ছায়ার পানে চাহিল, ছায়া নীরবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিল। ধূলিধূসরিত দিগম্বর বালক ও তাহার সঙ্গীদের দেখিয়া ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাহার সহুরে মনটা আবার পিছু হাঁটিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কহিল, চলুন-না, জোড়াশিবের মন্দির দেখতে পাবই অখন।

কৌতূহলী বালকবৃন্দ জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা বোসেদের কে গা ?

ছায়া বলিল, গাড়ী চলে না কেন দাদা ?

গাড়ী চলিল। রাখাল-বালকগণ কিছুদূর পর্য্যন্ত মোটরের পিছনে ছুটিয়া নিরস্ত হইল।

জোড়া মন্দির। মন্দিরের দ্বার ভাঙ্গা, ভিতরে ঘন অন্ধকার, শিবলিঙ্গ আছে কিম্বা নাই, মন্দিরের চাতালে নানাবিধ বৃক্ষ-লতা গজাইয়াছে দেখিয়া মনে হয় না যে, কোনদিন কোন ভক্ত ভক্তি-অর্ঘ্য লইয়া এই মন্দিরে দেবাদিদেবের নিকট ডালি দিতে আসে। বাম দিকে একটি গরুর গাড়ীর রাস্তা দুই পার্শ্বের বনানীকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ভিতরের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। এই বনমধ্যে মানুষের বাস থাকিতে পারে ইহা মনে করাও

কঠিন। ট্যাক্সি-চালক মোড়ে গাড়ী রাখিয়া কিয়দ্দূর দেখিয়া আসিয়া গাড়ী চালিত করিল।

একটি কামারশালা। এক বৃদ্ধ কামার উত্তপ্ত লৌহের উপর হাতুড়ী পিটিতেছিল, একটি নগ্ন বালক বসিয়া হাপরের দড়ি টানিতেছিল. মোটরের শব্দে উভয়েই পথের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। বিমল প্রশ্ন করিয়া জানিল, এই রাস্তার শেষে যে বাড়ী, সেই বাড়ীর ছেলে বিলাতে গিয়া মেম বিয়ে করিয়াছে। গাড়ী আবার চলিল।

ডানদিকে একখানি মাটির ঘরসংলগ্ন ঢেঁকিশালে দুইটি নারী ধান ভানিতেছিল, গাড়ীর শব্দ তাহাদিগকেও বিস্রস্ত বসনে পথের ধারে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিল। গাড়ী চলিতে লাগিল।

একটি পানা-ঢাকা ডোবা। তাহারই ভাঙা সানে বসিয়া দুইটি প্রাচীন ছিপে মৎস্য শীকার করিতেছিলেন, তাঁহারাও ছিপ ফেলিয়া, চার, টোপ. ফাতনা, খালুই ভুলিয়া পাড়ে আসিয়া দাঁড়াইলেন, গাড়ী থামাইয়া অদম্য কৌতূহল নিবৃত্ত করিবার আশায় উৎসুক হইয়া পড়িলেন ; তাঁহাদের অধীরতার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়াই গাড়ী অগ্রসর হইয়া চলিল।

কয়েক ঘর সাঁওতালের বাস। এক খণ্ড জমির উপর ছোট ছোট কতকগুলি কুঁড়ে, অঙ্গনে খাটিয়ায় বসিয়া নধর-কৃষ্ণদেহ সাঁওতাল পুরুষ ও রমণীরা, কেহ তামাক খাইতেছে, কোন রমণী কাণে কলিকা ফুল গুঁজিয়া কৃষ্ণাধরে শুভ্রদন্তে হাসির লহর তুলিয়া গল্প করিতেছে, নগ্নকায় বালক-বালিকারা একপাল ছাগল-ভেড়া, গরু-মহিষ, মুরগীর সঙ্গে মিশিয়া খেলা করিতেছে। গাড়ীর শব্দ তাহাদিগকে সচকিত করিয়া তুলিল, তাহারাও সর্ব্ব কর্ম্ম পরিহার করিয়া পথের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল।

সাঁওতাল পরগণায় যে সাঁওতাল পুরুষ-রমণী দেখিয়া বাঙ্গালী নর-নারী বিমুগ্ধ হন, স্ব স্ব অদৃষ্টের নিন্দাবাদ করেন, হিংসাও করেন, বঙ্গপ্রবাসী সাঁওতালদের দেখিয়া তাহা করিতে হয় না। পাহাড় দেখিয়া বিস্ময় জাগে, টিলা বা উইঢিবি কাহারও বিস্ময় উদ্রিক্ত করিতে পারে না। মনে হয়, বাঙ্গালার পল্লীগ্রাম তাহার পরিপূর্ণ অস্বাস্থ্য, দূষিত জলহাওয়া, অন্নাভাবের প্রভাব বিস্তার করিয়া এই প্রকৃতির দুলালদেরও সমতলবাসীদের সঙ্গে সমভূমিতে আনিয়া দাঁড় করাইতে বিলম্ব করে নাই।

আরও দুই একটা হাজামজা পুকুর, বাঁশঝাড়, কলা গাছের সারি, কুটীর ও অট্টালিকার কঙ্কাল অতিক্রম করিয়া সঙ্কীর্ণ পথটি যেখানে শেষ হইল, ঠিক তাহার সম্মুখে বাঁশের বেড়া দেওয়া একখানি জীর্ণ কোঠা-বাড়ী, যেন কুব্জপৃষ্ঠ, ন্যুব্জদেহ মরণোন্মুখের মত পরকালের পানে জ্যোতিহীন চক্ষু মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ট্যাক্সির চালক মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হিঁয়া?

প্রশ্নটি ছায়ার মনটিকে যেন করাত দিয়া কাটিয়া ফেলিল। তাড়াতাড়ি বিমলকে বলিল, দাদা, নেমে দেখুন না, যদি কাউকে দেখতে পান!

বিমলকে নামাইয়া সন্ধান করিতে পাঠাইল বটে, কিন্তু তাহার মন বলিতেছিল, এই গৃহই বটে! তাহার বেশ মনে আছে, দেশের বাড়ীর কথা উঠিলে অশোক বিরক্ত হইত। অশোক মাতুল-গৃহে মানুষ,—মাতুল সহরবাসী, পল্লীগ্রামের বন-বাদাড়, ভাঙ্গাবাড়ী অশোকের মনকে পীড়া দিত, তাই জন্মভূমির নামমাত্রে সে সঙ্কুচিত হইত।

বিমল বেড়াটার ধারে ধারে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কাউকেই দেখতে পেলুম না ছায়া।

—আমি দেখছি, বলিয়া কম্পিত পদে ছায়া গাড়ী হইতে নামিল। পা দু'টা কাঁপিল কি? বুকের ভিতরকার স্পন্দন বন্ধ হইল কি? না, না—মনের ভুল! কিন্তু চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া আসে কেন?

বেড়ার একস্থানে প্রবেশের পথে দুইটি বংশখণ্ড আড়াআড়ি ভাবে বাঁধা ছিল। প্রবেশার্থীরা অল্পায়াসেই তাহা সরাইয়া ফেলিতে পারে, অথচ গরু-বাছুর ঢুকিয়া বাড়ীর অঙ্গনে উৎপাত করিতে পারে না। ছায়া ভিতরে ঢুকিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না। ঘরের রোয়াকে উঠিয়া দেখিল, প্রায়ান্ধকার ঘরের মধ্যে ছেঁড়া কাঁথার উপরে শতছিন্ন একখানি কাঁথা চাপা দিয়া একটি ছেলে শুইয়া যেন ধুঁকিতেছে। ছেলেটি দ্বারের পানে চাহিয়া শুইয়া ছিল, দ্বারসম্মুখে অপরিচিতা ও অপরূপ রূপলাবণ্য-শালিনী এ[illegible] নারীকে দেখিয়া ভয়ে তাহার অন্তরাত্মা পিঞ্জরমুক্ত হইবার উপক্রম করিল। ভয় পাইয়া দুনিয়ার ছেলেরা যাহা করে, এই ছেলেটিও তাহাই করিল; তারস্বরে চীৎকার করিল, মা! অ মা! মা!

ছেলেটি বোধ হয় ভাবিল, জ্বরের ঘোর বাড়িয়াছে। ঘোরের মধ্যে যেমন নানাবিধ কুস্বপ্ন দেখে, এ রূপলাবণ্যময়ীও তদ্রূপ। এই গ্রামে, এই তল্লাটে এমন জগদ্ধাত্রীর মত রমণীমূর্ত্তি কে দেখিয়াছে! নিশ্চয়ই জ্বর-বিকারে সে স্বপ্ন দেখিতেছে। তাই প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করিতে লাগিল, মা! অ মা! মা গো!

ছেলেটির মা অনতিদূরেই ছিলেন, হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া পুত্রের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার কপালে হাত রাখিলেন, কি বাবা, কি হয়েছে!

ছেলে আঙ্গুল দিয়া দ্বার দেখাইয়া দিল। প্রবল জ্বরের সময় ছেলে

যা তা বলে, যা তা করে। মা দ্বারের পানে চাহিলেন না, বুঝিলেন, বিকার, মনে মনে একশত আট দুর্গানাম স্মরণ করিতে করিতে বলিলেন, ষাট্ ষাট্!

জ্বরে-জ্বরে খিট্‌খিটেস্বভাব ছেলে, দাঁতমুখ বিকৃত করিয়া বলিল, দেখ না ঐ দোরের গোড়ায় কে!

এবারে মা ফিরিয়া চাহিলেন। চাহিতে চক্ষু জুড়াইয়া গেল। মনে হইল বুঝি বা স্বর্গের কোন দেবী তাঁহার পুত্রের উপর করুণাবশতঃ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহার আধিব্যাধি হরণ করিবার জন্য। চেতনে অচেতন হইয়া বৃদ্ধা নির্ব্বাক রহিলেন।

বৃদ্ধা বিধবা। ছায়া জানিত তাহার শ্বশুর অ[illegible] শাশুড়ী আছেন, আর একটি বালক দেবর আছে। এই বিধবা কে, তা[illegible] পারিয়া এবং কর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে না পারিয়া সেইভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল। তবু ভিতরে ঢুকিবার এবং কথা বলিবার জন্য তাহার পা দুখানি নড়িল, ঠোঁট দুখানি কাঁপিল। ইহা বৃদ্ধা দেখিলেন।

সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া বলিলেন, তুমি কে বাছা?

ছায়া সহসা কথা কহিতে পারিল না। বৃদ্ধার বিধবা বেশ দেখিয়া অজানা আশঙ্কায় তাহার ভিতরটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

বৃদ্ধা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোথা থেকে আসছ বাছা! কাদের বাড়ী এসেছ?

ছায়ার মন কাঁপিল, দেহ কাঁপিল, ঠোঁট কাঁপিল, কম্পিত কণ্ঠে কহিল, আমি কলকাতা থেকে আসছি, আমার নাম ছায়া।

—তুমি জজ-সাহেবের মেয়ে?—কথা কয়টি বলিতে বলিতে বৃদ্ধ

কাঁদিয়া ফেলিলেন। শতছিন্ন মলিন বসনের প্রান্তে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, কি দেখতে আর এখানে এলে বাছা?

ছায়া বুঝিল, শ্বশুরের মৃত্যু হইয়াছে, বিধবা তাহার শাশুড়ী। যে শ্বশুরের স্নেহসম্ভোগের সৌভাগ্য হয় নাই, যাঁহাকে কোন দিন চোখেও দেখে নাই, তাঁহার বিয়োগব্যথায় তাহার অন্তরও কাঁদিয়া উঠিল। নারীর বৈধব্যে নারীমাত্রেরই অন্তর বুঝি কাঁদে। ছায়া ভিতরে ঢুকিয়া শাশুড়ীর পাশে বসিয়া পড়িল। নিঃশব্দে শ্বশ্রূর পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল।

করুণ ক্রন্দনের ইতিহাস অতীব করুণ। জ্যেষ্ঠ পুত্র নরেশের বিচ্ছেদ-[illegible] পিতা বহুদিন সহ্য করিতে পারেন নাই। নরেশের (অশোকের আসল নাম নরেশ; মাতুলালয়ে সে সৌখীন অশোক নাম গ্রহণ করিয়াছিল) বিবাহ ও বিলাত গমনের চার মাসের মধ্যেই বৃদ্ধের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে। নিঃসহায়, নিঃসম্বল, অনাথা বিধবা ও অবোধ একটি বালককে ফেলিয়া রাখিয়া পুত্রবিরহাতুর বৃদ্ধ অতৃপ্ত আত্মার অনন্ত তৃষা লইয়া শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছেন। আজও রাত্রে বৃদ্ধা দেখিতে পান—এই বাড়ী, এই ঘর, ঐ সজিনাগাছের তল, ঐ গোয়াল-ঘর, ঐ কঞ্চির বেড়া, সকল স্থানে ব্যাকুল পিতার আকুল আঁখিতারা নরেশের সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। আজও বৃদ্ধের আতুর, আর্ত্ত কণ্ঠস্বর রাত্রের নিঃশব্দ বায়ুরথে আরোহণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, বৃদ্ধা তাহা নিজের কাণেই শুনিতে পান। অর্থাভাবে পরেশের চিকিৎসা হয় না; পথ্যাভাবে তাহার শরীর বাখারী হইয়া পড়িয়াছে; তাহার পরণে একখানি বস্ত্র নাই, গায়ের

একটি জামা নাই। নরেশ যদি তাঁহাদের এমন করিয়া না ভাসাইত. তাঁহাদের কিসের দুঃখ থাকিত?

বিধবা মাতা কত দিন, কত রাত্রি কাঁদিয়াছেন, চোখের জলে নদী বহিয়া গিয়াছে, পাষাণ গলিয়া গিয়াছে, বনের কুকুর-শেয়াল তাঁহার দুঃখে আর্ত্তনাদ করিয়াছে, গাছের পাখীর চোখেও জল ঝরিয়াছে; কিন্তু অভাগিনীর নয়নমণির প্রাণ এমনই কঠিন ধাতুতে প্রস্তুত, সে-ই শুধু আসে নাই, সে-ই কেবল কাঁদে নাই। ডাইনীতে তাহাকে ধরিয়াছে, হয়ত বা খাইয়াছে। সে প্রাণে বাঁচিয়া আছে কি না তাহাও কেহ জানে না।

ছায়া কাঁদিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, সব দোষ তাহারই। পুত্রমুখদর্শনবঞ্চিত বৃদ্ধ শ্বশুরের মৃত্যুজনিত অপরাধ তাহার, ঐ যে অপরাধ দুর্ব্বল শিশু ঔষধাভাবে জীর্ণ, পথ্যাভাবে শীর্ণ. সে অপরাধও তাহার, শাশুড়ী যে শতছিন্ন, সহস্রগ্রন্থিযুক্ত বসন পরিধান করিয়া কোন মতে লজ্জানিবারণ করিতেছেন, সে অপরাধও তাহার, তাহার, তাহার! নিজেকে সে যত অপরাধী মনে করে, তাহার চক্ষু দিয়া ততই অশ্রুর উৎস বাহিরিয়া আসে।

যত বড় শোক, যত বড় দুঃখ হউক, মানুষ যতই কাঁদুক, এক সময়ে তাহাকে থামিতেই হইবে। ক্রন্দনের উচ্চগ্রাম নামিতে নামিতে নরম পর্দ্দায় আসিয়া এক সময় স্তব্ধ হইয়া আসে; ক্রন্দনের শব্দ বন্ধ হয়, তখন শুধু নিঃশ্বাস কাঁদে।

ছায়ার শাশুড়ী বলিলেন, তোমার বাবা-মা এসেছেন না কি বাছা?

ছায়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল, না মা

—তবে তুমি কার সঙ্গে এলে?

—আমি একাই এসেছি মা; আমার এক দাদা আমাকে রাখতে এসেছেন।

বৃদ্ধা অশ্রুসিক্ত আরক্ত চক্ষুর্দ্বয় ছায়ার মুখের পানে স্থাপিত করিয়া কহিলেন, রাখতে এসেছেন? সে কি বাছা! তুমি জজ সাহেবের মেয়ে, আমার এই ভাঙ্গা ঘরে হা-ভাতে সংসারে থাকবে, কি বল?

ছায়া বিনীত কণ্ঠে কহিল, আমি থাকতেই এসেছি মা। বলিয়া সে বৃদ্ধার তুই চরণের মাঝে মুখ রক্ষা করিল।

—সে কি করে হবে বাছা? সে কি হয়?

—কেন হবে না মা? পরেশ যদি থাকতে পারে, আমিই বা পারব না কেন?

[illegible] রেশ। সে আর ক'দিন। তারও গণাদিন ফুরিয়ে এসেছে। তিনি মুখে এই কথাগুলি বলিলেন বটে; কিন্তু মনে মনে বারম্বার জিভ কাটিলেন, বারম্বার পরেশের শতায়ু কামনা করিলেন।

ছেলেটি এতক্ষণে উঠিয়া বসিয়াছিল, এক্ষণে ছায়ার এক খানি হাত তাহার চর্ম্মহীন কৃশহস্তে ধারণ করিয়া বলিল, তুমি আমার বৌ-দিদি?

ছায়ার বুকের মধ্যে চিরশান্ত, চিরসুপ্ত স্নেহসমুদ্র তোলপাড় করিয়া উঠিল। পরেশকে তুই হাতে বুকের কাছে, মুখের কাছে টানিয়া আবেগ-ভরে বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ ভাই, আমি তোমার বৌদিদি। তুমি আমার ঠাকুরপো!

পরেশ কতকটা নির্ভরতা, কতকটা সঙ্কোচের সহিত ভ্রাতৃজায়ার হাত-খানি অধিকতর জোরে চাপিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বৌদিদি, তুমি আর কলকাতায় যাবে না ত? এখানেই থাকবে? ও কি

তুমি চুপ করে রইলে যে বড়! চুপ করে থাকলে হবে না, বল, থাকবে ?

ছায়া শান্ত কণ্ঠে কহিল, হ্যাঁ ভাই, থাকব।

বৃদ্ধা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, পেটের ছেলের বৌ, আমার হারাধন নরেশের বৌ, কত আদরের ধন, কিন্তু তোমার ত এখানে থাকা হবে না বাছা।

—কেন হবে না মা ?

—তিনি থাকলে যা ভাল বুঝতেন, করতেন, তিনি নাই, আমি ত এই আবীরে-বিধবা।

ছায়ার মনে একটা সন্দেহের কাল মেঘ উঁকি মারিতেছিল, বলিল. হ্যাঁ মা, ঠাকুর কি বলে গেছেন—

বৃদ্ধা কহিলেন, না বাছা, তিনি কিছুই বলেন নি। আর বলবেনই বা কেন ? তুমি বড়লোক জজসাহেবের মেয়ে, তুমি যে কোন দিন আমার এই কুঁড়ে-ঘরে পা রাখতে আসবে, এ কি কোন দিন কেউ ভাবতেও পারে বাছা !

ছায়া সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তবে আমি আপনার কাছে থেকে আপনার সেবা করব না কেন মা ?

বিধবা নিরুত্তর। নীরবে নতমুখে বসিয়া পরেশের পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন। একটি একটি মিনিট এক একটি ঘণ্টার মত দীর্ঘ মনে হইতেছিল।

ছায়া ডাকিল, মা !

বিধবা বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন মাত্র, কথা কহিলেন না।

ছায়া তাঁহার পা চাপিয়া ধরিয়া আবার ডাকিল, মা!

ছায়ার মনে আরও একটি সন্দেহ জাগিয়াছিল বলিল, আমার বাবা-মা ব্রাহ্ম সমাজের, তারই জন্যে—

বৃদ্ধা কহিলেন, না বাছা।

ছায়া এবার প্রাণপণ বলে শাশুড়ীর পা চাপিয়া ধরিয়া কহিল, তবে কেন আমি আপনার সেবা করতে পাব না মা?—বলিতে বলিতে আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

এইবার বৃদ্ধা ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন; বলিলেন, মা, মা, রাজলক্ষ্মী আমার: আবাগীর কাছে থাকবি, কি খাবি মা? কোথেকে তোকে দুবেলা দু'মুঠো খেতে দেব মা? ঐ একরত্তি ছেলে মাসের মধ্যে পনের দিন একবেলা আধ পেটা খেয়ে কোন গতিকে বেঁচে আছে; অর্দ্ধেক দিন এক আঁজলা মুড়িও বাছার পেটে যায় না। দুঃখীর ছেলের প্রাণ সহজে বার হয় না, তাই আজও বেঁচে আছে, নইলে কবে আমায় ফাঁকী দিয়ে পালাত। তুমি এত কষ্ট করতে পারবে কেন মা?

—আমি পারব মা।

—না বাছা, না। সে আমি প্রাণ থাকতে দেখতে পারব না। বাপ-মার নিধি, তাঁদের কাছে থাকগে মা। না খেতে দিয়ে পরের বাছাকে আমি মারতে পারব না।

ছায়ার চোখে জল ঝরিতেছিল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, মা, মরতে হয়, তিন জনে এক সঙ্গে মরব; আপনার কাছ ছেড়ে আমি আর কোথাও যাব না। মা, আমি অনেক শিল্পকাজ জানি, কলকাতার অনেক প্রদর্শনীতে আমার শিল্পকাজ অনেক টাকায় বিক্রী হয়েছে, তার কিছু টাকা

আমার কাছে আছে, তাই দিয়ে আমাদের কিছুদিন ত চলুক; তারপর তিনি এলে—

বিধবা দুইটি ব্যাকুল, বিস্ফারিত নয়ন তুলিয়া তাহার পানে চাহিলেন।

ছায়া বলিল, তিনি এলে আমাদের আর ভাবনা কি?

—নরু! সে কি আর আসবে? তেমন বরাত আমার নয় বাছা!

—হ্যাঁ মা, তিনি আসবেন। আমাকে আসবার খরচের টাকার জন্যে লিখেছেন, আমি টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি।

মরণোন্মুখ রোগীও যেমন মকরধ্বজ প্রয়োগে চনমন করিয়া এই কথাগুলিতে বৃদ্ধাও সেইরূপ উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। অকস্মা বাহু প্রসারিত করিয়া পুত্রবধূকে বুকের মধ্যে টানিয়া অজস্র চুম্বনে করিয়া কহিলেন, হ্যাঁ মা, সত্যি করে বল, নরু কি আবার আসবে আসবে?

—হ্যাঁ মা, আসবেন।

বৃদ্ধা চিন্তিত মুখে কহিলেন, তবে যে শুনি সে মেম বিয়ে করেছে। মেমেরা নাকি কামরূপ কামাখ্যার যোগিনী, কাউকে ছাড়ে না।

ছায়ার নিজের মনে যে সন্দেহই থাক, ঘুণাক্ষরেও তাহা প্রকাশ করিতে সে পারে না; বলিল, না মা মেম বিয়ের কথা মিথ্যে। তিনি আমাকে চিঠি লিখেছেন—

—কবে আসবে লিখেছে?

—তিন সপ্তাহের মধ্যে।

—তিন সপ্তাহ—ক'দিন বৌমা?

—একুশ দিন মা।

—একুশ দিনের মধ্যে আমার হারানিধি আমার ঘরে আসবে বৌমা ?

—হ্যাঁ মা।

—তুমি রাজরাণী হও মা, শতপুত্রের জননী হও। নরু আসুক, তার হাতে তোমাদের দুজনকে সঁপে দিয়ে আমি যেন মা-গঙ্গায় যাই।

পরেশ বলিল, হ্যাঁ বৌদি, দাদা না কি গরু খায় ?

পাড়াগাঁয়ের সহজবিশ্বাসী ও সংস্কারাচ্ছন্ন ছেলেটির মনের ভাব বুঝিয়া ইতে ছায়ার বিলম্ব হইল না; বলিল, না ভাই, হিন্দুর ছেলে কি গরু

রাজল দেখলে ত মা! গরু যে ভগবতী, দাদা কখন তা খান্! এইবার তো যে তোর দাদা গরু খায়, ধাঁই ক'রে তার মাথায় চাঁটি না দিই ত আমি কি বলিছি।

কি ভাবে ও কিরূপ বেগে চাঁটি দিতে হইবে তাহারই রিহার্স্যাল দিতে গিয়া দুর্ব্বল পরেশ মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইতেছিল, ছায়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া কোলের উপর মাথাটা চাপিয়া শোওয়াইয়া দিল। পরেশও সামলাইয়া লইয়া দুই দুর্ব্বল ক্ষীণ হস্তে যত বল ছিল, তাহা দিয়া বৌদিদিকে জড়াইয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

বাহিরে ইত্যবসরে পল্লীবাসী ও বাসিনীদের ভিড় জমিয়া উঠিতেছিল! পরেশের মা তাহা বুঝিয়া ঘরের বাহিরে গেলেন।

পরেশ যত জোরে পারে চাপিতে চাপিতে কহিল, আর ত আমি তোমাকে ছাড়ব না বৌদি!

ছায়াও তাহার উত্তপ্ত আননের উপর মুখ রাখিয়া কণ্ঠে স্নেহের সাগর ঢালিয়া দিয়া কহিল, আমিই বুঝি তোমাকে ছাড়ব ভেবেছ!

পরেশ একটু পরে বলিল, বৌদিদি, কলকাতা থেকে আমার জন্যে ভাল ভাল খাবার এনেছ তুমি ?

ছায়া মনে মনে জিভ কাটিয়া বলিল, তুমি কি কি ভালবাস জেনে আমার দাদাকে দিয়ে আজই আনিয়ে নেব ভাই। বল-না ভাই, তুমি কি কি ভালবাস ?

—আমি সব ভালবাসি বৌদিদি !—একটু থামিয়া আবার বলিল, মা'র যে পয়সা নেই, আমরা যে বড় গরীব, আমি যে কিচ্ছু খেতে পাইনে বৌদিদি !

ছায়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, এইবারে পাবে ভাই।

ছায়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে ভাবিল, এই চির-অভুক্ত ক্ষুধিত শিশুকে রক্ষা করিতে পারিলে তাহার নারী-জীবন সার্থক হইবে।

পরেশ বলিল, বৌদিদি, এখানেও কামিনী বোষ্টমীর দোকানে বড় বড় রসগোল্লা, গজা, পান্তুয়া পাওয়া যায়। গাঁয়ের সবাই কেনে, খায়, আমি শুধু চেয়ে চেয়ে দেখি। তোমার কাছে পয়সা থাকে ত দাও না, আমি ছুটে গিয়ে চারটে বড় রসগোল্লা আনি। তুমি দু'টো, আমি দু'টো।

—কিন্তু তোমার যে জ্বর হয়েছে ভাই।

—ধের্! ও জ্বর আবার জ্বর! ও ত রোজ হয়, রোজ ছেড়ে যায়। আমি চান করি, ঘরে যে দিন ভাত থাকে খাই, যেদিন ভাত না থাকে, মা কলমীশাক সেদ্ধ করে দেয়, তাই খাই। তোমার কাছে ভাঙ্গান পয়সা আছে বৌদিদি ?

—পয়সা নয় ভাই, টাকা আছে।

—দাও না, ভাঙ্গিয়ে রসগোল্লা আনি। বল ত চারখানা গজাও আনতে পারি।

ছায়া হাসিয়া বলিল, আর পান্তুয়া বুঝি ভাল নয় ঠাকুরপো? তা'ও চারটে আনবে না?

পরেশ হাসিয়া বলিল, হুঁ, তা'ও!—বলিয়া ছায়ার হাত হইতে টাকাটা একরূপ ছিনাইয়া লইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

পরেশের মুখখানির আদল আসে অশোকের মুখের মত। অশোকের মত উন্নত নাসিকা, তাহারই মত দীর্ঘায়ত নয়ন, তাহারই মত সুগৌর বর্ণ! আর চলাটি—হুবহু অশোকের মত। বিচিত্র মানুষের মনের গতি। ঐ রুগ্ন, পাণ্ডুর ছেলেটির দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে যে-ভাবনা, যাহার ভাবনা কোন দিনই তাহাকে এমন করিয়া পাইয়া বসে নাই, তাহাই পাইয়া বসিল এবং ঐ ছেলেটিকে তুষ্ট করিয়া সেই বহু সহস্র মাইল দূরবর্ত্তী লোকটিকে তুষ্ট করিতে পারিবে ভাবিয়া নারী নববলে বলী হইয়া উঠিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

ছায়া তাহার পিতামাতার সহিত সকল সংস্রব বিচ্ছিন্ন করিয়া আসিয়াছে শুনিয়া তাহার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর মনস্তাপের অবধি রহিল না। বাপ-মা যে কি পদার্থ, যে ছেলে মেয়ে তাহা না বুঝিয়া তাঁহাদিগের মনবেদনার কারণ হয়, ইহকালে ত নয়ই, পরকালেও তাহারা সুখী হইতে পারে না।

ছায়ার মত সুশীলা মেয়ে যে কিরূপে বাপ-মার মনে কষ্ট দিয়া তাঁহাদের অমতে এক বস্ত্রে শাঁখা হাতে চলিয়া আসিল, তাহা তিনি ভাবিয়াই পাইলেন না।

ছায়া বলিল, নইলে যে তাঁরা আমাকে আপনার কাছে পাঠাতেন না মা।

—নরু বাড়ী আসছে; সে এলে তোমাকে তাঁরা না পাঠিয়ে পারতেন না। কটা দিন বৈ ত নয়, চুপ ক'রে বাপ-মার মুখ চেয়ে থাকতে হয় বাছা।

তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিবার একটি গুরুতর কারণ ছিল। মা যে তলে তলে একটা ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন, এমন কি তাহার পিতার অজ্ঞাতে কোন উকীল কি ব্যারিষ্টারের সঙ্গে তাহার দ্বিতীয় বার বিবাহ দিবার পরামর্শ আঁটিতেছিলেন, দৈবক্রমে ছায়া তাহা জানিতে পারে। জানিয়াই মনটি তাহার বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। অশোকের উপর তাহার যে খুব মন পড়িয়াছিল, তাহা নয়; বিবাহান্তে বর-বধূর মধ্যে স্বাভাবিক নিয়মে যে প্রণয়ের বন্ধন সূচিত হয়, ইহাদের তাহাও হয় নাই; পরে অশোকের আচরণে তাহার প্রতি অশ্রদ্ধারও অন্ত ছিল না, মনে মনে ছায়া যেন তাহাকে ঘৃণা করিতেও আরম্ভ করিয়াছিল, সব সত্য; তবু এক নারীর দুইবার দুইটি পুরুষের সঙ্গে বিবাহের কল্পনামাত্রে নারীর মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে অশোকের প্রতি মাতার নির্মম ব্যবহার কঠোর ও ক্রূর রূপ ধারণ করিতেছিল। মা তাহার বিলাতের খরচ বন্ধ করিয়াছেন ছায়া তাহা জানিত, কিন্তু ইহার গুরুত্ব যে কতখানি, তাহা সেই দিনের পূর্ব্বে সে অনুমানও করিতে পারে নাই, যেদিন অশোকের

চিঠিখানি তাহার হাতে আসিয়া পড়িল। সেই দিন মনে হইল, এ জগতে একমাত্র সেই যেন অশোকের আশ্রয়স্থল আর অশোকের জন্যই যেন তাহার এই দেহ, এই জীবন, এই ধনরত্ন, এই মণিমাণিক্য, এই রত্নালঙ্কার! অশোক সেই সুদূর প্রবাস হইতে তাহারই মুখ চাহিয়া পত্র লিখিয়াছে; আর কাহারও ভরসা সে করে নাই, আর কাহারও যাচ্ঞা করে নাই—শুধু—কেবলমাত্র তাহারই কাছে যাচ্ঞা করিয়াছে, তাহারই সামনে ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া দাঁড়াইয়াছে। হিন্দু দেব-দেবীর চিন্তায় অনভ্যস্ত ছায়ার মনে কবেকার দেখা একখানি পটের চিত্র উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দেব-দেবীর নাম তাহার মনে নাই, তবে চিত্রখানি এইরূপ। রত্নরাজিপরিহিতা পত্নী স্বর্ণ-সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট, বাঘাম্বর-পরিহিত ভিক্ষুকপতি ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে সম্মুখে দণ্ডায়মান। অশোক যেন সেই বাঘছাল-পরিহিত ভিক্ষুক স্বামী, সেই সুদূর দেশ হইতে দুইখানি হাত বাড়াইয়া ছায়ার কাছে বলিতেছে, ভিক্ষাং দেহি!

সুখের দিনে আর সকলকে মনে পড়িলেও ছায়াকে অশোকের মনে পড়ে নাই, আজ দুঃখের দিনে আর কাহাকেও তাহার মনে পড়ে নাই, একমাত্র ছায়াকেই মনে পড়িয়াছে। সুখের সময়ে তাহার অনেক বন্ধু ছিল, দুঃসময়ের একতম সুহৃদ ছায়া! এই চিন্তাটুকু ছায়াকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। আর কেহ নয়, একমাত্র সেই পারে তাহাকে সাহায্য করিতে, অশোক একমাত্র তাহারই ভরসা করে, এই চিন্তা ছায়ার সকল চিন্তাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। তখন মনে পড়িল, সেই বিবাহ-রজনীর কথা। সে রাত্রির কথা সে একরকম ভুলিতেই বসিয়াছিল, চেষ্টা করিয়া মন হইতে বিদূরিত করিয়াছিল, এখন নূতন করিয়া সেই দৃশ্য,

তাহার সাজসজ্জা, তাহার গৌরব, তাহার সৌরভ, তাহার মাধুর্য্য ও ঔজ্জ্বল্য লইয়া তাহার মানসপটে জ্বল জ্বল করিতে লাগিল। বিচিত্র সাজে সজ্জিত কক্ষ, ফুলে পাতায় আলোকমালায় অপরূপ সাজিয়াছে। মধ্যস্থলে রত্ন-বেদিকা, বেদীর দুই পার্শ্বে দুইখানি বিচিত্র কোমল সুখাসন—বেদিকায় আচার্য্য, দুই পার্শ্বে তাহারা দুই জন। সম্মুখে, নিকটে, দূরে, যত দূর দেখা যায়, বিচিত্র বসনভূষণে সজ্জিত আত্মীয়স্বজনগণ। একপার্শ্বে যন্ত্রীগণ মৃদু বাদ্য বাদন করিতেছেন। ছায়ার আত্মীয়-দুহিতারা আচার্য্যের নির্দ্দেশে মধ্যে মধ্যে সুললিত সঙ্গীত করিতেছে, তাহারই মাঝে মাঝে তাহাদের হৃদয়ের আদান-প্রদান হইয়াছিল।

ছায়া বলিয়াছিল—

বরেণ্যস্তং বৃণে ত্বাস্থ বৃণে চিত্তং বৃণে মনঃ।
বৃণে সৌমনসং হার্দম্ আত্মানং হ্যাত্মনা বৃণে॥

তুমি বরণীয়, তোমাকে আজ বরণ করি, তোমার চিত্ত, তোমার মনকে বরণ করি। তোমার প্রীতি, তোমার হৃদয়কে বরণ করি; আমার আত্মার দ্বারা তোমার আত্মাকে বরণ করি।

অশোক বলিয়াছিল—

বৃণে ত্বামপি সংসদি

তোমাকেও আমি সর্ব্বসমক্ষে বরণ করিতেছি।

তাহারা উভয়ে একসঙ্গে বলিয়াছিল—

ওঁ বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ং চ তে।

আমি সত্যগ্রন্থি দ্বারা তোমার মন ও হৃদয় বন্ধন করিতেছি।

আচার্য্য বলিয়াছিলেন—

ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রূাং ভব।
ননান্দার সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধি দেবৃষু॥

শ্বশুরের নিকট, শাশুড়ীর নিকট, ননন্দা ও দেবরগণের নিকট তুমি সম্রাজ্ঞীর ন্যায় শোভমানা হও।

সমবেত নরনারী মধুর কণ্ঠে মধু উচ্চারণ করিয়া বলিয়াছিলেন—

ওঁ স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি॥

ছায়ার মনে হইয়াছিল, আলোকমালা যেন সহসা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছিল; পুষ্পরাজি যেন অধিকতর মিষ্ট সুরভি বিতরণ করিয়াছিল; তাহাদের কল্যাণকামীদের কণ্ঠে স্বস্তিবচন যেন উদাত্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

কত দিনের কথা সে! ছায়া সে কথা সব ভুলিতে বসিয়াছিল। সে ধূপের গন্ধ, সে রক্তরাগরঞ্জিত আলোকদ্যুতি, সে পুষ্প-সৌরভ সবই তাহার মনে আবছায়া হইয়া আসিয়াছিল, হঠাৎ অশোকের এই সকরুণ যাত্রা তাহার মনে সেই রাত্রিকে মধুময়, প্রীতিময়, আলোকময়, সুখময়, আবেগময়, আশা-আকাঙ্ক্ষাময় করিয়া তুলিল। এ যেন দুষ্প্রাপ্য দুর্লভ সৌন্দর্য্যের তীব্র আকর্ষণ, ইচ্ছাসত্ত্বেও তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলা যায় না, ইহার পর হইতে অশোককে মন হইতে দূরে রাখিবার সাধ্য তাহার রহিল না। অশোকের সুন্দর মুখখানি বুকের ভিতরে আসিয়া বাসা বাঁধিল। অশোকের হাসিটি চোখে, তাহার মিষ্ট কণ্ঠস্বরটি দুটি কাণে লাগিয়া রহিল।

রামনগরে আসিয়া অশোককে যেন সে আরও নিকটে পাইল। অশোকের মাকে মা বলিয়া, তাহার ছোট ভাইটিকে ভাই বলিয়া তাহার

যেন আশ মিটে না। এত সেবা এত যত্ন করিতে সে জানিল কিরূপে, ইহা ভাবিয়া সে নিজেই বিস্মিত হইল।

বিমল তাহাদের সাংসারটি গুছাইয়া দিয়া গিয়াছিল।

ক্ষুদ্র সংসারের প্রয়োজনও ক্ষুদ্র, গুছাইয়া লইতে বিশেষ কষ্ট হয় নাই। দুই দিনেই সংসারে শ্রী ফিরিয়া গেল। যে গাভীটি পাঁচ মাস দুগ্ধ বন্ধ করিয়াছিল, তাহার বাঁটেও দুধ ফিরিয়া আসিল।

পল্লীগ্রামে যাহারা বাস করে, তাহাদিগকে সদাসর্ব্বদা নগদ পয়সায় জীবনধারণ করিতে হয় না। অতিবড় দরিদ্রও পুকুরে কলমী, শুশুনি শাক পায়, ঘরের বেড়ায় লাউ, ঝিঙা, উচ্ছে জন্মে। কয়েক মুষ্টি তণ্ডুল জুটিলে চর্ব্বচোষ্য অনায়াসেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। সহরের মেয়ে, ধনীর দুলালী ছায়া শাশুড়ীর সঙ্গে পাঁচ বাড়ী বেড়াইতে গিয়া সবই লক্ষ্য করিল। যাহাদের সঙ্গে তাহার নবীন বন্ধুত্ব হইল, তাহাদের নিকট হইতে শাকশব্জীর বীজ বা চারা চাহিয়া লইয়া উঠানের জমিটুকুর সদ্ব্যবহার করিল। কয়দিনেই ঘরের শ্রী ফিরিয়া গেল।

আশ্চর্য্য নারীর মন, আর ততোঽধিক আশ্চর্য্য তাহাদের দৈহিক শক্তি। এই দরিদ্র পল্লীগ্রামে, দরিদ্রের গৃহাধিষ্ঠাত্রী ছায়াকে আজ না দেখিলে, তুমি পাঠক মহাশয়, কল্পনা করিতেও পারিবে না, কেন নারীকে শক্তিরূপিণী বলিয়া পূজা করিবার প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। তুমি ছায়াকে ঘোষ-সাহেবের ড্রয়িং-রুমে সোফা-সেটিতে বসিয়া বয়-বেহারা-বাহিত চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দেখিয়াছ; আয়া তাহার চরণসরোজে গিল্ট-এজেড জুতার বগলোস্ আঁটিয়া দিতেছে, ইহাও তুমি দেখিয়াছ; প্রণয় মামার সঙ্গে মোটরে বায়ুসেবনার্থ বিলাস-ভ্রমণ করিতেও দেখিয়াছ।

আর আজ দেখ, গোয়াল-ঘরে ছায়া, রন্ধনশালায় ছায়া, সে যে কোন দিন কোমরে কাপড় জড়াইয়া ঝাড়ুহস্তে উঠান ঝাঁটাইতে পারে, ইহা চোখে না দেখিলে বিশাস করা কঠিন নয় কি? প্রভাতে, নিদ্রাভঙ্গে যাঁহাকে সে কোনদিন ডাকে নাই, কি বলিয়া ডাকিতে হয় তাহাও জানে না, তিনি কে তাহাও অজ্ঞাত, তাঁহাকেই ডাকিয়া বলে, আমাকে তুমি শক্তি দিও, তোমার কাছে আর কিছু চাহিব না। তুমি আমাকে শক্তি দিও, কোন কাজে আমি যেন অশক্ত না হই।

শাশুড়ীর মুখে দিবসারম্ভে নিত্যই সেই এক কথা।

—হ্যাঁ বৌমা, আর ক'দিন বাকী রইল মা?

—দু সপ্তাহ, মা।

—দু সপ্তাহ ক'দিন বাছা?

—পনের দিন মা।

দুইদিন পরে ছায়া বলিল, তের দিন বাকী মা।

শাশুড়ী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, কত দিন আগে ত তুমি বললে তের দিন বাকী, আজও বলছ তেরদিন। কি রকম কথা বাছা তোমার?

এ কথার কি উত্তর ছায়া দিবে? যে প্রশ্ন করিতেছে সে যে মণি-হারা ফণী, পুত্র-বিরহবিধুরা জননী! তাহার কাছে এক দণ্ড যে একবৎসর তুল্য! কোন্ কৈফিয়ৎ তাহাকে সন্তোষ দিতে পারে?

একদিন হৈ হৈ করিতে করিতে দুইখানা মোটর বোঝাই জিনিষপত্র আসিয়া পড়িল। পিতার বয় সঙ্গে আসিয়াছে। প্রায় এক বৎসর একটি বৃহৎ সংসার সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে চলিতে পারে এমন সমস্ত জিনিষ পিতা পাঠাইয়া দিয়াছেন। বয়কে কাছে বসাইয়া ছায়া পিতামাতার

সংবাদ লইতে বসিল। শুনিল, কাল রাত্রে তাঁহারা বিদেশে চলিয়া গিয়াছেন!

—হঠাৎ বিদেশে কেন রঘু? শরীর ভাল আছে ত?

—হুজুরের শরীর খারাপ ছিল দিদিমণি।

—মা।

—মেম সাহেব ভাল আছেন।

একটা প্রশ্ন কণ্ঠ ভেদিয়া জিহ্বার উপরে তাণ্ডব করিতেছিল, কিন্তু প্রকাশ করাও সহজ ছিল না। রঘু নিজেই কৌতূহল চরিতার্থ করিয়া কহিল, হুজুর কাল আদালতে গিয়ে আমাকে টাকা আর ফর্দ্দ দিয়ে দিলেন, বললেন, তিনি বিদেশ থেকে আপনাকে চিঠি লিখবেন।

প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল, মা এ সবের কিছু জানেন না; বাবা তাঁহাকে জানাইতে ভরসাও পান নাই। চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িয়াছিল, ছায়া বলিল, দাঁড়া রঘু, তোদের খাওয়ার ব্যবস্থা করি।

কিন্তু একবার নির্জ্জন ঘরে এই সমস্ত জিনিষপত্রের মাঝখানে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে 'বাবা বাবা' বলিয়া ডাকিতে ইচ্ছা হইতেছিল; একবার প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া লইতে ইচ্ছা হইতেছিল; একবার জিনিষপত্রের মধ্যে পিতার স্নেহতপ্ত হৃদয়ের উত্তাপ গ্রহণ করিতে ছায়ার বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছিল। পিতা চিরদিন চাপা-স্বভাবের লোক, কখনও কোন বিষয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ পায় না; কিন্তু আজ, ছায়া দেখিতেছিল, সকল জিনিষে স্নেহের প্রবল উচ্ছ্বাস—নদীর প্লাবনোচ্ছ্বাসসম মিশিয়া রহিয়াছে।

পরেশ কোন্ সামগ্রী অধিক ভালবাসে, কোন্‌টি এখনই পরীক্ষা করিবে, ইহার বিচার-বিবেচনায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেও বৌদিদির

কার্য্যে সহায়তা করিতে একটুও ভুলে নাই। ছায়া ভাতের হাঁড়ীতে জল ঢালিয়াছে মাত্র, পরেশ পুকুর হইতে ধুচনী করিয়া চাল ধুইয়া আনিয়া হাজির। কয় দিন তাহার জ্বর হয় নাই; পেঁটরার অন্ধকারা হইতে তাহার 'ফার্ষ্ট বুক অফ রীডিং' খানি বাহির হইয়াছে। শুধুই বাহির হয় নাই; বৌদিদি তাহার অঙ্গে একটি জ্যাকেট পরাইয়া দিয়াছে, আর ভিতরে প্রত্যেক শব্দের পাশে অর্থ লিখিয়া দিয়া কঠিন পাঠ সহজ করিয়া দিয়াছে। হাঁড়ীতে জল ঢালিয়া বৌদিদি ক্যাসাবিয়াঙ্কার গল্পটা আজ বলিবে কথা আছে, বৌদিদি পুকুরে চাল ধুইতে গেলে বিলম্ব হইয়া পড়িবে, এই আশঙ্কায় পরেশ বৌদিদির মানা সত্ত্বেও জল ঘাঁটিয়াছে। যদি সময় থাকে, ক্যাসাবিয়াঙ্কার পরে রিপ ভ্যান উইঙ্কলের গল্পটিও আজই শুনা হইয়া যাইবে।

রঘু ছায়ার শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া যখন তাহাকে প্রণাম করিতে আসিল, তখন ছায়া আঁচল খুলিয়া একটি টাকা বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেল। রঘু বলিল, দেবে দিদিমণি, দাও, সাহেব কিন্তু পাঁচটাকা বথশিশ আগেই দিয়েছেন। এই দেখ।—রঘু ট্যাঁক হইতে একখানা পাঁচটাকার নোট বাহির করিয়া দেখাইল। অপর ট্যাঁক হইতে এক তাড়া নোট বাহির করিয়া বলিল, সাহেব বলেছেন, তোমার গয়নাগুলো বিমল-বাবুকে দিয়ে ছাড়িয়ে এনে রেখেছেন। আর এই টাকায় তুমি হাত-খর কর।

আবার চোখে জল আসিয়া পড়িতেছিল, তাড়াতাড়ি হাত পাতিয়া নোটের তাড়া লইয়া ছায়া চলিয়া গেল।

শাশুড়ী বলিলেন, ওমা, অত টাকা কি ঘরে রাখতে আছে। যে দিন কাল পড়েছে মা, চোর-ডাকাতে লুটেপুটে নেবে, চাই কি প্রাণেও মারতে পারে।

ছায়া বলিল, মা, আমি ঠাকুরপোর জন্যে জমি কিনব। ঠাকুরপো চাষবাস করবে।

বৃদ্ধা হাসিয়া বলিলেন, কায়েত বামুনের ছেলে লেখাপড়া ছেড়ে—

ছায়া বলিল, লেখাপড়া ক'রে ত সব হয়! ঐ যে বিমল দাদা এসেছিলেন, ছ'টা পাস করেছেন, খুব বিদ্বান্, একটা ত্রিশটাকা মাইনের চাকরীও হচ্ছে না। কি হবে মা, লেখাপড়া করে? ঠাকুরপো চাষবাস করে রাজার হালে থাকবে।

পরেশ এই সময়ে ঘরে আসিয়া ঢুকিল। ছায়া আসিয়া বলিল, আর ঠাকুরপো'র যে রকম বুদ্ধি তাতে ওর লেখাপড়া হবেই না, তা আর কথা! জানেন মা, ভায়ের আমার এমন বুদ্ধি, বলে, বি ইউ টি যদি বাট্ হয়, পি ইউ টি পাট হবে না কেন? এই বুদ্ধি নিয়ে ও আবার লেখাপড়া করবে! না মা, আপনি চাটুয্যে মশাইকে দিয়ে জমির সন্ধান করুন, পাঁচশো টাকায় অনেক জমি হবে।

—দেখি বাছা!—বৃদ্ধা কোলের ছেলেটির বিদ্যাহীনতার সংবাদে খুশী হইতে পারেন নাই, তাঁহার মুখ দেখিয়াই তাহা বোঝা গেল।

আরও তিন দিন কাটিল। প্রত্যূষে দুর্গানাম স্মরণ করিয়াই বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিলেন, আর ক'দিন দেরী বৌমা?

—আর দশদিন বাকী মা!

—বৌমা, তুমি কি আমায় মিথ্যে কথা বলছ বাছা?

—মিথ্যে কথা বলব কেন মা?

—তুমি বলছ আর দশ দিন বাদেই আমার নরু বাড়ী আসবে। তাই যদি হয়, সে কি একটা চিঠিও লিখত না?

এ কথার কি কোন উত্তর আছে? এই প্রশ্ন কি তাহাকেও পীড়ন করিবার চেষ্টা করিতেছিল না? যে দিন 'কেব্লে' টাকা পাঠাইয়াছে, সেই দিন হইতে একটি তারের খবরের প্রত্যাশা অহরহ কি তাহার মনও করে নাই? কিন্তু আশা ত পূর্ণ হয় নাই। শ্বশ্রূর প্রশ্নের জবাব তখনই না দিলে নয়; বলিল, বাড়ী ত আসছেনই, বোধ হয় সেই জন্তেই আর চিঠি লেখেন নি।

শ্বশ্রূ চুপ করিয়া রহিলেন; কথাগুলা তাঁহার মনঃপূত হয় নাই। সত্য কথা বলিতে কি, যুক্তিটায় ছায়ার মনও সাড়া দেয় নাই। তাই সে আবার বলিল, আর মা জাহাজ থেকে চিঠি ত ডাকে পাঠান যায় না।

শাশুড়ী তবুও কথা কহিলেন না।

দিন তিনেক পরে একদিন বিকাল বেলা সুদৃশ্য মোটরে চড়িয়া প্রণয়-কুমারের শুভাগমন হইল। তাঁহার সাহেবী পোষাক, মাথায় হ্যাট্, চোখে মোটর-চশমা দেখিয়া ছায়ার শাশুড়ী সসম্ভ্রমে সরিয়া গেলেন; পরেশ আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া সাহেবকে দেখিতে লাগিল, সামনে আসিতে তাহার সাহসে কুলাইল না।

তাহাকে দেখিয়া, যে জীবনকে ছায়া বহুদূর পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে, এক মুহূর্তে তাহাই প্রকাশ হইল। সঙ্গে সঙ্গে মন চাবুক খাইয়া পড়িল। তবুও, সংসারের দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মে, হাসিমুখেই আগন্তুককে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে হয়।

ছায়া প্রণয়-মামাকে চা করিয়া দিল; বলিল, প্রণয়-মামা ত এখুনি যাচ্ছ না, রাত্রে খাবার ক'রে দেব, খেয়ে যাবে। কেমন?

প্রণয় বলিলেন, সে হবে—হবে! তার জন্যে ব্যস্ত হতে হবে না। আমি বলছি কি, সীতার বনবাস শেষ হবে কবে?

ছায়া হাসিয়া বলিল, রামচন্দ্র ফিরলেই।

প্রণয় হতাশাব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন, সে আর ফিরেছে!

ছায়ার মুখখানি শুকাইয়া গেল। বলিল, না ফেরেন, বনবাসেই জীবন কাটবে।

প্রণয় বলিলেন, যা-যা, জ্যেঠামো করতে হবে না। এখানে কখন ভদ্দরলোক থাকতে পারে?

ছায়া হাসিয়া বলিল, ভদ্রলোক পারে না, আমরা পারি, প্রণয়-মামা! দিন পনের ত হয়ে গেছে, কেন, বেশ ত আছি। কিছু মন্দ দেখছ? মেয়েমানুষ হয়ে জন্মাতে যদি, শ্বশুর-ঘর কি জিনিষ, জানতে পারতে!

প্রণয় দেখিলেন, কথাগুলা দূরের পথ ধরিতেছে; তিনি মোড় ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন, চল্ ছায়া, একটু বেড়িয়ে আসি।

—কোথায় গো?

—এই কাছাকাছি কোথাও। গাইড-বুকে দেখছিলুম, কাছেই সপ্তগ্রাম। সপ্তগ্রাম জানিস্ ত? সাতগাঁ রে! বাঙ্গালা দেশের প্রধান বন্দর ছিল সপ্তগ্রাম! রাজবাড়ী, দুর্গ—এ সবের চিহ্ন এখনও দেখতে পাওয়া যায়। চল্ দেখে আসি।

ছায়া দু'টি হাত নমস্কারের ভঙ্গিতে মাথায় ঠেকাইয়া কহিল, রক্ষে কর প্রণয়-মামা, এ তোমার কলকতা সহর নয় যে, মেয়ে-পুরুষ এক সঙ্গে মোটরে বেড়াতে যাবে! এখানে রাতদুপুরের আগে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও দেখা হওয়ার নিয়ম নেই।

প্রণয় তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিলেন, সে নিয়ম পাড়াগেঁয়ে ভূতেদের জন্য।

ছায়া বলিল, আমিও সেই ভূতেদেরই একজন হয়ে গেছি যে প্রণয়-মামা!

—তবে চল্, কল্‌কাতা ঘুরে আসি। কতক্ষণই বা লাগবে? চার পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসব। বল্ এদের, বাবা-মা নিতে পাঠিয়েছেন।

—তাঁরা ত এখানে নেই, প্রণয়-মামা।

—নাই বা থাকল, ঐ বলে দুজনে খানিক ড্রাইভ করে আসি। কতদিন এক সঙ্গে বেড়ান হয়নি বল্।

ছায়া করুণকণ্ঠে কহিল, দোহাই প্রণয়-মামা, আর আমায় ওসব কথা ব'ল না, তোমার পায়ে পড়ি।

প্রণয় বলিলেন, লক্ষ্মীটি, চল।

—সাত দোহাই তোমার! আমায় মাপ কর। অতি কষ্টে কলকাতাকে ভুলেছি; আর আমায় কলকাতার কথা মনে করিয়ে দিও না। আমি বেশ আছি প্রণয়-মামা।

—বেশ আছ কেমন তা আর দেখাছ নে! কাপড়ে এক গাদা হলুদের দাগ, পায়ের নীচে একরাশ ঝুল কালি, হাতে ওসব দাগ কিসের? রাঁধতে হয় বুঝি?

—শুধু রাঁধতে? প্রণয়-মামা, আমার একটি গরু আছে, যে ঘরে গরু থাকে, তাকে গোয়াল-ঘর বলে জান ত? সেই গোয়াল-ঘর আমি নিজের হাতে সাফ করি; পুকুরধারে বসে বাসন মাজি। আমার শাশুড়ী একা, বুড়ো মানুষ, সব কাজই আমি করি। বলিয়া ছায়া হাসিল।

প্রণয়কুমার বিরক্ত হইয়া কহিলেন, তবু বলছিস বেশ আছি?

—সত্যি প্রণয়-মামা, সত্যি বেশ আছি! কলকাতার ছায়া কি আর আছে? সে মরে গেছে, এখন যে আছে সে এই ভূতের দেশের ছায়া।

—ও সব কোন কথা আমি শুনব না। যেতেই হবে, চল। বলিয়া খপ করিয়া ছায়ার একটা হাত ধরিয়া ফেলিলেন।

ছায়া কিছু মাত্র বলপ্রয়োগ না করিয়াও হাতটি ছাড়াইয়া লইয়া ধীর-কণ্ঠে বলিল, প্রণয়-মামা, তুমি যাও।

তাঁহার আরক্ত মুখ, ঘূর্ণিত নয়ন, তীক্ষ্ণ তীব্র নিঃশ্বাস, স্ফীত স্কন্ধ, তাঁহার দ্রুত বক্ষস্পন্দন দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্য ছায়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। আবার মুহূর্ত্ত মধ্যেই আপনাকে সংযত করিয়া লইল।

ছায়া বাহিরের দিকে চাহিয়া পরেশকে ডাকিয়া বলিল, ঠাকুরপো, মাকে বল, প্রণয়-মামা যাচ্ছেন, তাঁকে নমস্কার করবেন। দরজার পাশে এসে দাঁড়াতে বল।

পরেশ এক মিনিট পরে বলিল, বৌদিদি, মা এসেছেন।

প্রণয় না দাঁড়াইলেও, ছায়া বলিল, মা, প্রণয়-মামা প্রণাম করছেন।

পরেশ বলিল, মা আশীর্ব্বাদ করছেন, বৌদিদি।

প্রণয় তখনও নীরবে বসিয়া ছিলেন; ছায়া নিম্নস্বরে বলিল, আর দেরী ক'র না প্রণয়-মামা!

প্রণয় রাগে ফুলিতেছিলেন। এরূপ অবস্থায় দংশন করাই স্বাভাবিক। বলিলেন, তুমি কি কোন দিন একলা একলা আমার সঙ্গে রাত্রে গড়ের মাঠে মোটরে বেড়াওনি ছায়া? আজ হঠাৎ ন্যাকামী করছ যে বড়!

ছায়া হাসিয়া ফেলিল, বলিল, ন্যাকামী নয় গো মশাই, নয়। এটা যেমন কলকাতা নয়, এ ছায়াও তেমনই সে ছায়া নয়। হাকিম লোক, এটা বোঝ না কেন ?

প্রণয় জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গবৎ কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। ছায়া সমস্ত উত্তাপ ঝাড়িয়া ফেলিয়া সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়া বলিল, আমায় ক্ষমা কর প্রণয় মামা।

প্রণয় ফিরিয়া চাহিলেন; আশার ভরসায় তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল। ছায়া বলিল, কড়া কথা বলে ফেলেছি, তার জন্যে মাপ চাইছি। প্রণয় মুখ ফিরাইয়া মোটরের দ্বার খুলিয়া ফেলিলেন।

মোটর ঘিরিয়া এক রাশ ছেলে কলরব করিতেছিল, প্রণয় ইংরাজী গালাগালসহ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে তাহারা যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। তিনি গাড়ীতে উঠিয়া ষ্টার্ট দিলেন।

ছায়া জিজ্ঞাসা করিল, প্রণয়-মামা, ইন্দুদের খবর জান ?

প্রণয় কি ভাবিলেন কে জানে। বলিলেন, জানবার দরকার দেখি নে।

—বিমল দার ?

—কে বিমল দা ? ওঃ, সেই মেয়েটার লাভার! 'রোগস্' (সব বদমাস্) !

গাড়ী চলিয়া গেল।

পরেশ প্রকাশ হইয়া বলিল, বড্ড রাগী লোক উনি, না বৌদিদি ?

ছায়া হাসিয়া বলিল, সাহেবী পোষাক পরলেই লোকের রাগ বাড়ে ভাই।

পরেশ চিন্তা করিয়া বলিল, দাদা যদি বিলেত থেকে সাহেবী পোষাক পরে আসেন?

—আমি আগে ধুতি পরাব, তবে অন্য কথা!—বলিয়া হাসিয়া, পরম স্নেহে দেবরটির গলা জড়াইয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

জজসাহেবের চিঠি পড়িয়া ডানকান্ সাহেব মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়া বিমলকে কহিলেন, তুমি এম-এ, বি-এল পাশ করিয়া কৃষিকার্য্যে অনুরাগী হইয়াছ ইহা অতীব সুখের বিষয়। তুমি যে-ভদ্র-লোকের পত্র আনিয়াছ, তিনি আমার বিশেষ উপকারী সুহৃদ। তাঁহার অনুরোধ রাখিতে পারিলে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিব। তুমি আমার কাছে অকপটে বল, কৃষিকার্য্যে যেরূপ কায়িক শ্রম করিতে হয়, তাহা কি তুমি পারিবে? আরও এক কথা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যেরূপ কায়িক শ্রমকে ঘৃণা করেন ও কায়িক শ্রমজীবীদের নিম্নস্তরের লোক ভাবিয়া অপাংক্তেয় করিয়া রাখেন, তুমি কি সেই অভি-মান ও সংস্কার দূর করিতে পারিয়াছ? শুনিয়া সুখী হইলাম, তোমার শিক্ষাভিমান নাই এবং তোমার মনও কুসংস্কারাচ্ছন্ন নহে। কিন্তু আরও কথা আছে। তুমি হয়ত জান না, বর্ত্তমানে তোমাদের দেশে কৃষিকার্য্যের এমনই দুরবস্থা যে, যাহারা জাত-কৃষক, কৃষিকার্য্যে তাহাদেরই উদরে অন্নের

সংস্থান হইতেছে না। তাহাদের অভাব সামান্য, আকাঙ্ক্ষা অল্প, প্রয়োজনও যৎসামান্য, তবুও তাহারা তাহাদের অভাব, আকাঙ্ক্ষা ও নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সংস্থান করিতে পারিতেছে না। কৃষির এই দুরবস্থায় ভদ্র-সন্তানেরা তাহাদের অভাব-মোচনের উপায় কৃষিকার্য্য হইতে করিতে পারিবে বলিয়া আমার মনে হয় না।

"যদি বল, আমি এ কায কেন করিতেছি, আমি তাহারও উত্তর দিতেছি। তুমি বোধ হয় জান না, আমি গবর্ণমেণ্টের চাকরী করিতাম, মাহিনা মোটা ছিল, এখন যাহা পেন্সন পাই, তাহাতে আমার একার সংসার বেশ স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়। স্ত্রী স্বর্গে গিয়াছেন, একটি মাত্র পুত্র জার্ম্মাণ যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছে; দুইটি কন্যা ছিল, তাহারা তাহাদের স্বামী-পুত্র লইয়া উদরান্নের চেষ্টায় কখনও ভারতে, কখনও চায়নায়, কখনও অষ্ট্রেলিয়ায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দেশে আমার ঘর-বাড়ী নাই, আত্মীয়-স্বজনও নাই; বুড়া হইয়াছি, আঠার বৎসর বয়সে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলাম, আটষট্টি বৎসর বয়স হইয়াছে, পঞ্চাশ বৎসর ভারতবর্ষে—বাঙ্গালাদেশে কাটাইয়াছি, এই দেশকেই ভাল বাসিয়াছি, এ দেশও আমায় ভাল বাসিয়াছে; এর জল-হাওয়া বুড়া হাড়ে বেশ সহ্য হইয়াছে, এ দেশেই থাকিয়া গিয়াছি। পেন্সন লইয়া যদি চুপ-চাপ বসিয়া থাকিতাম, বাতে ধরিত, অসুখে পড়িতাম, হয় ত বা অসময়ে মারা যাইতাম। সমস্ত জীবনটা হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটিয়াছি, এখন একেবারে নিষ্কর্ম্মা থাকিতেও পারিব না ভাবিয়া সামান্য যা-কিছু সঞ্চয় ছিল তাহা দিয়া সুন্দরবনে জমি কিনিয়া চাষ করিতে লাগিয়া গেলাম। দশ বৎসর এই কাজ করিতেছি, লাভ যে কিছু না হইতেছে তা'ও নয়; তার উপর পেন্সন আছে, একলা লোক,

বেশ চলিয়া যায়। বৎসরের শেষে আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ করিয়া যাহা আমার লাভ হয়, অর্থাৎ যাহা উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা এখানকার গরীব চাষা-ভূষাদের বীজ-ধানে, বস্ত্রে খরচ করি। এদেশের গরীব শ্রমজীবীরা বড় ভাল, বড় সরল। আমি তাহাদের কতটুকু উপকারই বা করিতে পারি, তাহারা আমাকে পিতৃ-সম্বোধন করে। দেখ, আমি যদি পাদ্রী হইতাম, এই পাঁচ সাত শত বাঙ্গালী-হিন্দু-কৃষক-পরিবারকে একদিনে যীশুখৃষ্টের উপাসক করিয়া ফেলিতে পারিতাম। দুঃখের বিষয় আমি পাদ্রী নহি। সেই জন্যই হিন্দুধর্ম্মটা এ-যাত্রা এখানে বাঁচিয়া রহিল।"

এই বলিয়া সাহেব হাসিলেন।

"তুমি ভাবিও না আমি তোমাকে একেবারেই হতাশ করিয়া দিতেছি। আদৌ তাহা নহে। তবে সকল বিষয়ের সহিত আমি তোমায় পরিচিত করাইতে চাই। সব শুনিয়া কৃষিকার্য্যে অবহিত হইলে, আমি সানন্দে তোমাকে আমার সঙ্গী ও সহকর্ম্মী করিয়া লইব। আগেও অনেক বাঙ্গালী যুবক আমার কাছে আসিয়াছে, তাহাদেরও সব দেখাইয়াছি, বুঝাইয়াছি, শুনিয়া তাহারা পলায়ন করিয়াছে। তাহাদের বিরস আনন, পাণ্ডুবর্ণ দেহ দেখিয়া আমার কত কষ্ট হইয়াছে, তাহা বলিবার নয়; কিন্তু কি করিব বল? মোটা মাহিনা দিয়া কর্ম্মচারী রাখিবার সামর্থ্য আমার কৈ? আমি আশা করি, তুমি পূর্ব্ববর্ত্তিগণকে মহাজন ভাবিবে না এবং তাহাদের অনুসৃত পথকেই একমাত্র পথ বিবেচনা করিয়া বৃদ্ধকে অভিসম্পাত দিয়া চলিয়া যাইবে না।

"কাজে নামিয়া দেখিলাম, দেশের শিক্ষার আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত না হইলে দেশের অবস্থা উন্নত হইবে না। তোমাদের মধ্যে অনেকে আইন

শিখিয়াছ, বিজ্ঞান শিখিয়াছ, সাহিত্য শিখিয়াছ, কিন্তু চাকরী না পাইলে তোমাদের সমস্ত বিদ্যা নিষ্ফল। গবর্ণমেণ্ট তাহা দেখিতেছেন, তোমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তারাও তাহা দেখিতেছেন; তবু যে তাঁহারা শিক্ষার ধারা পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টিত হইতেছেন না কেন, তাহা আমি জানি না। আমাকে যদি এক দিনের জন্য শিক্ষাবিভাগের হিটলার কি মুসোলিনী করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমি কি করিব জান? আমি প্রথমেই তোমাদের আইন-বিদ্যালয় ও বিজ্ঞান-বিদ্যালয়গুলির দ্বারে 'টু লেট' (To Let) বাড়ী-ভাড়ার লেবেল আঁটিয়া দিব। তুমি হাসিও না, আমি বলিতেছি, ভারতের মুক্তি কৃষিতে; কৃষি ছাড়া ভারতের মুক্তি নাই। তবে কৃষি এখন যে ভাবে চলিতেছে, সে ভাবে নয়।

"আমি আগেই বলিয়াছি, আমাকে তোমরা হের হিটলার বা সিনর মুসোলিনী করিয়া দাও, আমি আদেশ দিব, সরকার ও দেশের লোক মিলিয়া যত নদ-নদী আছে, সব কাট, সব নদ-নদীতে সারা বৎসর যাহাতে জল থাকে, তাহা কর। নদীর জলের রসনা পাইলে জমির উর্ব্বরাশক্তি কখনও বাড়িতে পারে না। আজ সমগ্র দেশের চাষীর এই যে দারুণ দুর্দ্দশা, জমির উৎপাদিকাশক্তি কমিয়াছে বলিয়াই না তাহা হইয়াছে? আমার তৃতীয় 'ফারমান'—জমি হইতে খনিজ পদার্থসমূহ তোলা বন্ধ করিতে হইবে। কয়লায় আমাদের কাজ কি! দেশে বন-জঙ্গলের অভাব নাই, জ্বালানী কাঠের অভাব হইবে না। কি কাজ গাদা গাদা লোহার? লোহার কড়ি-বরগা দিয়া বাড়ী তৈয়ার না করিলেও চলিবে। সকলকে আমার মত ফাঁকা কুঁড়ে-ঘরে বাস করিতে হইবে; তাহা হইলে অসুখ-বিসুখ কম হইবে। তুমি বিশ্বাস করিবে কি না জানি না, দশ বছর এই কুঁড়ে ঘরে

বাস করিয়া আমি যেরূপ অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য উপভোগ করিতেছি, জীবনে আর কোন দিন তাহা করি নাই। খনি হইতে কেরোসিন, পেট্রোল তুলিবারই বা কি প্রয়োজন! রেড়ীর তৈলে কি ঘরের অন্ধকার ঘুচে না! রায়, তুমি কি আমায় উন্মাদ ভাবিতেছ? না! ধন্যবাদ। অবশ্য উন্মাদ বলিলেও আমি রাগ করিব না। সত্যই, এদেশের অসামান্য possibilities আর লোকের ঔদাসীন্য ভাবিলে আমার মাথা গরম হইয়া উঠে, আমি উন্মাদ হইয়া যাই। এদেশের মত possibilities আর কোনও দেশে ছিল না, আজও নাই। এস, আমি তোমাকে আরও ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিই।

"এই ম্যাপ—ভারতের মানচিত্র। এই তোমার বাঙ্গালা দেশ। কত নদী দেখিতেছ? নদীগুলির উৎপত্তি-স্থল, হিমালয়। হিমালয়-সঞ্চিত বৃষ্টির জলধারা বুকে লইয়া নদীগুলি বাঙ্গালা দেশকে চিরশস্যশালিনী করিয়াছিল। তাই বাঙ্গালাদেশ ভারতের, আর ভারত সারা জগতের নিকট অন্নপূর্ণা হইয়াছিল। কালে নদীগুলি শুষ্ক, হাজিয়া-মজিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে, কৃষির সঙ্গে দেশও 'কুকুরে গিয়াছে' (gone to dogs)।"

একটি হৃষ্টপুষ্টকায় দেশী কুকুর সাহেবের চেয়ারের পাশে বসিয়া ঝিমাইতেছিল, dog শব্দটি কানে যাইবামাত্র তাহার কান দুইটা খাড়া হইয়া উঠিল, সে-ও দাঁড়াইয়া উঠিল। সাহেব কুকুরটিকে জানুর কাছে টানিয়া লইয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া আবার বলিতে লাগিলেন।

"তোমরা আমাকে ডিক্টেটার করিতে রাজী আছ? যদি রাজী থাক, বল, আমিও অঙ্গীকার করিতেছি, বিশ বৎসরের মধ্যে দেশের অন্য রূপ করিয়া দিব। তবে গোড়াতেই বলিয়া রাখি, সকলকে কৃষক হইতে

হইবে। তোমাদের দেশে কৃষক হওয়া আগে ত নিন্দার ছিল না। আমার এক বাঙ্গালী বন্ধুর কাছে শুনিয়াছি, অযোধ্যার রাণী, সীতার বাবা রাজ জনকও নিজে হল কর্ষণ করিতেন। ইহা কি সত্য নয়? বোধ হয় আমরা আমাদের দেশ হইতে যে শিক্ষা ও সভ্যতা আনিলাম, তাহারই সঙ্গে তোমাদের বিকৃত অভিমান জাগিল।

"থাক্, বাজে কথা অনেক হইল। এবার কাজের কথা হউক। তুমি এখানে থাকিবে?"

দেশব্যাপী দিগন্তবিস্তৃত তমসাবৃত আকাশের একপ্রান্তে রক্তিম অরুণাভা পরিদৃশ্যমান হইতেছিল, বিমল যেন তাহারই পানে চাহিয়া বিমুগ্ধ হইয়া বসিয়া ছিল। সাহেবের প্রশ্নে সচকিত হইয়া বলিল,—থাকিব।

—বেশ। তোমায় আমি চাকরী দিব না, দিতে পারিব না, কাজেই মাহিনার কথা উঠিবে না। তবে তোমার যখন যা দরকার, তাহা তুমি পাইবে। রায়, তুমি বিবাহিত?

—আজও নয়।

—বিবাহ করিবে না?

—করিব।

—নাই বা করিলে?

—আমাদের ধর্ম্মে গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। শুধু তাই নয়, আমার মা আছেন, তাঁহার মতও আমার মত। তিনি চান, আমি এখনই বিবাহ করি।

—খাওয়াইবে কি?

—নিজে যাহা খাইব।

—ঐখানে তোমার সঙ্গে আমার মিলিবে না। যথেষ্ট বিত্তশালী না হইয়া বিবাহ করা আমরা ঘোরতর অন্যায় মনে করি।

বিমলকে নীরব দেখিয়া, সাহেব বলিলেন, নিজে দুঃখ-কষ্ট করিতে পারি, কায়ক্লেশে জীবন কাটাইতেও পারি, কিন্তু যে সরলা সুশীলা নারীটি আমার জীবনের সঙ্গিনী হইয়া আসিবে, তাহাকে কষ্ট দিবার, দুঃখ দিবার, কি অধিকার আমার আছে বল ত? ইহা বোধ হয় তুমিও স্বীকার করিবে, নারীদের সখ অধিক, আকাঙ্ক্ষাও অধিক, তোমার অর্থাভাব জন্য তুমি যদি তাহার কোনটিই পূরণ না করিতে পরে, সে কি সুখী হইবে?

বিমল সাহেবের প্রশ্নের উত্তর দিল না দেখিয়া হাসিয়া তিনি আবার বলিলেন, আমি বুঝিতেছি, বিবাহ করিবার জন্য তুমি লালায়িত। তোমাদের সমাজে ত পূর্ব্বরাগ অনুরাগ প্রভৃতি নাই শুনিয়াছি। তুমি যাহাকে বিবাহ করিবে, বিবাহের পূর্ব্বে তাহাকে জানিবার দেখিবার সুযোগ তোমার নিশ্চয়ই হয় নাই!

বিমল হাসিল।

—হাসিলে যে?

—আমার বেলা ঘটনা অন্যরূপ।

—অর্থাৎ তোমার সঙ্গে তোমার ভাবী-বধূর ভাব আছে? তোমাদের সমাজও উন্নত হইতেছে দেখিতেছি।

—বিমল বলিল, উন্নতি-অবনতি বুঝি না, তবে আমাদের সমাজেও ছেলেরা এখন বিত্তশালী না হইয়া বিবাহ করিতে চায় না। আগে আমাদের সমাজে এরূপ ছিল না। কৈশোর বা যৌবনের প্রারম্ভে পাঠদশাতেই পিতামাতার আদেশে ছেলেরা বিবাহ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিত না।

সাহেব বলিলেন, তাহার কারণ ছিল। তোমাদের দেশে খাদ্যের অভাব কোনদিন ছিল না। তাই শুনিয়াছি, এক-একজন পুরুষ দশ-বিশটা বিবাহ করিতেও ডরাইত না। তোমার দেশের আর্থিক দুরবস্থা মোচন কর, দেখিবে বিবাহ সম্বন্ধে আবার সেই পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া আসিবে। 'পলিগেমী'র প্লাবনে তোমরা সানন্দে ভাসিয়া বেড়াইবে!

সাহেব এক মিনিট থামিয়া পুনরায় বলিলেন, দেখ রায়, তোমাদের এই দেশকে আমি নিজের করিয়া লইয়াছি, আমার মনে হয়, এই দেশও আমাকে আপন করিয়া লইয়াছে! এখন এই দেশ ও আমার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে—দেশের উন্নতিতে আমার উন্নতি, দেশের অবনতিতে আমার অবনতি। আমি সেই ভাব লইয়াই সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হইতে চাই। আমার সে কাজে তোমার মত তরুণ কর্ম্মীকে সহযোগী রূপে পাইলে আমার আনন্দের সীমা থাকিবে না। তুমি আমাকে কথা দিয়াছ, আমার সঙ্গে কাজ করিবে। কবে হইতে যোগদান করিবে বল?

বিমল বলিল, আমি দুই তিন দিনের মধ্যে আসিব। কলিকাতায় আমার একটু বিশেষ দরকার আছে—

সাহেব বলিলেন, প্রণয়িনীর নিকট বিদায় লইতে হইবে ত?

বিমল হাসিল, বলিল, কতকটা তাই। আমার মাকেও বলিয়া আসিতে হইবে। আমরা মায়ের অনুমতি না লইয়া কোন কাজ করি না।

—তোমার মাতৃভক্তি দেখিয়া সুখী হইলাম। বালক, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন।

সাহেব হৃদ্যতার সহিত করমর্দ্দন করিয়া বিদায় দিলেন।

জীবন—যে জীবন এতদিন অনির্দ্দিষ্ট, অজানা আঁকা-বাঁকা পথে চলিতেছিল, যাহার কোন একটা স্থির লক্ষ্য ছিল না, সেই জীবন একটা গন্তব্য স্থানের সন্ধান লাভ করিতে চলিল জানিয়া অন্তরে বিমল সুখানুভব করিতেছিল। বৃদ্ধ সাহেবটির প্রতি শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে তাহার চিত্ত অবনত হইয়া পড়িয়াছিল। বিদেশী মানুষটি এই দেশের মঙ্গলচিন্তা যতখানি করিয়াছেন, দেশের কয় জন লোক তাহা করিয়াছে? দেশের কথা অল্পবিস্তর সবাই ভাবে সত্য, দেশের উন্নতি-অবনতির সঙ্গে মানুষ মাত্রেরই হৃদয়ের দুই একটি তার যোগসূত্রে বাঁধা থাকে সত্য, চিন্তাশীল সাধক না হইলে মানুষের চিন্তাধারাকে কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে কেহ পারে না, বাঁধা তারেও ঝঙ্কার উঠে না। বিদেশী সাধক তাঁহাদেরই একজন, যাঁহারা চিন্তাকে পথ দেখাইতে পারেন, তারে ঝঙ্কার দিতে পারেন।

কলিকাতায় আসিয়াই বিমল ইন্দুর পত্র পাইল। পত্র ক্ষুদ্র, এইরূপ :—

আমরা শুক্রবার সকালে সেই একজাবসন দেখিতে যাইব।

ইন্দু।

একজিবিসন-প্রাঙ্গণে সাক্ষাৎ হইল। ক্ষুণা নাগরদোলায় দুলিতে গেল। বলিয়া গেল. পুরা একটি ঘণ্টা দুলিবে। ইন্দু বলিল, এইবার বল।

—কি বলব?

—কবে আমার তোমার কাছে নিয়ে যাবে?

বিমল নীরব।

ইন্দু বলিল, মা যে কি কাণ্ড করছেন কি বলব! রোজ পাঁচ সাত

দল লোক আমায় দেখতে আসছে, ঘটক-ঘটকীর ভিড়ে বাড়ীতে তেষ্ঠান দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ আর আমার সহ্য হয় না। কাল একজনরা দেখে গেছে, তাদের সামনে বার হতে আমার চোখ দিয়ে জল পড়ে গেছল, তারা এই অগ্রাণেই দিন ঠিক করতে চায়। তার আগে—

—কিন্তু ইন্দু—

—তোমার পায়ে পড়ি, আর তুমি কিন্তু ক'র না।

—কিন্তু একটা—

—তুমি যদি বল, আমি প্রণয় বাবুকে ধরে এখনই তোমার একটা কাজের জোগাড় করি।

—না।

—কি দোষ?

—তাঁর মত লোকের কাছ থেকে উপকার নিতেও আমার প্রবৃত্তি হয় না।

—কিন্তু যদি এই অগ্রাণে তারা—

—দিন ঠিক করে? বেশ ত!

ইন্দুর বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল; বিমলের মুখের পানে চাহিয়া দেখিল—না; বিমলের সুন্দর মুখখানি অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। দেখিয়া ভরসা পাইল, আর্ত্তকরুণকণ্ঠে বলিল, কি করবে বল?

—শোন ইন্দু, তোমায় বলি। আমি সুন্দরবনে চাষের কাজ করতে যাচ্ছি; এক কথায় যাকে বলে চাষা হতে যাচ্ছি। চাষার কুঁড়ে ঘরে তোমার মত ইন্দ্রাণীকে নিয়ে যেতে আমার প্রাণ চায় না।

—ও কি? মা যে! উঃ, মা একেবারে গোয়েন্দাগিরি করেছেন।

…না না, তুমি যেও না। যা হয় আজই একটা হয়ে যাক, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি যেও না।

তাহার আর্ত্ত আকুল কণ্ঠস্বর লোক-কোলাহলে বিলীন হইয়া গেল ফিরিয়া চাহিতে বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখিল, নিকটে অথবা দূরে বিমল কোথাও নাই।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

মুহূর্ত্ত মধ্যে ইন্দুর সমস্ত মন বিষিয়া উঠিল। রোষে, ক্ষোভে, ঘৃণায়, অভিমানে মন যেমন বিরক্ত, দেহও তেমনই তিক্ত হইয়া গেল। ইহারা পুরুষ? ইহারাই পৌরুষ দেখাইয়া নারীর হৃদয় জয় করিতে চায়, নারী লাভের আশা পোষণ করে? ছিঃ ছিঃ! ইহারা যদি পুরুষ, তবে কাপুরুষ কে? তাহার এই আঠারো উনিশ বছরের জীবনভোর পুরুষ ভাবিয়া সে কি কাপুরুষকেই কামনা করিয়াছে? ঐ কাপুরুষের জন্যই সে সকলের বিরক্তির কারণ হইয়াছে, ঘরে পরে লাঞ্ছনা সহিয়াছে? এমনই কাপুরুষ সে, মা'র রোষানলে অবহেলে তাহাকে নিক্ষেপ করিয়া পুরুষ পলায়ন করিতে পারিল? পুরুষের আকর্ষণ কি এতই দুর্ব্বার যে, বাঙলা দেশের মেয়েরা এই সব পুরুষবেশী কাপুরুষকে পূজা করে, ভালবাসে? এই কাপুরুষদিগকে জীবনের সঙ্গী রূপে না পাইলে তাহাদের জীবন পঙ্গু ও অচল হইয়া পড়ে?

ইন্দুর পা দু'টি কাঁপিতেছিল। তাহার ভয় হইতেছিল, বুঝি বা পড়িয়া

যাইবে। দেহের সমস্ত শক্তি দিয়া মাটির উপরে পা দুটিকে খাড়া রাখিবার চেষ্টা করিতে করিতে তাহার দুচোখে জল আসিয়া পড়িতেছিল। কিন্তু চোখের জলের এ সময় নয়। আর, কাহার জন্য চোখের জল? সেই কাপুরুষের জন্য চোখের জল কি অপব্যয় নয়?

ইন্দু একটি বার মাত্র মাকে আসিতে দেখিয়া আর সে দিকে মুখ ফিরায় নাই; ফিরাইলে দেখিত, মা একা নহেন, তাঁহার সঙ্গে সুকেশ, সুবেশ, সুন্দর একটি যুবা পুরুষও আসিতেছিলেন।

কাছে আসিয়া মা স্নেহসিক্তস্বরে কহিলেন, এখানে একা রৌদ্রে দাঁড়িয়ে কেন ইন্দু? মাথায় যে রোদ লাগছে মা! ক্ষণা কোথায়?

—ক্ষণা নাগরদোলায় দুলছে—বলিলে বলিতে প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার কণ্ঠ অশ্রুর বাষ্পে ভরিয়া গেল।

বুঝি কয়েক বিন্দু বারি চোখের কোণেও আসিয়া পড়িয়াছিল, মা'র চোখে তাহা গোপন রহিল না। তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, ছায়ায় আয় ইন্দু, রোদে মুখচোখ তোর ঝলসে যাচ্ছে যে। বলিয়া কন্যার বাহু ধরিয়া তাহাকে একটি দোকানের ছায়ায় আনিয়া দাঁড় করাইলেন। নিজের কটিদেশ হইতে শুভ্র রেশমী রুমালখানি টানিয়া, কন্যার মুখটি তুলিয়া ধরিয়া মুছাইয়া দিলেন। ইন্দু চক্ষু মুদিয়াই ছিল, বোধ হয় চক্ষু মুদিয়া থাকিলে অশ্রুর উৎস কতকটা বাধা মানে।

মুখ মুছাইয়া, বায়ুবিক্ষিপ্ত কুন্তলচূর্ণগুলি যথাবিন্যস্ত করিয়া মা যখন আদরভরে মুখখানি হইতে হাত সরাইয়া লইলেন, ইন্দু চোখ খুলিতেই দেখিল, দুই নেত্রে প্রশংসার প্রবাহ লইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান প্রণয়কুমার! ইন্দুর কল্পনাতেও সে প্রণয়কুমারকে এ সময়ে এখানে আশা করে নাই। তবে

আশা যে করে নাই, করিতেও পারে না, সে কথাও মনে রহিল না। তাই মনে বিরুদ্ধ ভাবেরও উদয় হইল না। একটি বার মাত্র দেখিয়াই চক্ষু নামাইয়া রহিল। সেই এক দৃষ্টিতেই দেখিল, প্রণয়কুমারকে আজ বড় ম্লান, বড় বিমর্ষ দেখাইতেছে। অঙ্গের সে লাবণ্য নাই, চক্ষুর সেই দীপ্তি নাই, আননের ঔজ্জ্বল্য নাই, নিশান্তের পাণ্ডুর চন্দ্রের মত মলিন, পাংশু।

অভ্যাসমত যুক্ত কর মস্তক স্পর্শ করিল। প্রণয়কুমার ম্লান হাস্যে প্রতি-নমস্কার করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মা বলিলেন, প্রণয় মফঃস্বলে বদলী হয়ে যাচ্ছেন, তাই তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

ইন্দুর ক্লান্ত চক্ষু দুটি আপনা হইতেই প্রণয়কুমারের পানে ফিরিল। প্রণয় নীরবে অর্থহীন দৃষ্টি দিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া দিলেন মাত্র।

না জিজ্ঞাসা করা ভাল দেখায় না বলিয়া ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় বদলী হলেন?

প্রণয়কুমার বলিলেন, অনেক দূর, কুমিল্লা।

ইন্দু আবার জিজ্ঞাসা করিল, কবে যেতে হবে?

—কালই যাব।

মা এদিকে ওদিকে চাহিতে চাহিতে বলিলেন, ধিঙ্গী মেয়েটা গেল কোন্ দিকে বল্ ত?—এই অনাবশ্যক প্রশ্ন করিয়া, মা যেদিকে নাগরদোলা ঘুরিতেছিল, সেইদিকে চলিলেন। কয়েক পা গিয়া, এদিকে ফিরিয়া বলিলেন, তোরা এইখানেই থাকিস্, আমি আসছি ক্ষণাকে নিয়ে।

পায়ের কাছে ঘাস নাই, তাই শ্যামলতাও নাই। চাঁচাছোলা, শ্রীহীন

ভূখণ্ডের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ইন্দু দাঁড়াইয়া রহিল। প্রণয়কুমারও সহসা কোন কথা বলিলেন না। ইন্দুর মা যখন সম্পূর্ণ ভাবে অদৃশ্য হইয়া গেলেন, প্রণয়কুমার গাঢ় স্বরে ডাকিলেন, ইন্দু!

মুখ তুলিয়া চাহিতে ইচ্ছা হইলেও ইন্দু তাহা পারিল না, সাড়া দিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও কণ্ঠে শব্দ ফুটিল না।

প্রণয়কুমার পুনশ্চ ডাকিলেন, ইন্দু!

ইন্দু পূর্ব্ববৎ নিশ্চল, নিস্পন্দপ্রায়।

প্রণয়কুমার বলিলেন, তোমার কাছে আমি আজ ক্ষমা চাইতে এসেছি ইন্দু—কণ্ঠস্বর গাঢ়, অকৃত্রিম অনুতাপে ভরা।

ইন্দুর মনটি নড়িয়া উঠিল।

প্রণয় বলিতে লাগিলেন, অনেক অপরাধ করেছি ইন্দু, তুমি আমায় ক্ষমা কর। কত দূরে চলে যাচ্ছি, কলকাতায় আর ফিরব না, যাবার সময় তোমার ক্ষমা পেলে আমি হাল্কা মনে যেতে পারি।

ইন্দু বলিল—কলকাতায় ফিরবেন না কেন?

প্রণয় বলিলেন, যে জন্যে চলে যাচ্ছি, সেই জন্যেই ফিরব না। সে অনেক কথা, যাক্। তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি, তুমি আমায় ক্ষমা করবে বল?

—আমার কাছে ক্ষমাই বা চাইতে হবে কেন?

—তুমি যদি বল কোন অপরাধ হয় নি, তা হলে ক্ষমা চাইব না।

—অপরাধ আবার কি!

প্রণয়ের কণ্ঠস্বর প্রফুল্ল হইল। ইন্দু যদি দেখিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত, এই মুহূর্ত্তে তাহার মুখখানিতেও প্রফুল্লতা ফিরিয়া আসিয়াছে।

বলিলেন, তোমাকে ধন্যবাদ ইন্দু! এক মুহূর্ত থামিয়া পুনরায় কহিলেন, অনেক চেষ্টা করে আমি বদলী হতে পেরেছি। পরশু বদলীর অর্ডার হয়েছে, সেই থেকে কেবলই ভাবছি, তোমার কাছে ক্ষমা না চেয়ে আমি কিছুতেই যেতে পারব না। জানি যেতে পারব না, তবু দু'দিন কেবলই ভেবেছি তোমার কাছে আসব কি আসব না। যদি তুমি বিরক্ত হও, যদি তোমার ভাল না লাগে, খারাপ লাগে, এই ভেবেই দু'দিন কেটে গেছে। আজ সকালে আর থাকতে পারলুম না।. ভাবলুম, আর ত কখনই দেখা হবে না, শেষবারের মত দেখা করে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে যাই। এসে শুনলুম, তোমরা স্বদেশী একজিবিসনে এসেছ। তোমার মাকে বদলীর কথা বলেই চলে যেতে পারলাম না। ওঁকে বললুম, চলুন না, একজিবিসনে ইন্দুর সঙ্গে দেখাটা করে আসি। এসে তোমায় বিরক্ত করলুম না ত? যদিই বিরক্ত হয়ে থাক, জীবনে আর কোন দিন দেখা হবে না, কখন বিরক্ত করতে আসিব না, এই ভেবে আমার এ অপরাধও আজ ভুলে যাও ইন্দু।

নারীর চোখ, সহজেই তাহাতে জল আসিয়া পড়ে। কেন, কে জানে! অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া ইন্দু অশ্রু গোপন করিতে চেষ্টা করিল।

কতকগুলি অতিমাত্রায় কৌতূহলী লোক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহাদের লক্ষ্য করিতেছে বুঝিয়া প্রণয় বলিলেন, ঐ ছায়ায় বেঞ্চিটায় বসবে?

ইন্দু নির্মোহের মত বলিল, চলুন।

অফুরন্ত কৌতূহলের অধিকারীদিগের কৌতূহলের অবসান তথাপি হইল না। অনেকে চলিয়া গেল, অনেকে যাইতে যাইতেও দেখিতে

লাগিল, অনেকে যেমন ছিল তেমনই রহিল, অনেকে গোপনে আলোচনাও করিতে লাগিল। তবে ইহারা আর তাহাদের দেখিতে পাইল না।

প্রণয় বলিলেন, আর একটি অনুরোধ করব, রাখবে? অবশ্য ক্ষমা পেয়েছি বলেই কথাটা বলতে পারছি।

ইন্দু মুখখানি অল্প একটু তুলিয়া চাহিল।

প্রণয় বলিলেন, আমাদের কোর্ট থেকে আজ আমাকে একটা ফেয়ার-ওয়েল পার্টি দিচ্ছে। যাবে দেখতে?

ইন্দু বলিল, আমি। কেন?

প্রণয়কুমার ঈষৎ আবেগের সহিত বলিলেন, কেন-র উত্তর দেওয়া শক্ত। তবে তুমি গেলে আমার খুব ভাল লাগবে।

ইন্দু চুপ করিয়া রহিল।

প্রণয়কুমার কিয়ৎপরে কহিলেন, যাবে?

ইন্দু তথাপি নীরব।

প্রণয়কুমার বলিলেন, তোমার ইচ্ছে নেই; তবে থাক্। তাঁহার কণ্ঠস্বরে দুঃখ ও হতাশা ধ্বনিত হইল।

—আর কে যাবে?

—আমাদের বাড়ীর মেয়েরা হয় ত যাবেন, আরও অনেকে যাবেন।

—মাকে বলেছেন?

—না। তোমার মত জেনে তবে তাঁকে বলব।

—বলবেন।

প্রণয়কুমার প্রফুল্ল মুখে কহিলেন, পাঁচটায় পার্টি। বল ত আমি এসে তোমাদের নিয়ে যাব।

মা ক্ষণাকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ইন্দুকে বলিলেন, একজিবিসন দেখবি না কি রে?

—না, বড্ড রোদ।

—তবে চল্ বাড়ী যাই।

প্রণয় বলিলেন, আজ বিকেল পাঁচটায় আমাদের কোর্ট থেকে আমাকে ফেয়ারওয়েল পার্টি দিচ্ছে, আমি মনে করছি ইন্দুদের নিয়ে যাব।

মা ইন্দুর মুখের পানে চাহিয়া, বিদ্রোহের ভাব না দেখিয়া প্রসন্ন মনে কহিলেন, বেশ ত!

গেটের বাহিরে গাড়ী ছিল। প্রণয়কুমার বলিলেন, আমি সাড়ে চারটেয় আসব, ইন্দু। তোমরা তৈরী থেক।

ইন্দু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

বাড়ীতে আসিয়া মা সর্ব্বাগ্রে নামিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। ক্ষণার পরে, ইন্দু গাড়ী হইতে নামিতে উদ্যত হইলে, ড্রাইভার নিঃশব্দে হাত বাড়াইয়া ভাঁজকরা একটি কাগজ তাহার হাতে দিল।

ভাঁজ খুলিতে যে হাতের লেখা দেখা গেল, তাহাতে ইন্দুর মন আবার বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল। তথাপি পড়িতে হইল। লেখা ছিল :—

যাহার দাবীর অধিকার নাই, সে চোরের অধম। আমি চলিলাম।

চিঠিখানা শতছিন্ন করিয়া ফেলিয়া দিলেই যদি সমস্ত ব্যাপার শেষ হইত, তাহা হইলে ইন্দুর কোন দুঃখই ছিল না। কিন্তু তা হয় কই? সারাদিন সেই অক্ষর কয়টা সরীসৃপের মত তাহার মনের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইতে লাগিল। স্নানে ইচ্ছা ছিল না, শরীর খারাপ বলিয়া কাটাইয়া দিল; আহারে প্রবৃত্তি হইল না, ক্ষুধা নাই বলিয়া এড়াইয়া

গেল। সে সময়ে শহরে ইনফ্লুয়েঞ্জার খুব উপদ্রব চলিতেছিল, সংবধানের বিনাশ নাই ভাবিয়া মা'ও খাইবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিলেন না, জোর করিয়া শুধু এক বাটী গরম দুধ খাওয়াইয়া দিলেন।

ঘড়িতে তিনটা বাজিতেই মা মেয়েদের শোবার ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন। ক্ষণা ছবির বহি দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, পাতা-খোলা বহি-গুলি শয্যার উপরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; ইন্দু মোটা একখানা চাদর গায়ে দিয়া চুপ করিয়া শুইয়া ছিল, পদশব্দে চক্ষু মেলিয়া মাকে দেখিয়া আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল। মা আসিয়া তাহার কাছে বসিলেন। চাদরখানি সরাইয়া মেয়ের কপালে, বুকে, বগলের নীচে হাত দিয়া উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, এখন শরীরটা কেমন বোধ হচ্ছে রে?

—ভালই।

—কিছু খাবি?

—এখন আবার কি খাব?

মা হাসিয়া বলিলেন, কি-খাব কেন? সারাদিন ত কিছু খেলি নে। ঠাকুর দিক না খাবার-টাবার কিছু করে। খানকতক 'টোষ্ট' করে দিতে বলব, খাবি?

ইন্দু বলিল, না।

সে ঘরে ঘড়ি ছিল না। মা ভাবিতেছিলেন, হয়ত সাড়ে তিনটা বাজিয়া গেল। প্রণয় হয়ত এখনি আসিয়া পড়িবে। কিন্তু এই কথাটা মেয়েকে বলিতে যতটুকু সাহসের দরকার, সেটুকুও তাঁহার ছিল না। থাকিবেই বা কিরূপে? প্রণয়ের উপর মেয়েদের মনের ভাব জানিতে ত আর তাঁহার বাকী নাই। অথচ বেলা যে আসন্নপ্রায়, সেটিও জানাইয়া

দেওয়া দরকার। তাই নিদ্রিত ক্ষণার পানে চাহিয়া বলিলেন, ক্ষণাটা কত ঘুমুচ্ছে! চারটে বাজে, এখনও ওঠবার নাম নেই।—বলিয়া তিনি ক্ষণাকে ডাকিতে লাগিলেন।

তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, কত বাজল মা?

—দেখি। সাড়ে তিনটে হল বোধ হচ্ছে।

পাশের ঘরে গিয়া ঘড়ি দেখিয়া মা বলিলেন, তিনটে বেয়াল্লিশ।

—তা হলে দেরী আছে, নিজের মনেই কথা কয়টি বলিয়া ইন্দু আবার চাদর মুড়ি দিল।

মা পাশের ঘরে কাণ পাতিয়া রহিলেন। ইন্দু উঠিল না, তাহা বুঝিলেন; কিন্তু কোন কথাও বলিলেন না। কিছুক্ষণ পরে ঢং ঢং করিয়া চারটা বাজিল। মা বলিয়া উঠিলেন, ক্ষণা উঠল রে?

—ওঠে নি মা। দাঁড়াও আমি তুলে দিচ্ছি।

ইন্দু নিজের খাট হইতে নামিয়া, ক্ষণার খাটে গিয়া ধাক্কাধাক্কি করিয়া ক্ষণাকে তুলিয়া দিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল। স্নান-কক্ষের দ্বার খোলা ও বন্ধের শব্দ শুনিয়া মা কতকটা আশান্বিত হইলেন।

নিদ্রাভঙ্গে ক্ষণা মার কাছে গিয়া বসিলে, মা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুইও যাচ্ছিস নাকি দিদির সঙ্গে?

—কৈ, দিদি ত কিছু বলে নি!

মা হাসিয়া বলিলেন, প্রণয় ত তোকেও যেতে বলেছে।

ক্ষণা মুখখানা গোমড়া করিয়া বলিল, আমার নাম ধরে অবিশ্যি বলে নি, তবে 'ইন্দুদের' 'তোমরা' এই সব 'প্লুরাল নাম্বার' দিয়ে কথা বলেছে। ওরকম বলায় আমি যাই না।

মা হাসিলেন, বলিলেন, তুই না গেলে তার ত দুঃখের সীমা থাকবে না।

ক্ষণা রাগিয়া বলিল, আমারই যেন দুঃখ থাকবে বড়।

ক্ষণা নিঃশব্দে নীচে চলিয়া গেল।

ইন্দু ঘরে ফিরিয়াছে বুঝিয়া মা বলিলেন, ক্ষণা যাবে না কি রে?

ইন্দু কাপড় বদলাইতেছিল, বলিল, চলুক না।

মা নিশ্চিন্ত মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, ও বলছে প্রণয় ওর নাম ধরে ভাল ক'রে বলে নি, ও যাবে না।

ইন্দু হাসিয়া বলিল, তাই না কি?

মা বলিলেন, ঐ ত পোড়ারমুখী নিজে এসেছে, জিজ্ঞেস কর না।

ইন্দু ডাকিল, ক্ষণু দিদি, একবারটি শোন ত লক্ষ্মী দিদিমণি আমার।

—আদর যে আর ধরে না—বলিয়া ইন্দুর ঘরে আসিয়া ক্ষণা ক্ষণেকের তরে গালে হাত দিয়া দাঁড়াইল; তার পর বলিল, ওমা! আপনার যে সাজগোজ হয়ে গেছে দেখছি।

ইন্দু লজ্জা দমন করিয়া বলিল, তুই যাবি নে?

—তুমি বলেছ আমায়?

—যাঁর পার্টি, তিনি ত বলেছেন।

—আজ্ঞে না, যাকে তাঁর বলবার, তাকে তিনি ঠিক বলেছেন। গৌরবে বহুবচন ব্যবহার করেছেন মাত্র। শেষের কথাগুলা সে নিম্ন কণ্ঠেই কহিল।

ইন্দু বলিল, তাঁর ত কন্যেদায় নয় যে গলায় চাদর দিয়ে জোড় হাত ক'রে সবাইকে নাম ধরে-ধরে বলবেন! নে, কাপড় প'রে নে, চল।

কৃষ্ণা বলিল, উঁহুঁ। তুমি কিন্তু আজ যা সেজেছ, একেবারে 'কিলিং'।

এই সময়ে নীচে, বাগানে মোটরগাড়ীর সুগম্ভীর ধ্বনি উত্থিত হইল। কৃষ্ণা খড়খড়ির ফাঁক দিয়া দেখিয়া লইয়া বলিল, এসেছেন, হাকিম সাহেব এসেছেন।

—তুই যাবি না ত?

—না, না, না। 'বাট্ আই উইশ্ ইউ সাকসেস্'

—তা হ'লে আমি যাব না, যা!

—যাব না বললেই হ'ল আর কি! ঐ দেখ—

চেষ্টা করিয়া মনকে যতখানি শান্ত, সংযত ও শুদ্ধ রাখিতে পারা যায়, ইন্দু তাহাই পারিয়াছিল। তাহা না পারিলে, আবার সেই মোটরে, সেই লোকের পার্শ্বে বসিয়া কখনই সে যাইতে পারিত না। গড়ের মাঠের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে পুরাতন কথাগুলা যে মনে ভাসিয়া উঠিতেছিল না তাহা নহে; চেষ্টা করিয়াই সে ভাবগুলিকে দূর করিতে হইতেছিল।

প্রণয়ও আজ বিশেষরূপ শান্ত। পথে কথাবার্ত্তা হইল না বলিলেও হয়। প্রণয় এক মনে গাড়ী চালাইতেছে, আর পার্শ্বোপবিষ্টা নারী নিজের মনকে কেবলই বাঁধিতেছে।

বিরাট সামিয়ানার তলে বিরাট সভা। প্রথমে বিদায়-সঙ্গীত গীত হইল। তারপর দুটি সুন্দর মেয়ে দুই গাছি পুষ্পমাল্য আনিয়া প্রণয়ের গলায় দুলাইয়া দিল। আবার একটি সঙ্গীত, তারপর সভাপতির বক্তৃতা ও অভিনন্দন পাঠ। একটি সুদৃশ্য, সুবর্ণচিত্রিত রৌপ্যাধারে রক্ষিত অভিনন্দন-পত্রখানি সভাপতি প্রণয়কুমারের হাতে দিলেন; প্রণয় সেখানিকে মাথায় স্পর্শ করাইয়া টেবিলের উপর রাখিলেন।

এইবার তাঁহাকে জবাব দিতে হইবে। বলিতে বলিতে প্রণয়ের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল; এক সময়ে মনে হইল তাঁহার চোখে যেন জল আসিয়া পড়িতেছে; পা দুটি কাঁপিতেছে; হঠাৎ একসময় "আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন" করুণকণ্ঠে এই কথা কয়টি বলিয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন। বিপুল করধ্বনিতে সভাস্থল মুখরিত হইয়া উঠিল।

বক্তার পর বক্তা উঠিয়া, প্রণয়ের সদাশয়তার, আশ্রিত-বাৎসল্যের, সচ্চরিত্রতার, মহানুভবতার কথা বিঘোষিত করিয়া তাঁহার বদলীতে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একজন বৃদ্ধ—উকীল অথবা মোক্তার, মাথায় সেকেলে সামলা, গলায় পাকান চাদর—বক্তৃতা করিতে উঠিয়া প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন! প্রণয়কুমার বয়সে তরুণ হইলেও তিনি যে কর্ম্মচারী ও কর্ম্মিবৃন্দের পিতা-মাতা-স্বরূপ ছিলেন এবং তিনি চলিয়া গেলে তাহারা যে একান্ত অনাথ হইবে, অতিশয় ভাবাবেগের সহিত কথাগুলা বলিতে বলিতে বৃদ্ধ ভদ্র ব্যক্তিটি স্থান-কাল-পাত্র ভুলিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

সভান্তে চা ও নানাবিধ মিষ্টান্ন বিতরিত হইল। ইন্দু মেয়েদের সারিতে এক পাশে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, প্রণয়কুমার তাহার কাছে আসিয়া বলিলেন, কিছু খাবে ইন্দু?

ইন্দু তন্ময় হইয়া ছিল। যে লোকটির উচ্চ গুণগ্রামের প্রশংসা করি বক্তার পর বক্তা পুষ্পাঞ্জলি দিতেছিল, সেই লোককে একবারে তাহারই সম্মুখে দেখিয়া সে মহা গৌরববোধে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিল।

প্রণয়কুমার প্রীতিভরে পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, কিছু খাবে ত?

ইন্দু না বলিতে পারিল না; হাঁ বলিতেও পারিল না। ভিতরটা তাহার

ভরিয়া গিয়াছিল, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ইহাকে তাহার সম্মতি মনে করিয়া প্রণয় বলিলেন, এস আমার সঙ্গে। আমরা ঐ টেবিলটায় বসি।

ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

প্রণয় বলিলেন, কিছু খেতে হবে যে!

চারিদিকে অগণিত পুরুষ আর দশদিকে প্রসারিত অগণিত তাহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তাহারই মাঝে বসিয়া খাইতে হইবে শুনিয়া ইন্দু পিছাইয়া গেল; বলিল, না, না, আমি কিছু খাব না।

—একটু চা?

—এখানে না।

প্রণয় তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, আচ্ছা চল, আমরা অন্য কোথাও বসে চা খেয়ে নেব। এস তুমি।

প্রণয় সভাপতি ও অন্য দুই চারি জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নিকট বিদায় লইয়া বাহিরের দিকে চলিলেন, ইন্দু তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া চলিল।

গাড়ীর ভিতরটা অভিনন্দন-পত্রাধারে, পুষ্পমাল্যে, পুষ্প-স্তবকে ভরিয়া গিয়াছিল। তাহারই মধ্য হইতে গুটি কতক স্তবক লইয়া নিকটে দণ্ডায়মান ছেলেমেয়েগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া, প্রণয় ইন্দুকে গাড়ীতে উঠাইয়া, নিজে উঠিয়া বসিলেন। তখনও স্তবগানের ও গুঞ্জনের অবসান হয় নাই। বার বার নমস্কার করিয়া কোন মতে এড়াইয়া, গাড়ী চালাইয়া দেওয়া হইল। গাড়ীতে আবার চুপচাপ।

গঙ্গার তীরে, নদীর জলে ভাসমান একটা জেটির উপরকার ক্ষুদ্র হোটেলের বারান্দায় বসিয়া উভয়ে চা পান করিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া

গিয়াছে। পরপারের কলগুলিতে লক্ষ দীপ জ্বলিয়া উঠিতেছে, গঙ্গার বুকে আলোকিত ষ্টীমারগুলা ছুটাছুটি করিতেছে, নদীর জলেও মাঝে মাঝে রঙীণ আলো ভাসিয়া উঠিতেছে,—জ্বলিতেছে, নিবিতেছে। দৃশ্য মনোরম। ইন্দু একাগ্রদৃষ্টিতে নদীর তরঙ্গায়িত কাল জলের পানে চাহিয়া বসিয়া ছিল।

প্রণয় সসঙ্কোচে কহিলেন, তোমার খারাপ লাগে নি ত ইন্দু?

—কি?

—আজকের সভা?

ইন্দু উচ্ছ্বাসভরে বলিল, না, না, আমার খুব ভাল লেগেছে।

সত্য সত্যই তাহার খুব ভাল লাগিয়াছিল। অভিনন্দন-সভাদিতে অতিশয়োক্তির যে প্রবল বন্যা বহিয়া যায়, ইহা ত সে জানে না। অভিনন্দন ও শোক-সভাগুলিতে নীর ত্যজিয়া যে ক্ষীরের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে হয়, ইহা সে কিরূপে জানিবে? তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, প্রণয়বাবুর মত উচ্চহৃদয়, মহৎ লোকের সম্বন্ধে কি ভ্রান্ত ধারণাই না সে এত কাল ধরিয়া পোষণ করিয়াছে।

প্রণয়কুমার উচ্ছ্বাসভরে বলিলেন, তোমার ভাল লেগেছে শুনে আমার যে কত আনন্দ হ'ল তোমাকে তা আমি বুঝাতে পারব না।—পর মুহূর্ত্তেই নিজেকে সংযত করিয়া বলিলেন, চল, তোমায় বাড়ী রেখে আসি।

পথে আবার সেই নীরবতা। এবার নীরবতা ইন্দুর ভাল লাগিতেছিল না। সে প্রণয়ের প্রতীক্ষা করিতেছিল, প্রণয় কোনও প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলে ইন্দু সানন্দে তাহাতে যোগ দিত।

কিন্তু প্রণয় কোন প্রসঙ্গই তুলিলেন না। গঙ্গার ধারের ষ্ট্র্যাণ্ড শেষ

হইল, গড়ের মাঠের আলো-আঁধারের পথ ধরিয়া গাড়ী অবিরাম গতিতে ছুটিয়া চলিল, কত গাড়ীর ভিতরে কত আলো, কত হাস্যফুল্ল মধুর মুখ, কত আনন্দস্ফীত বক্ষ অতিক্রম করিয়া তাহাদের গাড়ী চলিল, কিন্তু সে কি নিদারুণ কঠোর ব্রতনিষ্ঠা,—নিরবচ্ছিন্ন মৌনতার অবসান হইল না। প্রণয়ের কথা আমরা বলিতে পারিব না, কিন্তু বক্ষ-মথিত-করা কত নিঃশ্বাস ইন্দু যে সযত্নে দমন করিয়াছে, তাহা সে-ই জানে!

বাড়ীর বাহিরে গাড়ী থামাইয়া প্রণয় বলিলেন, তুমি ক্ষমা করেছ জেনেও একটা কথা না ব'লে পারছি না ইন্দু। তোমায় কখন কখন বিরক্ত না করেছি তা নয়; কিন্তু কেন বিরক্ত করেছি, তা যদি জানতে!—কথাটা তিনি শেষ করিলেন না। বাম হস্তে গাড়ীর দ্বার খুলিতে খুলিতে বলিলেন, একটি অনুরোধ করব? রাখবে?

'না' বলিবার সাধ্য ছিল না; ইন্দু বলিল, বলুন।

—আমার শত দোষ ত্রুটী আছে আমি জানি; তবু যখন ক্ষমা করেছ বলেছ, যখন আমি এদেশে থাকব না, আসব না, তখনও মনের একটা কোণে একটু স্থান দেবে কি?

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া ইন্দু বলিল, আমি এখানেই নামব না কি? আপনি ভিতরে আসবেন না?

—আজ আর নয়। বাইরে একটা ডিনার আছে, ৮টা বাজে!

—কাল একবার আসবেন?

—আসব?

ইন্দু হাসিয়া বলিল, বা রে! যাবার আগে একবার আসবেন না?

প্রণয় উল্লসিত হইয়া কহিলেন, বেশ, আসব।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া হেরম্বনাথ নিদ্রার উপক্রম করিতেছিলেন, গৃহিণী আসিয়া আলো জ্বালিলেন; মশারির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিলেন, মশারির ভিতর মশা ঢুকেছে না কি গো? কাল কাল ওগুলো কি বল ত?

হেরম্বনাথ চক্ষুরুন্মীলন করিলেন না; মনে মনে হাসিয়া কহিলেন, মশাই হবে বোধ হয়। দেখ না!

গৃহিণী খাটের উপর উঠিয়া বসিয়া হেরম্বনাথকে একটি ধাক্কা দিয়া বলিলেন, চোখ চেয়ে দেখ-ই না গো। বোধহয়-এ দরকার কি!

হেরম্বনাথ চক্ষু মেলিলেন, চোখে চোখ মিলিল, উভয়ের মুখেই হাসি দেখা দিল। হাসির কোন অর্থ ছিল কি ছিল না তাহা কে বলিতে পারে? বুড়া-বুড়ীরা এমন অনর্থক হাসে কি?—কে জানে হাসে কি না! আমি বুড়া নহি, বুড়া-বুড়ীর মনের কথা কিরূপে জানিব? হেরম্বনাথ হাস্যমুখে কহিলেন, শয়নে পদ্মনাভটা কি তবে এখানেই হবে?

—আহা! রঙ্গ দেখে আর বাঁচিনে!—বলিয়া গৃহিণী ছোট-খাট আর একটি ধাক্কা দিলেন। তারপর কর্ত্তাকে খানিকটা সরাইয়া দিয়া পাশটিতে শয়ন করিলেন।

হেরম্বনাথ বলিলেন, তা বেশ। এখন দয়া করে আলোটা নাবিয়ে দিলে একটু ঘুমিয়ে বাঁচি। মহেন্দরটা আজ যা হারান্ হেরেছে, তিনদিন তার গায়ের ব্যথা মরবে না। চার বাজী খেলেছে, চারই মাৎ।

গৃহিণী বলিলেন, বলি, মাৎটা করলে কে?

হেরম্বনাথ বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া কহিলেন, কেন, আমি!

—তুমি খুব বীর!—বলিয়া হাত বাড়াইয়া সুইচ টিপিয়া আলো নিবাইয়া দিয়া, গৃহিণী বলিলেন, শোন, ঘুম পরে হলেও হবে, এখন বিশেষ কথা আছে।

—এই রাত্রে! দোহাই প্রি—

গৃহিণী তাড়াতাড়ি কর্ত্তার মুখের উপর হাত চাপা দিয়া বলিলেন, থাক্ থাক্, খুব আদর হয়েছে।

হেরম্বনাথ গৃহিণীর হাত সরাইয়া দিয়া বলিলেন, কেন লাবু, তোমায় আমি আদর করি নে? শুনবে তবে, প্রিয়ে, প্রিয়তমা, প্রাণেশ্বরী—বলিতে বলিতে হেরম্বনাথ সত্যই একটু হায়-রে-সেকালে-আচরিত আদর করিলেন। বয়স যতই কেন হোক্ না, লাবু তাহাতে অসন্তুষ্ট হইলেন, একথা যদি কেহ মনে করেন, তবে ভুল হইবে। কক্ষে আলোক থাকিলে একটুখানি লজ্জা হয়ত অনুভব করিতেন।

—শোন, ভগবান বোধ হয় এতদিনে মুখ তুলে চেয়েছেন।

একটু আদর করিয়া কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইয়াছে ভাবিয়া কর্ত্তা নিদ্রাদেবীর তপস্যায় মন দিতেছিলেন, বলিলেন, ভগবান মঙ্গলময়, চিরদিনই মুখ তুলে চেয়ে আছেন।

—না গো না, তা বলি নি।

—ওঃ, তা নয়!—হেরম্বনাথ পাশ ফিরিবার উপক্রম করিতেছিলেন, গৃহিণী বাধা দিয়া খুব চুপে চুপে, বিশেষ গোপনীয় কথার ভঙ্গীতে বলিলেন, এখন প্রণয়কে ইন্দুর ভাল লেগেছে।

হেরম্বনাথ শঙ্কিত, নীরব।

—প্রণয় আজ ওকে পার্টিতে নিয়ে গেছল। এসে পর্য্যন্ত ইন্দুর মুখে প্রণয়ের প্রশংসা ছাড়া অন্য কথাই নেই।

মহেন্দ্রকে মাৎ করিবার যে আনন্দে হেরম্বনাথ মশগুল ছিলেন, মুহূর্ত্ত-মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটিল।

গৃহিণী বলিলেন, ইন্দু কাল দুপুরে প্রণয়কে খেতে বলেছে। ও কি, তুমি ঘুমুচ্ছ নাকি?—বেশ লোক ত তুমি!

ঘুম! হায় রে, ত্রিসীমানা ছাড়িয়া ঘুম কোথায় পলায়ন করিয়াছে তার ঠিকানাই নাই। কিন্তু সে কথা বলিলেন না, চুপ করিয়াই রহিলেন।

—জান ত! আগে আগে প্রণয়ের নামে ও জ্বলে উঠত, দু'চক্ষু পেতে তাকে দেখতে পারিত না। আজ হঠাৎ তাকেই খাওয়াবার কথা মনে হ'ল, বলি, বুঝছ?

হেরম্বনাথ কবুল করিয়া বলিলেন, না।

গৃহিণী ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া, দিলেন আলো জ্বালিয়া। তারপর বলিলেন, কি বুঝছ না, তাই বল।

হেরম্বনাথ তর্কে প্রবৃত্ত না হইয়াই বলিলেন, কাল বলব।

—কাল কেন, এখনই বল।

হেরম্বনাথ মুস্কিলে পড়িয়া গেলেন। এমন জানিলে 'বুঝি-না' না-বলিয়া 'বুঝি' বলিলেই হইত ভাবিয়া তাঁহার মনে অনুশোচনা উপস্থিত হইল। ঘুমের প্রথমাবস্থায় বাধা পাইলে ঘুম ছুটিয়া যায়, ঘুম না হইলে তাঁহার শরীর খারাপ, মেজাজ খারাপ হয়। কিন্তু যে লোক সুগভীর

রাত্রে সুকোমল শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিয়া যুদ্ধং দেহি রবে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছে, তাহাকে নিরস্ত করাও সহজ নয় ভাবিয়া তাঁহার দুশ্চিন্তার অবধি রহিল না।

গৃহিণী বলিলেন, কি, চুপ ক'রে রইলে যে!

—ভাবছি।

—কি ভাবছ?

ঢং ঢং করিয়া ঘড়ি বাজিয়া উঠিল; হেরম্বনাথ শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, কটা বাজছে?

গৃহিণী ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন, বারটা।

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, বাস্-রে! বারটা বেজে গেল! কাল আবার ভোরেই বেরুতে হবে যে। বলিয়া চক্ষু মুদিলেন।

গৃহিণী রাগতভাবে কহিলেন, ভোরেই বেরোও আর এখনি বেরোও, কাল দুপুরে তোমায় বাড়ী থাকতে হবে।

—দুপুরে, তা নিশ্চয় থাকব।

—তোমার নিশ্চয় ত!

—দেখ, ঠিক থাকব।

দেখা গেল হেরম্বনাথ যথাসময়ে গৃহে অনুপস্থিত রহিলেন। প্রণয়কে আহারে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। মা'র অনুরোধে ইন্দুই তাঁহাকে চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়াছিল এবং সাধারণ ভদ্রলোকের গৃহে যেমন হইয়া থাকে, সেদিন সে নিজে অনেকগুলি সৌখীন রান্না রাঁধিয়া ফেলিল। ঘর-সংসার রান্নাবান্নার কাজে ইন্দুর চিরদিনই প্রবল আগ্রহ। এ সকল কাজ পাইলে আর কিছুই সে চায় না। আজ সকাল হইতে সে একা একশত হইয়া

খাটিতেছে। তাহাকে অধিকতর উৎসাহিত করিবার জন্য মা বার বার রান্নাঘরে আসিতেছেন, মশলাদি পরীক্ষা করিয়া যাইতেছেন, ইন্দুও মা'র কাছে নানা পরামর্শ জানিয়া লইতেছে।

ইন্দুর এই অপরিসীম যত্ন, শ্রমশীলতা দেখিয়া মা'র মনে আজ আনন্দের অবধি নাই। এই সুমতিটুকু যাহাতে বজায় থাকে, তাহার জন্য তিনি সাতকোটী দেবতার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছেন।

প্রণয় আসিলে, ইন্দু তাহাকে সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। বলিল, আপনাকে কি টেবিলে দেব?

প্রণয় হাসিয়া কহিলেন,—As you like it! (যথা অভিরুচি)।

টেবিলে খাবার সাজাইয়া, ইন্দু তাঁহাকে খাবার-ঘরে ডাকিয়া আনিল। প্রণয় বলিলেন, তুমি খাবে না?

—আপনার হোক্।

—একা একা খেতে আমার ভাল লাগবে না।

—একা কেন, আমি ত এখানেই আছি। আপনি বসুন।

—তুমি বসলে কিন্তু বেশ হ'ত। দু'জনে গল্প করতে করতে—

—গল্প এমনই করতে পারবেন, আমি ত এখানেই আছি। যার রান্না, সম্মানিত অতিথিকে না খাইয়ে সে খেতে পারে কি?

প্রণয় সজ্জিত আহার্য্যের পানে চক্ষু রাখিয়া বলিলেন, তুমি এত সব রেঁধেছ ইন্দু!

লজ্জারুণ আনত মুখে ইন্দু কহিল, আপনি বসুন তো। খেতে পারেন, তবে না?

ইন্দু টেবিলের অপর প্রান্তে চেয়ার টানিয়া বসিল।

প্রণয় সামান্য কিছু খাইয়া প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিলেন।

ইন্দু বলিল, আপনি খেলেন কৈ যে, এত সুখ্যাতি করছেন?

প্রণয় আবার আহারে মন দিলেন। যে বাটী হইতে যে খাদ্য মুখে তুলেন, তাঁহার নিকট তাহাই অমৃততুল্য বোধ হয়।

ইন্দু হাসিয়া বলিল, আমি রেঁধেছি আর আপনার সামনে বসে আছি, প্রশংসা না করে উপায় কি!

—বেশ, তা হলে একটু নিন্দাই করি, কেমন! এই দেখ, নূনের ভেতর একটা আস্ত ডেলা।

ইন্দু হাসিল। প্রণয় বলিলেন, কেমন, নিন্দে করতেও পারি। দেখলে?

লজ্জার কথা কি-না জানি না, প্রণয় ভোক্তা ভাল, আধুনিক যুবক-দিগের মত নস্য-পরিমাণ ভোজন করিয়াই হাঁসফাঁস করেন না। অন্ন-ব্যঞ্জনাদি পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করিলেন। আহার শেষ হইয়া আসিয়াছে, বলিলেন, জীবনে এমন তৃপ্তির সঙ্গে আর কোন দিন খাই নি ইন্দু।

ইন্দু চুপ করিয়া রহিল। তবে কথাটা যে তাহাকে অতীব প্রীত করিয়াছে তাহা তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝা গেল।

প্রণয় বলিলেন, ইন্দু, আজ তুমি আমাকে যে আনন্দ দিয়েছ, তার বিনিময়ে তোমাকে আনন্দ দেওয়াই উচিত; কিন্তু তার বদলে আমি তোমায় কষ্ট দেব।

ইন্দু মুখ তুলিয়া তাঁহার পানে চাহিতে পারিল না। ভয়ে ভয়ে কাণ পাতিয়া একাগ্রচিত্ত হইয়া বসিয়া রহিল।

প্রণয় বলিলেন, সব কথা হয়ত গুছিয়ে আমি বলতে পারব না, তবু আমার বিশ্বাস, আমার কথা তুমি বুঝতে পারবে।

ইন্দুর পা দু'টা যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

—তুমি জান বোধ হয় আমি বিপত্নীক। বৌদি সে কথা তোমাদের বলেছিলেন বলেই শুনেছি। বিপত্নীক হবার কিছুদিন পরেই বৌদি আমাকে তোমাদের কাছে আনেন। যে উদ্দেশ্যে আনেন, তা বোধ হয় তুমিও জান। প্রথম দিন থেকেই তোমাকে আমার ভাল লেগেছিল। কিন্তু—

ইন্দু চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছিল, প্রণয় বলিলেন, আমার কথা অনেক নয়, এক মিনিটেই শেষ হয়ে যাবে। তুমি সেই একটি মিনিট ব'স।

ইন্দু বসিল; কিন্তু তাহার সর্ব্বাঙ্গে স্বেদ ছুটিতেছিল।

প্রণয় বলিলেন, তোমাকে পাবার আশাই আমি করেছিলুম, কিন্তু তুমি ছিলে একান্ত বিরূপ। তুমি যত দূরে চলে যেতে চেয়েছ, আমাকে তত পাগল করেছ। আমার সে অবস্থায় আমি যেখানে সেখানে ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছি। মনে করেছি তোমার চেয়ে ভাল কাউকে খুঁজে নিতে পারব, সেই আশাতেই ছুটে বেড়িয়েছি, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত—তোমাকে ত নয়ই, তোমার মতও কাউকে পাই নি। তবুও ছুটোছুটির অন্ত নেই, কলকাতায় থাকলে তার আর শেষ হবেও না। তাই আমি কলকাতা থেকে চলে যাচ্ছি। আজ যাবার দিনে তোমার স্নেহ-যত্ন পেয়েছি বলেই এ[illegible] কথা বলে যাই, ইন্দু, আমি লম্পট নই, অসচ্চরিত্রও নই, যত [illegible] তুমি আমাকে ভাব, ততটা খারাপ আমি নই। তুমি যদি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করতে, জীবনকে আমি ধন্য বলে মেনে নিতে পারতুম।

কথা শেষ হইতেই ইন্দু দাঁড়াইয়া উঠিল। তাহার মুখ পাংশু, চক্ষু নিষ্প্রভ, দেহখানি যেন বেতসপত্রের মত কাঁপিতেছে।

প্রণয় ভীত কণ্ঠে কহিলেন, অপরাধ নিও না, ইন্দু। জীবনের সব চেয়ে বড় সত্যটা আজ স্পষ্ট করে বলে ফেললুম।

—আপনার পান আনি, বলিয়া ইন্দু তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

অসহযোগের সহিত আইন অমান্যের প্রবল আন্দোলন। হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা কাঁপিয়া উঠিয়াছে। জেদাজেদির পীঠস্থান আদালত জনশূন্য, স্কুল-কলেজে ছেলে নাই, ব্যবসা-বাণিজ্যে স্থিতি নাই, লোকের অবস্থাও নাই, কোম্পানীর কাগজের দাম রোজই নামিয়া যাইতেছে, কংগ্রেসের লোক রাজার আইন অমান্য করিতেছে, দেশময় বিশৃঙ্খলা। ছেলেমেয়েরা বাপ-মার কথা অমান্য করিতেছে, সমাজের ভিত্তি নড়িয়া উঠিয়াছে। অদৃশ্য স্থানে বসিয়া বাসুকী যেন মাথা নাড়া দিতেছেন। ধনীর মনে সুখ নাই, গৃহস্থের ঘরে শান্তি নাই, সকলেই যেন ভয়ে ভয়ে কোন রকমে দিন যাপন করিতেছে। সর্ব্বত্র অশান্তি। এত অশান্তির মধ্যে শান্তি, এমন বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা আসিবে কেমন করিয়া কে জানে?

জেলে যাওয়ার বড় ধুম পড়িয়াছে। নেতারা আগেই গিয়াছেন, স্বেচ্ছাসেবকেরাও তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছেন, এখন স্কুল বা কলেজের ছেলেমেয়েদের পালা। তাহারা স্কুল বা কলেজের ফটকে পিকেটিং করিয়া জেলে যাইতেছে। যে বেকারের দল জীবিকার আশায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন, তাহারা দিন কতকের জন্য বিশ্রামাশায় পুকুরপাড়

বা নদীর ধারে উনুন জ্বালিয়া ভাঁড় চড়াইয়া নুন তৈরী করিতে লাগিয়া গিয়াছে। খবর পাইয়া পুলিশ আসিতেছে শুনিলেই তাহারা দ্বিগুণ উৎসাহে উনুনে জ্বালানি-কাঠ ঠেলিয়া দিতেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের বাজারে আগুন, কাজেই মুটে মজুরেরা বেকার হইয়া পড়িয়াছে, তাহারাও ঝাঁকা ফেলিয়া "বন্দে মাতরম্" হাঁকিয়া পুলিশের গাড়ীতে আরোহণ করিয়া রাজ-আতিথ্য বরণ করিতে চলিয়াছে।

সকাল হইতে সন্ধ্যা শহরের রাজপথে এই দৃশ্যই শুধু দেখা যায়। মাথায় ময়লা খদ্দরের টুপি, অঙ্গে মোটা মলিন খদ্দরের বসন, কাহারও বা খদ্দরের চাদরে আবৃত দেহ, কাহারও দেহের উপরার্দ্ধ নগ্ন, পায়ে জুতা আছে কিম্বা নাই—দলে দলে লোককে একটি মাত্র পুলিশ-প্রহরী স্বচ্ছন্দে চালিত করিয়া লইয়া যাইতেছে। বৃদ্ধ, যুবা, বালক স্বেচ্ছায়, হাসিমুখে চলিয়াছে। পলায়নের চেষ্টা নাই, দণ্ডের ভয় নাই; মধ্যে মধ্যে কেবল বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে শহর সচকিত হইয়া উঠিতেছে।

সরকারের জেলখানায় স্থানের অত্যন্ত অভাব। দরমার বেড়া দিয়া মাঠ ঘিরিয়া নূতন নূতন জেলখানা গঠিত হইতেছে। শহরের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে খোলা মাঠ আর নাই বলিলেও চলে।

স্কুল-কলেজের ছেলে যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিল, তখন মেয়েদের পালা। তাহারা ইতিপূর্ব্বেই বাড়ীতে, স্কুলে-কলেজে, গুরুজনদের কথা অমান্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, যখন দৈনিক সংবাদপত্রে জেলযাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে দেখিল, তখন তাহারাও কোমর বাঁধিয়া দেশের লবণাভাব দূর করিতে অগ্রসর হইল। নারীদের জন্য স্বতন্ত্র জেলখানা না গড়িয়া সরকারের উপায় রহিল না।

লবণের অভাব দেশের লোকের বড় অভাব নহে, লবণ প্রস্তুত করিয়া সে অভাব মোচন করাও এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল না, সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করাই আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য। তাহা যে কতকাংশে সফলও হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে যে আন্দোলনে লোকের অন্তরের স্পর্শ ছিল না, সে আন্দোলন খড়ের আগুনের মত দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেও অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না।

তা না হউক, অগ্নিশিখা বহু দূর উচ্চে উঠিল এবং বহু দূরে ছড়াইয়া পড়িল। সহর ছাড়িয়া পল্লীগ্রাম, সেখান হইতে গণ্ডগ্রামগুলিতেও পরিব্যাপ্ত হইল।

ছায়ার শ্বশুরবাড়ীর দেশ রামপুর গ্রামেও বন্যার ঢেউ লাগিল। ছায়ার দেবর স্কুলের সহপাঠীদের সঙ্গে কোন্ নদীর ধারে নুন প্রস্তুত করিতে গিয়া, থানার হাজতে দুই দিন দুই রাত্রি বন্ধ থাকিয়া, কাঁদিয়া কাটিয়া, ক্ষমা চাহিয়া, নাকে খৎ দিয়া তৃতীয় দিবসে শুকাইয়া আধখানা হইয়া বাড়ী ফিরিল।

ছায়ার শাশুড়ী তৎপূর্ব্বেই শয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অশোক আসে নাই, একটি একটি করিয়া দিন কাটিয়া গিয়াছে, চোখের জলে বুক ভাসিয়াছে, অশোক আসে নাই, কোন খবরও দেয় নাই।

ছায়ার মুখে আর কথা নাই। শাশুড়ীর সামনে আসিতে তাহার মাথা কাটা যায়। তাঁহার ব্যাকুল ছল ছল আঁখি দুইটি অহরহ ছায়ার মুখের [illegible] চাহিয়া যে প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতেছে, সে প্রশ্নের শেষ উত্তরটিও যে ছায়ার নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে! বলিবার, সান্ত্বনা দিবার কোন কথাই কি আর তাহার আছে? সে যে প্রাণ ঢালিয়া, নিঃশব্দে রুগ্না শাশুড়ীর

সেবা করিলেও, তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতে পারে না, কথা বলিতে গেলে চোখে জল আসিয়া পড়ে, ছায়ার শাশুড়ী যে তাহা না বুঝিতে পারেন. তাহা নহে; তাই ত তিনি প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে তাহাকে কাছে ডাকেন। কোন কথা বলিবার না থাকিলেও যা-তা একটা কথা বলিয়া, তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদছলে অশ্রু বর্ষণ করেন, তাহা দেখিয়া ছায়া যে কিছুতেই আপনাকে সম্বরণ করিতে পারে না। তাঁহার সম্মুখ হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া কোন গোপন স্থানে গিয়া কাঁদিয়াই তবে সে একটু সান্ত্বনা পায়! অশোক তাহার সঙ্গে প্রতারণা করিয়া তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে, তাহার জন্য দুঃখ হয় না তাহা নহে; কিন্তু সে এই পুত্রগতপ্রাণা মাতাকে যে নিষ্ঠুর প্রতারণা করিয়াছে, সে দুঃখের সীমা কোথায়? একটি করিয়া দিন কাটিয়াছে আর আশা-নিরাশা, হর্ষ-বিষাদের দ্বন্দ্বে বৃদ্ধার ভঙ্গুর হৃদয়ে যে ঝড় বহিয়াছে, তাহা চোখে যে না দেখিয়াছে, তাহার পক্ষে অনুমান করাও কঠিন। এক একটি নিঃশ্বাসের সঙ্গে এক একখানি পাঁজরা খসিয়া গিয়াছে। ছায়া মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন সে দৃশ্য দেখিয়াছে। দেখিয়াছে, আর তাহার নিজের বিড়ম্বিত, অভিশপ্ত জীবনের দুঃখও ম্লান হইয়া গিয়াছে। ছায়ার কল্পিত দিনের পর আরও কয়েক দিন যখন কাটিয়া গেল, তখনই বৃদ্ধা শয্যা লইলেন। পাছে পরে জ্ঞান না থাকে, বলিতে না পারেন, তাই আগেই ছায়াকে বলিয়া রাখিলেন, বউ মা, ছোঁড়াটাকে দেখো। না খেতে পেয়ে যেন মরে না।

ছায়া বলিল, আমি বেঁচে থাকতে ঠাকুরপোকে কোন দুঃখ কষ্ট পেতে হবে না মা!

বৃদ্ধা কতকটা শান্ত হইলেন। না হইয়া কি করিবেন? ছায়া অনাথা নিঃসহায়া স্ত্রীলোক, তাহার অভয়দানের মূল্য কি? মুখের সান্ত্বনা ছাড়া ইহা যে আর কিছু হইতে পারে না, তাহা তিনি বুঝিলেন। কঠোর সংসারে তাই বা কে দেয়? তাই বা কোথায় পাওয়া যায়?

এমনই এক দুর্দ্দিনে দুঃসংবাদ আসিল, পরেশকে থানার লোক ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। পল্লীগ্রামের লোক সরল, পরোপকারী, কিন্তু তাহাদের পায়ে মাথা খুঁড়িলেও থানার চৌকাঠ তাহারা মাড়াইবে না। দুই দিন এই দুই নারীর কি ভাবে কাটিল, তাহা কেবল অন্তর্য্যামীই জানিলেন।

কয়েক দিন পরে বৃদ্ধার অবস্থা যখন খুবই শঙ্কাজনক, সেই সময়ে একদিন মধ্যাহ্নে প্রণয়কুমারের সুন্দর গাড়ীখানি আসিয়া সেই কঞ্চির বেড়ার ধারে দাঁড়াইল। ছায়া গাড়ীর শব্দে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রণয়ের সঙ্গে ইন্দুকে আসিতে দেখিয়া তাহার চোখের দৃষ্টি যেন ঝাপসা হইয়া আসিল।

তাহারা কাছে আসিতে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বিমল-দা?

ইন্দু মুখ নীচু করিল। প্রণয় বলিলেন, নিষিদ্ধ বই পড়ায় ছ'মাস জেল হয়েছে।

—দুইটি নারী একই সঙ্গে যেন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—ছ'মাস জেল—বিমল-দা'র?

প্রণয় মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, আমার কাছেই বিচার হয়েছিল। অনেকের এক বৎসর পর্য্যন্ত জেল হয়েছে। বিমলবাবুকে ছেড়ে দিতেও পারতুম, তাঁকে সে সুযোগও দিয়েছিলুম, তিনি জেলই বেছে নিলেন।

—আমায় বল-নি ত?

ইন্দু ফ্যাঁকাশে মুখ তুলিয়া প্রণয়ের দিকে চাহিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। প্রণয় তাহাকে বাহুবেষ্টনে ধরিয়া ফেলিলেন।

ছায়া কিয়ৎকাল স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, বিমল-দা'র বুড়ী মা?

প্রণয় বলিলেন, তাঁকে কাশী পাঠান হয়েছে। যেদিন বিমল বাবুর জেল হয়, সেই দিনই আমি তাঁর বাড়ীতে গিয়ে সঙ্গে লোক দিয়ে মা'কে কাশী পাঠিয়ে দিয়েছি।

ইন্দু সজল দু'টি চক্ষু তুলিয়া একবার চাহিল মাত্র।

ছায়া নিজের মনেই বলিল, ছেলেরা বড় হ'লে মা'রা আর বেঁচে থাকে কেন, তাই ভাবি! এখানেও এক বৃদ্ধা মা'কে নিয়ে যমে মানুষে টানাটানি চলছে; প্রাণ যায়-যায় তবু যায় না!

ইন্দু দাওয়ার উপরে উঠিতে ছায়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। এক মুহূর্ত্তে, কি-যেন-কি মনে হইল, কি-যেন-কি ভাবিল, তারপরে তাহাকে সমদুঃখী ভাবিয়া বুকের পাশে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, ভিতরে এস ভাই।

ইন্দু ভিতরে প্রবেশ করিলে, ছায়া প্রণয়কে বলিল, প্রণয়-মামা, পৃথিবীতে চিরদিন কি এমন বিপরীত ঘটনাই ঘটে?

—কি বিপরীত ঘটনা ছায়া?

—কোন্‌টা নয়? কিন্তু, এই যে, ছেলের জন্যে মা'র প্রাণ যায়, ছেলে মার খোঁজও নেয় না—

কথাটা শেষ হইল না। নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া যে বন্যা বহিল,—তাহার শেষ কোথায়, কে জানে! নদী, নদী হইতে সমুদ্র, সমুদ্র হইতে মহাসমুদ্র, তারপরে—কে জানে বন্যার শেষ কোথায়?

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

দুঃখের দিন দীর্ঘ। যাহার দুঃখ যত বড়, তাহার দিনও তত দীর্ঘ। তবু, দিন কাটে। কাটিবে না জানে, তবু দিন কাটে। ছায়ার দিনও কাটিল। একটি একটি করিয়া ছয়টি মাস উত্তীর্ণ হইল।

ছয় মাস পরে হুগলী-জেলের সম্মুখে পরেশকে সঙ্গে লইয়া ছায়া সারাদিন দাঁড়াইয়া ছিল। কত উৎসুক নয়ন নীরব কত প্রশ্নবাণ হানিয়া গিয়াছে, কত পরদুঃখকাতরাত্মা কত আত্মীয়তা জ্ঞাপন করিয়া হতাশ হইয়া চলিয়া গিয়াছে, প্রকাণ্ড পাঁচীলের নীচে মাথার উপর প্রচণ্ড রৌদ্র ও আশে পাশে কৌতূহলী লোক-সমাগম সহ্য করিয়াও পরেশকে কোলের কাছে চাপিয়া ধরিয়া ছায়া সারাদিন দাঁড়াইয়া রহিল। জেলের দরজা কত বার খুলিল, কত বার বন্ধ হইল, কত লোক আসিল, কত লোক গেল, ইমামবাড়ীর ঘড়িতে ঘণ্টা, আধঘণ্টা, কোয়ার্টার বাজিয়া চলিল, সন্ধ্যাও আসিয়প্রায় কিন্তু যাহার প্রতীক্ষায় তাহারা দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে দেখা গেল না।

পরেশ বলিল, বৌদি, আজ আর ওরা তোমার দাদাকে ছাড়বে না বোধ হয়।

ছায়াও তাই ভাবিতেছিল, কিন্তু মন তাহার তাহাতে সাড়া দিল না। কোন কথার উত্তর না দিয়া ছায়া জেলের ফটকটির পানে চাহিয়া যেমন ছিল, তেমনই রহিল

সন্ধ্যা হইয়া আসিল, পাখীর কলস্বর থামিয়া গেল ; আদালত-ফেরত গাড়ী ও রাহীর সংখ্যাও হ্রাস পাইল। আর দাঁড়াইয়া থাকা নিরাপদ নহে ভাবিয়া ছায়া সম্মুখে বিস্তৃত পথের পানে চাহিল।

আবার এক বার বিকট শব্দ করিয়া ফটক খুলিয়া গেল। তিন চার জন লোক বাহির হইয়া আসিল। একজনের দীর্ঘ, উন্নত দেহ দেখিয়াই ছায়া পরেশকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, ঠাকুরপো, উনিই আমার বিমলদা। তুমি ওঁকে ডেকে আনতে পারবে ত ?

পরেশ সভয়ে কহিল, ওরা যে অনেক লোক বৌদি ।

—হলই বা অনেক ; তুমি শুধু ওঁকে ডাকবে ।

—কি বলে ডাকব ?

যাহারা বাহির হইয়াছিল, তাহারা চলিতে চলিতে প্রায় অদৃশ্য হইয়া যায় দেখিয়া, ছায়া পরেশকে ছাড়িয়া দিয়া নিজেই অগ্রসর হইল। কিন্তু, যদি ঐ লোকটি বিমল না হয় !

পরেশ ছায়ার হাত ধরিয়া বাধা দিয়া বলিল, তুমি দাঁড়াও বৌদি, আমি যাচ্ছি। কি বলে ডাকব সেইটে শুধু বলে দাও ।

—বলবে বিমল দাদা।

পরেশ চলিয়া গেল। সেই বিলীয়মান আলোকেও দেখা গেল, সেই চিহ্নিত ব্যক্তির সঙ্গে সে কথা বলিল। লোকটি দাঁড়াইল এবং বার দুই এদিকে চাহিয়া সঙ্গীদের সঙ্গে কথা বলিয়া, পরেশের সঙ্গে আসিতে লাগিল ।

বিমল কাছে আসিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল, কোন এক মনীষী যে বলিয়াছিলেন, পৃথিবীতে অসম্ভব বলিয়া কোন-কিছু নাই, তাহা ঠিক ।

ছায়া ভূতলে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিয়া, বিমলের পায়ের ধূলা লইতে উদ্যত হইলে বিমল সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, ছায়া, তুমি কোথা থেকে, কেমন করে এখানে এলে ?

ছায়া আঁচলে মুখ ঢাকিয়াছিল, কথার উত্তর দিল না।

বিমল বলিল, কোথা থেকে এলে তুমি ?

ছায়া বলিল, রামপুর থেকে।

বিমল আরও কি প্রশ্ন করিতে উদ্যত হইয়াছিল, ছায়া বলিল, রাত হয়ে গেল যে, এখানে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব !

—কোথায় যাবে ?

—বাড়ী যাব। চলুন দাদা, পাশের ঘাটে আমাদের নৌকা আছে।

বিমল সাশ্চর্য্যে কহিল, আমি কোথায় যাব !...

ছায়া বলিল, কেন, আমাদের সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে।

—পাগল !

—পাগলামি কি দেখলেন দাদা ?

—কলকাতায় যেতে হবে, মা আছেন যে !

—তিনি কলকাতায় নেই।

—আমার মা ? কলকাতায় নেই ?

—না।

বিমলের পা দুটা কাঁপিয়া উঠিল।

ছায়া বলিল, চলুন দাদা নৌকায়, সব বলছি।

বিমল নড়িল না, বলিল, আমার মা—

—তিনি কাশীতে আছেন।

—কাশীতে ! আমার মা !

—হ্যাঁ, দাদা।

—কাশীতে ? আমার মা ! কে তাঁকে কাশী পাঠাবে !

—বলছি ত নৌকায় চলুন, সব বলব।

—তুমি ঠিক জান ছায়া ? মা আমার বেঁচে আছেন ত !

—আমি কি মিথ্যে বলছি ? তিনি কাশীতে আছেন।

জেলখানার পাশের ঘাটে নৌকা বাঁধা ছিল। জোয়ারের জলে নদী কূলে কূলে ভরা, বায়ু অনুকূল। মাঝিরা পাল তুলিয়া দিয়া বসিয়া রহিল।

বিমল বলিল, মার কথা কি বলছিলে ? কে তাঁকে কাশী পাঠালে ?

ছায়া বলিল, শুনতেই হবে ? নাই বা শুনলেন ?

বিমল কঠিন স্বরে কহিল, তুমি জান ?

ছায়া বলিল, যিনি আপনাকে জেলে দিয়েছেন, তিনিই মাকে কাশী পাঠিয়েছেন।

—প্রণয় বাবু ?

—হ্যাঁ।

বিমল চুপ করিয়া রহিল। তাহার বিচার-দিবসের দৃশ্যটি চোখের উপরে ভাসিয়া উঠিল। প্রণয়কুমার বিচারক, এজলাসে বসিয়া, বিচারের সময় নানাভাবে বিমলকে মুক্তি-গ্রহণের সুযোগ দিতে তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন। বার বার তাহাকে আশ্বাসও দিয়াছিলেন, একটু এদিক ওদিক করিয়া কথা বলিলেই তিনি যে তাহাকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে প্রস্তুত ছিলেন, তাহাও জানাইয়া দিয়াছিলেন। কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াও,

দণ্ডকালে যাহাতে তাহাকে কোনরূপ কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে না হয়, তাহার ব্যবস্থাও লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। বিমলের সঙ্গে একই অপরাধে যাহারা কারাদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হয়, তাহাদের কাহারও সম্বন্ধে বিচারক তদ্রূপ দয়া প্রকাশ করেন নাই। কারাগারে বিমল সেই দয়া দাক্ষিণ্যের সুযোগ গ্রহণ না করিয়া অন্য সকলের সঙ্গে কারাকষ্ট হাসিমুখেই বরণ করিয়া লইয়াছিল। তাহার মনে হইয়াছিল, প্রণয়কুমারের দয়াদত্ত কোন অনুগ্রহ লইবার পূর্ব্বে কারাগারের কষ্টে প্রাণবিয়োগ হইলেও তাহার দুঃখ হইবে না। প্রণয় যে বিচারকের আসনে বসিয়া দণ্ডদানের সময়ে কতকটা অনুগ্রহ করিয়াছিলেন, বিমলের তাহা অজ্ঞাত ছিল না। সহ-কর্ম্মীদিগের অনেকেরই উপর তাহার চেয়ে দীর্ঘকালের কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, একমাত্র তাহাকেই লঘু দণ্ড দেওয়া হইয়াছে, ইহাতেও বিমলের বিতৃষ্ণা জাগিয়াছিল, কিন্তু দণ্ড দীর্ঘ করিবার ক্ষমতা অথবা দণ্ডকাল উত্তীর্ণ হইলে কারাগারে অবস্থানের অধিকার তাহার ছিল না বলিয়াই সে নীরবে সেই অনুগ্রহ স্বীকার করিয়াছিল; তদতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি তাহার ছিল না।

ছায়া নীরবেই বসিয়া ছিল; কিন্তু নীরবতা তাহার ভাল লাগিতেছিল না, বলিল, দাদা, জেলে বুঝি সবাই রোগা হয়?

বিমল বলিল, কেন? আমি ত মোটা হইছি, ছায়া।

—মোটা ত কত! কি রকম শুকিয়ে গেছেন।

—শুকিয়ে গেছি? না, না, আচ্ছা ছায়া—

—বলুন।

—প্রণয়বাবু মাকে কাশী পাঠিয়েছেন তুমি জানলে কেমন করে?

—প্রণয়-মামাই বললেন।

—তোমার সঙ্গে তাঁর কোথায় দেখা হল ?

ছায়া সন্তর্পণে জবাব দিল, একদিন এসেছিলেন।

নৌকার ভিতরে মসীলিপ্ত কাচের আধারে একটি ক্ষুদ্র আলোক মিটি মিটি জ্বলিতেছিল। সে আলোকে কাহারও মুখ স্পষ্টভাবে দেখা যায় না। তবুও, ছায়ার মনে হইল, বিমলের দুটি চোখে অজস্র কৌতূহল ও আকুলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কি জানি যদি ব্যথা লাগে, তাই কৌতুহল নিবারণের কোন চেষ্টাই করিল না।

বিমল নিজের মনেই বলিল, বোধ হয় তাঁর স্ত্রীর পরামর্শেই তিনি আমার মাকে কাশী পাঠিয়ে দিয়েছেন।—

বিমল একটা নিঃশ্বাস দমন করিয়া ফেলিল।

নারী তাহা বুঝিল। বিমল যে ইন্দুর নামোচ্চারণ না করিয়া অন্য ভাষায় তাহার উল্লেখ করিল, এটুকু বুঝিতেও নারীর বিলম্ব হইল না। কিন্তু বিমলের অনুমান যে সত্য নহে, প্রণয়কুমার যে ইন্দুর অজ্ঞাতেই সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং ইন্দু ছায়ার সঙ্গে এক সঙ্গেই খবরটা জানিয়াছিল, এ সকল কথা বিমলকে এখনই বলা উচিত কি না, ভাবিতে ভাবিতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই, বিমল অন্য কথা পাড়িল।

—অশোকবাবু ফেরেন নি! সে আমি তোমায় দেখেই বুঝতে পারছি। কিন্তু কোন খবরও কি পাও নি ছায়া ?

ছায়া নীরবে ঘাড় নাড়িল।

বিমল চুপ করিয়া রহিল। নিঃশব্দ ঐ মাথা নাড়ার মধ্য দিয়া অভিশপ্ত

নারী-হৃদয়ের কত বড় মর্ম্মান্তিক বেদনা ঝরিয়া পড়িল, তাহা বুঝিয়া তাহার পুরুষ-হৃদয়ও আলোড়িত হইয়া উঠিল। নিরাভরণা দুঃখ-প্রতিমাখানির পানে চোখ তুলিয়া চাহিতেও তাহার চক্ষু যেন আড়ষ্ট হইয়া আসিতেছিল। বিমল অন্ধকারাচ্ছন্ন কাল জলের পানে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

একটু পরে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার শাশুড়ী কেমন আছেন ছায়া?

—প্রাণটা এখনও আছে।—বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ সজল হইয়া আসিল। এক মুহূর্ত্ত থামিয়া পুনরায় বলিল, সে কষ্ট চোখে দেখা যায় না। মনে হয়, তার চেয়ে মরণ হলেই যেন ভাল ছিল।

বিমল হঠাৎ বলিয়া উঠিল, ছায়া, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি এই-খানেই নেমে পড়ি।

ছায়া সবিস্ময়ে কহিল, এখানে নেমে কোথায় যাবেন দাদা?

—তা জানি নে, যেখানে হ'ক যাব; তোমাদের বাড়ী ছাড়া।

—আমাদের বাড়ী কি দোষ করল?

কথাগুলার ভিতর দিয়া আহত হৃদয়ের বেদনার ধ্বনিটি বিমলের কাণে অতীব করুণ হইয়া বাজিল; বিমল মৃদুকণ্ঠে কতকটা যেন ক্ষমাপ্রার্থনার ভাবে কহিল, দুঃখের ছবিই সারাজীবন দেখে আসছি দিদি, আর পারি না। তোমার ঘরেও ত সেই ছবি ভাই।

ছায়া চুপ করিয়া রহিল।

বিমল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, কিছু ভাল লাগে না ছায়া, কিছু ভাল লাগে না। জেল থেকে না বেরুতে দিত যদি, সারা জীবন যদি সেখানেই রেখে দিত, আমার কোন দুঃখ ছিল না।—সে একটু থামিল; একটু পরে আবার বলিল, এই পৃথিবীটাকে আমার একটুও ভাল

লাগে না ছায়া। এখানে ভালবাসার দাম নেই, বিশ্রী এই পৃথিবী।

ধরণী নিস্তব্ধ, ভাগীরথীর বিশাল বারিবক্ষও নিস্তব্ধ, পালভরে নৌকা ছুটিতেছে, নৌকার দুই পাশে জল-কাটার মৃদু শব্দ—কান পাতিলে শুনা যায়, নতুবা বিশ্বপ্রকৃতি নিস্তব্ধ। নিস্তব্ধ পৃথিবীর বুকের উপর নির্ম্মম কথাগুলা যেন অনেকক্ষণ ধরিয়া থম্ থম্ করিতে লাগিল। পরেশ বৌদির কোলের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া ছিল, কখন্ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, ছায়া তাহার গায়ের চাদরখানি দিয়া দেহটি আবৃত করিয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল, এই পৃথিবীর নিন্দা করিবার বহু কারণ বিমলের আছে।

বিমল বলিল, যে পৃথিবীতে স্বামী সর্ব্বস্বত্যাগিনী স্ত্রীর ত্যাগের মর্য্যাদা বুঝে না, সে পৃথিবীর উপর আমার এতটুকু দরদ নেই ছায়া।

ছায়া বলিল, ও কথা থাক দাদা।

—থাকবে, বেশ থাক্! হিন্দুর দেশে জন্মে কোন্ স্ত্রী স্বামি-নিন্দা সহ্য করতে পারে? সেই নিন্দা সইতে না পেরে তোমাদেরই একজন দেহত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু আমি ত নিন্দা করি নি ছায়া। আমি শুধু বলছিলুম—

—দাদা, দুঃখের কথায় কাজ কি?

বিমল সন্তুষ্ট চিত্তে, প্রসন্ন হাস্যে কহিল, ঠিক বলেছ দিদি।

আকাশের এক প্রান্তে বনানীর উপরে ধীরে ধীরে চন্দ্রোদয় হইতেছিল, নদীর কাল জল চক্ চক্ করিতেছিল। নিস্তরঙ্গ বারিবক্ষে চন্দ্রকিরণচ্ছটা রূপার মত ঝলসিতেছিল। দুইজনেই সেই দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

একটু পরে বিমল বলিল, বাবা মা'র খবর ভাল ?

—জানি না।

—জান না ?

—না। তাঁরা বিদেশে গিয়েছিলেন খবর পেয়েছিলুম, তারপর কোন খবরই আর পাই নি।

—তোমার মা'র রাগ তা হ'লে এখনও পড়ে নি ?

ছায়া চুপ করিয়া রহিল।

মাঝিরা নৌকার পাল খুলিয়া ফেলিল। নৌকা নদী ছাড়িয়া খালে প্রবেশ করিল। একজন দাঁড়ি লগি ঠেলিয়া নৌকা বাহিয়া চলিল। আকাশের চাঁদ তখন বনানী ভেদ করিয়া আকাশে উঠিয়াছে, চারিদিক জ্যোৎস্নায় হাসিয়া উঠিয়াছে ; স্বল্পপরিসর খালের জলটি জ্যোৎস্নার আলো বুকে ধরিয়া টল টল করিতেছে। নৌকার ছইয়ের ভিতরও চাঁদের আলো পড়িয়াছে। পরেশের ঘুমন্ত মুখের উপরে সুপ্ত চন্দ্রালোকের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে দেখিতে বিমল মোহাবিষ্টের মত বলিয়া উঠিল, এ পৃথিবীতে বোধ হয় ঐ ছেলেটিই সুখী। বাঙলাদেশের নদীর স্নিগ্ধ জ'লো হাওয়া, আর চাঁদের আলো, স্নেহময়ী বৌদিদির কোল—এসব যে পায়, তার নিদ্রা সুখ-নিদ্রাই হয় !

ছায়া বাম হাতে নিদ্রিত বালকের দেহখানি টানিয়া, যেন নিবিড় করিয়া ধরিল।

বিমল বলিল, ছায়া, আজ রাতটা তোমার আতিথ্য স্বীকার করলুম ভাই; কাল কিন্তু সকালেই আমাকে ছেড়ে দিও।

ছায়া প্রবল আপত্তি জানাইয়া কহিল, কালই ছাড়তে পারব

না। দিন কতক থেকে শরীরটা একটু সারিয়ে তবে যেতে পারবেন।

—শরীর ঠিক আছে দিদি। কাল সকালেই যেতে হবে।

—কোথায় যাবেন শুনি?

—কাশী। তীর্থ করতে দিদি, তীর্থ করতে। একবার যদি ঐ ছেলেটার মত মার কোলে শুয়ে ঘুমুতে পারি' ছ'মাসের জাগার শোধ উঠে যাবে।

—দাদা কি ছ'মাস ঘুমোন্ নি?

—না ভাই।

—কি করতেন? ভাবতেন?

—তাই হবে বোধ হয়, মনে নেই।

তাহার স্বরে হতাশা কল্পনা করিয়া ছায়া বলিল, দাদা, ইন্দুর কথা ত একবারও বললেন না!

বিমল হাসিল, বলিল, তার আর কথা কি আছে দিদি? ভাল ঘরে বরে বিয়ে হয়েছে, ভাল মেয়ে, নিশ্চয়ই সুখী হয়েছে।

ছায়া ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, আপনি তাকে ভুলে গেছেন না কি?

—দূর পাগলি! তা কি ভোলা যায়! নৌকো লাগল যে!

—এই আমাদের ঘাট! ও ঠাকুরপো, ঠাকুরপো, ওঠ ভাই, বাড়ী এসে পড়েছি।

পরেশ ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল। নৌকা হইতে নামিয়া পথ চলিতে চলিতে বিমল প্রশ্ন করিল, তুমি কোন খবর জান?

ছায়া বলিল, কিসের খবর?

—ওদের।

ছায়া মনে মনে হাসিয়া বলিল, কাদের দাদা ?

বিমল পূর্ব্ববৎ অনাসক্তের মত কহিল, প্রণয়কুমার আর তাঁর স্ত্রীর ?

ছায়া বলিল, জানি।—সে আর কিছু বলিল না।

বিমল কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া আবার বলিল; ভাল আছেন ?

– হ্যাঁ।

কিন্তু বিমলের ক্ষুধা ইহাতেও মিটিল না, অথচ ইহার পরে কোন প্রশ্ন করা যায়, তাহাও যেন সে ভাবিয়া পাইতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল, ছায়া আপনা হইতে যদি আরও কিছু বলে, তবে ভাল হয়।

ছায়া সবই বুঝিতেছিল। এইটুকু তাহার কাছে কত মিষ্ট, কত মধুর যে লাগিতেছিল, তাহা তাহার অন্তরই জানে।

প্রত্যেকটি প্রশ্নের সঙ্গে বিমলের মুখের কমনীয়তা যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছিল, আবার অতৃপ্ত-উত্তরে অতৃপ্তি ও হতাশা রূপ ধরিয়া মুখখানিকে বিবর্ণ করিয়া দিতেছিল। বিমল বার বার ছায়ার পানে চাহিয়া কথা খুঁজিতেছিল, ব্যাকুলতার তাহার অন্ত নাই। বুঝিয়া ছায়া বলিল, অনেক [illegible] আছে দাদা, বলবখ'ন।

[illegible] দাঁড়াইয়া পড়িল ; উদ্বিগ্ন স্বরে কহিল, এখনই বল।

—সে যে অনেক কথা।

—তা হ'ক্।

ছায়া পরেশকে আগে যাইতে বলিয়া, বিমলের পাশে পাশে চলিতে চলিতে বলিল, আপনাকে যে আজ হুগলী জেল থেকে ছাড়বে, সে খবর

ইন্দুই আমাকে চিঠি লিখে জানায়। আমি যাতে জেলের দরজায় থাকি, সে কথাও চিঠিতে সে লিখেছিল।

বিমল নীরব। এই মুহূর্ত্তে তাহার মনে হইল, পৃথিবীটা তত ঘৃণ্য, তত জঘন্য নহে।

ছায়া বলিল, সে নিজে আসবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছিল, সঙ্গে আসবার লোক না পেয়ে আসতে পারলে না। কত দুঃখ করে আমায় চিঠি লিখেছে।

—তাঁরা এখন কোথায়?

—কুমিল্লায়। তোমার জেল হবার পরই ইন্দু জোর করে প্রণব-মামাকে বদলী করিয়ে নিয়ে চলে যায়।

আকাশ হইতে চন্দ্র সুধা-বৃষ্টি করিতেছিল, পল্লীর স্নিগ্ধ শ্যামলতা তাহাতে স্বপ্নের জাল বুনিতেছিল। নৈশ ধরিত্রী কি অপরূপ সুন্দরী!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রত্যূষে, ছায়া বিমলকে চা করিয়া দিয়া বলিল, দাদা, মুড়ী খাবে? এদেশে তোমাকে বিস্কুট, টোষ্ট, কিছুই ত দিতে পারব না।

গত রাত্রে খাইতে বসিয়া তাহাদের মধ্যে একটা আপোষ হইয়া গিয়াছিল। তাহার ফলে দাদাকে ছায়া আপনি ছাড়িয়া তুমি বলিতে সুরু করিয়াছে।

—আমি চায়ের আশাও করি নি ছায়া। এ দুর্ল্লভ সামগ্রী তুমি পেলে কোথায় তাই ভাবছি। তুমি খাও বুঝি?

—না, এখানে এসেই ছেড়েছি।

—ছাড়বারই কথা। এই অকৃত্রিম প্রাকৃতিক আবেষ্টনের মধ্যে চা'টা নিতান্তই কৃত্রিম বলে মনে হয়। মুড়ী তার চেয়ে অনেক ভাল। না, না, এত সকালে নয়, খানিক পরে দিও।

—সেই ভাল। স্নান ক'রে এসে আমি মুড়ী ভাজব, তুমি গরম গরম খেও। কাঁচা লঙ্কা চাও, আমার বাগানে তাও আছে—বলিয়া ছায়া অঙ্গুলিসঙ্কেতে প্রাঙ্গণের ক্ষুদ্র বাগানটি দেখাইয়া দিল। নানা রকমের গাছপালা-লতায় উঠানখানি সবুজ হইয়া আছে।

—তোমার দেওরটি কোথায়? সকাল থেকে তাকে দেখছি নে যে!

ছায়া হাসিয়া বলিল, খালধারে মাছের চেষ্টায় গেছে। রাত্রে নদীতে মাছ ধরে জেলেরা খুব সকালেই ফেরে, সেই সময় তাদের না ধরতে পারলে মাছ পাওয়া যায় না!

—আমার জন্যে এত হাঙ্গাম না করলেই পারতে!

—শুধু তোমার জন্যেই নয়। আজ একাদশী, এ দিনটায় মাছের লোভ ছাড়তে পারি নে।—বলিতে বলিতে তাহার মুখটি ম্লান হইয়া আসিল।

এ বিমর্ষতার কারণ বিমল বুঝিল, প্রসঙ্গ-পরিবর্ত্তনমানসে কহিল, ছায়া, তুমি কখনও কাশী গিয়াছ? আমি কখনও যাই নি।

—গেছি দাদা।

—খুব বড় জায়গা, না?

—উঃ, মস্ত বড় দাদা।

বিমল চিন্তিত ভাবে বলিল, তাইত! মা'র ঠিকানাটা ত জানা নেই। খুঁজে বার করব কি ক'রে বল ত?

ছায়া বলিল, তুমি দু' চার দিন থাক না, আমি তাঁর ঠিকানা আনিয়ে দোব।

—তুমি কি করে পাবে আমার মার ঠিকানা?

—পাব।

—কেউ চেনা লোক আছে বুঝি সেখানে? তা থাকলেই বা, তিনি আমার মা'কে চিনবেন কেমন করে?

—তা নয়।

—তবে?

ছায়া সে কথার কোন উত্তর না দিয়া হঠাৎ উল্লাসভরে কহিল, আরও এক উপায় আছে দাদা। কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে বিকেলে বসলে যাকে দরকার, তাকেই পাওয়া যায়।

বিমল সাশ্চর্য্যে কহিল, কি রকম?

—দশাশ্বমেধ ঘাটে বিকেলে আসেন না, এমন বাঙালী কাশীতে থাকেন না। সেবার আমরা ক'দিন ছিলাম কাশীতে, রোজ বিকেলে দশাশ্বমেধে আসতুম। রোজই কত চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হত। কেউ গান শুনতে আসে, কেউ কীর্ত্তন শুনতে আসে, কেউ ভিড় দেখতে আসে। কেউ নৌকা বেড়াতে আসে, কেউ তপ-জপ করতে আসে, কেউ শুধু বসে থাকতেই আসে। রোজ বিকেলে দশাশ্বমেধে যেন রথ-দোলের মেলা বসে যায়। আর বুড়ো-বুড়ীর ভিড়ই বেশী।

—আর কোন বেড়াবার যায়গা বুঝি নেই কাশীতে?

—ও মা! তা আবার নেই! কত—শত—জায়গা আছে। তবু যে দশাশ্বমেধে এত ভিড় হয় তার কারণ হচ্ছে, বাঙালীদের সঙ্গে দেখা এখানে হবেই, তাই সবাই যায়। আর সে ভিড় কি সাধারণ ভিড়! ভিড় ঠেলে যেতে গায়ের চামড়া উঠে যায়।

বিমল দুঃখিত ভাবে বলিল, সে ভিড়ে আমার মা আসবেন না, তাঁকে ত আমি জানি। তুমি যে অন্য কি রকমে তাঁর ঠিকানা জোগাড় ক'রে ব বলছিলে?

ছায়া বলিল, সে ত পারিই। ক'দিন সময় লাগবে। তা লাগুক না সময়, সে ক'দিন তুমি এখানেই থাকবে, সে বেশ হবে। আমার মনে হবে, আমি সেই কলকাতাতেই আছি। কেমন?

—কিন্তু তোমার শাশুড়ীর কথা মনে হলে একদণ্ড এখানে থাকতে ভাল লাগে না। আমার ত সমস্ত রাত ঘুম হয় নি কি না, সমস্ত রাতই শুনেছি—কেঁদেছেন।

—আর আমি আজ ছ' মাসেরও বেশী দিনরাত ঐ দৃশ্য দেখছি।—বলিতে বলিতে ছায়ার কণ্ঠ সজল হইয়া উঠিল; তখনই সচকিত হইয়া কহিল, যত ভাবি দুঃখের কথাগুলো তোমার সামনে টেনে আনব না, ততই কি ছাই সেগুলো এসে পড়ে। তুমি বস দাদা, আমি স্নান করে আসি; মুড়ী ভেজে তোমায় দোব।—বলিয়া অভুক্ত চায়ের বাটীটি তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। বিমল দাওয়াতে বসিয়া শ্যামলতার উপর রৌদ্ররশ্মির খেলা দেখিতে লাগিল।

ইত্যবসরে পরেশ কচুপাতার এক মস্ত ঠোঙা লইয়া অঙ্গনে দেখা দিল।

বিমল দাওয়া হইতে নামিতে নামিতে জিজ্ঞাসা করিল, কি মাছ আনলে পরেশ ?

—আজ খুব ভাল ভাল মাছ পেয়েছি,—বলিয়াই সে থতমত খাইয়া গেল।

বিমল তাহা বুঝিয়া হাসিল, বলিল, তোমার বিরাট ঠোঙ্গাটি খুলে ফেল না ভাই দেখি, তোমাদের দেশের মাছ কেমন ?

পরেশের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সাগ্রহে কহিল, দেখবেন দাদা, দেখবেন। এই দেখুন!—বলিয়া সে মাটীতে রাখিয়া ঠোঙ্গাটি খুলিল। নদীর টাট্‌কা মাছ সদ্য পালিশ করা রূপার পাতের মত ঝক্ ঝক্ করিতেছে। পরেশ আঙ্গুল দিয়া কতকগুলা মাছ সরাইতে সরাইতে কহিল. চিংড়ীগুলো এখনও জ্যান্ত রয়েছে। আপনি খান চিংড়ী মাছ ?

—খাই বই কি পরেশ।

—বৌদি'কে মাছগুলো দিয়ে আসি, বলিয়া ঠোঙ্গাটি সযত্নে গুছাইয়া লইয়া পরেশ চলিয়া গেল।

পল্লীগ্রামের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় যাহাদের নাই, পল্লীগ্রাম তাহাদের সম্মুখে অনন্ত সৌন্দর্য্য ও অফুরন্ত বিস্ময় সৃজন করে। পল্লীর সর্ব্বত্র বিস্তৃত শ্যামলতা যেমন নয়ন-মনকে অনুভূতপূর্ব্ব আনন্দ দেয়, পল্লীবাসীর অনাসক্ত অলস প্রাণহীন কর্ম্মপ্রচেষ্টা তেমনই বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। একটি মধ্যবয়স্ক লোককে পথের ধারে দুই কৃশকায় গাভীকে ঘাস খাইতে দিয়া তাহাদেরই নিকটে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, বিমল ভাবিতেছিল, মানুষ এমন নিষ্কর্ম্মা ও অলস হইতে পারে কেমন করিয়া ? আর একটি লোক. সম্ভবতঃ জাতিতে ব্রাহ্মণ, গলায় পৈতার গোছা গোলাকারে জড়ান. এক

হাতে একটি চকচকে গাড়ু লইয়া অন্য হাতে দাঁতন ঘসিতে ঘসিতে গো-চারণরত লোকটির পাশে বসিয়া ঘণ্টাখানেক কেমন কাটাইয়া দিলেন, দাওয়ায় বসিয়া বসিয়া বিমল তাহাই ভাবিতে লাগিল।

ছায়া আসিয়া তাহার চিন্তাধারা ছিন্ন না করিলে সে হয়ত সেই দৃশ্যেই ডুবিয়া থাকিত! একখানি সরায় মুড়ী আনিয়া ছায়া ডাকিল, দাদা! বিমলের তন্ময়তা ভাঙ্গিয়া গেল। হাসিয়া বলিল, তোমার দেশের লোক-গুলো কি কুড়ে ভাই! ঐ দেখ-না, দু' দু'টো মদ্দ মিন্‌সে কাজ নেই কর্ম্ম নেই, বসে বসে গল্পের জাবরই কাটছে।

ছায়া হাসিয়া বলিল, এ তোমাদের সহর নয় দাদা যে নাকে মুখে গুঁজে সকাল হতে না হতে আপিস ছুটতে হবে—দেরী হলে সাহেব রাগ করবে। আমাদের পাড়াগাঁয়ের লোক অমনি বসে দাঁড়িয়ে থিতিয়ে জিরিয়েই চলে। সারাদিন গল্প করে, তাস পাশা খেলে, যাত্রা গান করে, বসে বসে পরনিন্দা পরচর্চ্চা করে। চাষে যা ধান পায়, তাইতেই সারা বছরের মোটা ভাত কাপড়টা হয়ে যায়, বেড়ার ধারে শাকশব্জী দু'টো লাগিয়ে রেখে দেয়, তরকারীর কাজ তাইতেই চলে যায়, নুন তেলের দু'চারটে পয়সা জুটেই যায়। কেন এরা বসে বসে গল্প করবে না বল?

বিমল বলিল, তা যা বলেছ ছায়া! ওদের মত স্বল্পে সন্তুষ্ট হলে দৌড়-ঝাপ না করলেও চলে। আমরা ত অভাব তৈরী করে দুঃখ ডেকে আনি বৈ ত না!

ছায়া বলিল, ঐ যে বামুনটি, দেখছ, উনি আমাদের নিবারণ কাকা, গ্রাম সম্পর্কে। সামান্য গেরস্থ, ক'বিঘে জমিতে ধান-চাষ আছে, তাইতেই উনি কি বছর দুর্গা পূজা করেন।

পরেশও এক সরা মুড়ী লইয়া আসিয়া তাহার পার্শ্বে বসিয়া চিবাইতে লাগিল। ছায়া বলিল, তুমি ঠাকুরপোকে ভাই বলে ডেকেছ, ওর আনন্দ আর ধরে না।

পরেশ লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া উঠিল।

বিমল বলিল, চিঠিখানা লিখতে ভুল না দিদি।

ছায়া হাসিয়া বলিল, বললে আমি টেলিগ্রামে ঠিকানা আনিয়ে দিতে পারি।

বিমল মুড়ীর সরা সরাইয়া রাখিয়া সাগ্রহে বলিল, টেলিগ্রামে? সে কি করে হবে?

—হবে। দাঁড়াও, তোমার কাছে আর লুকোব না। —বলিয়া সে ভিতরে চলিয়া গেল। এক মিনিট পরে ডাকের একখানা খাম লইয়া ফিরিয়া আসিল। খামখানা বিমলের পানে অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিল, পড়ে দেখ।

বিমল জিজ্ঞাসিল, কার চিঠি?

—আমার। দেখই না।

বিমল হাত বাড়াইয়া খাম লইয়া ইংরাজীতে লেখা শিরোনামা পড়িল, ছায়ার নাম। হাতের লেখাটা যেন বড় পরিচিত। বলিল, কে লিখেছে?

ছায়া রাগতভাবে বলিল, পড়ে দেখতে দোষ কি!

—অন্যের চিঠি—

—সেই অন্যেই যখন পড়তে দিচ্ছে।

চিঠি খুলিয়া বিমল পড়িল।

ভাই ছায়া...দিন তাঁহাকে হুগলীর জেল হইতে ছাড়িবে। তুমি

অতি অবশ্য জেলখানার সামনে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইও। কিছুদিন তোমার কাছে রাখিয়া সেবা যত্ন করিও। আমার সে সৌভাগ্য হইল না। আমার মত দুর্ভাগিনী কেহ আছে কি?

হুগলীতে যে পুল আছে, সেই পুলের পাশেই জেল। তোমার রামপুর হুগলী হইতে 'ত বেশী দূর নয়। নৌকা বা গরুর গাড়ীতে যাওয়া যায়।

আমি যাইতাম, অন্ততঃ একটি দিনের জন্যও যাইতাম, কিন্তু উনি ছুটি পাইলেন না। অন্য লোক সঙ্গে যাইবারও কেহ নাই।

তাঁহার মার জন্য তাঁহাকে চিন্তিত হইতে বারণ করিও। আমি প্রতি মাসে পঞ্চাশটি টাকা হাত-খরচ পাই, সেই টাকা কাশীতে পাঠাই। মা' যে আমাকে কত ভাল বাসিতেন, তা শুধু আমিই জানি। ভাই, তিনি যে আমারও মা।

তুমি সমস্ত সংবাদ আমাকে লিখিও। জেলখানা হইতে আসিয়া শরীর বোধ হয় খুব খারাপ হইয়াছে। তুমি তাঁহাকে যত্ন করিও। ভাই ছায়া, আর লিখিতে পারিলাম না।

তোমার ইন্দু।

বিমল চিঠিখানা ভাঁজ করিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে বলিল, সত্যিই ছায়া, মা তাকে বড় ভালবাসতেন!

কথাগুলার ভিতর বেদনার যে সুর ঝঙ্কৃত হইতেছিল, তাহাতে ছায়ার মুনটা বায়ুতাড়িত পত্রের মত কাঁপিতেছিল।

বিমল বলিল, যাক্, কাশী যাওয়ার আর তাড়া নেই। ইন্দু যা করেছে, তার চেয়ে বেশী আমি আর কি করতে পারতুম বল?—বলিয়া সে ছায়ার পানে চাহিল। ছায়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিমল বলিল, ভালই হ'ল ভাই। নিশ্চিন্ত মনে এইবার সুন্দরবনে গিয়ে লাঙ্গল ধরি।

—লাঙ্গল ধরবে দাদা?

—তা ছাড়া আর উপায় নেই দিদি! চাকরী জোটে না, ব্যবসা করবার পয়সাও নেই, ভেবে-চিন্তে তাই—চাষ-বাসই করব ঠিক করেছি। সে বুঝি তোমায় বলি নি?

—না। লাঙ্গলই যদি ধরতে হয়, সুন্দরবনে কেন? এদেশ কি দোষ করেছে দাদা?

বিমল হাসিল।

ছায়া বলিল, হাসি নয় দাদা। ঠাকুরপোকেও আমি স্কুল ছাড়িয়ে দিয়েছি, তাকেও চাষ করতে লাগাব। দাঁড়াও, ভাতটা চড়িয়ে, মা'কে একটু জল খাইয়ে এসে বসছি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চায়ের পেয়ালায় ধোঁয়া উঠিতে সবাই দেখিয়াছে, কিন্তু চায়ের পেয়ালায় ঝড় উঠিতে কেহ দেখিয়াছ কি? আমি দেখিয়াছি। সেই কথাই বলিব।

কুমিল্লা সহরের সাহেবপাড়ার একটি বাঙ্গলো। বর্ষাকাল, সারারাত্রি বৃষ্টি হইয়াছে, ভোরের দিকেও টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল, এই মাত্র বৃষ্টি

বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু আকাশের মুখের ভাব যেরূপ গোমড়া রহিয়াছে, তাহাতে এখনই ধারা নামা আশ্চর্য্য নয়। বাঙলোটির সামনে মাঝারি একটি ফুলবাগান, ধারাবর্ষণ সত্ত্বেও কতকগুলি গাছ বিবর্ণ ফুলগুলিকে অঙ্গে ধারণ করিয়া সদ্যোবিধবা নারীর মত সন্তান-ক্রোড়ে দাঁড়াইয়া আছে। বাঙলোর পিছন দিয়া খরস্রোতা গোমতী নদী প্রবাহিতা। অন্য সময়ে নদীটির দুই পাড়ে প্রশস্ত সাদা বালির চর পড়িয়া থাকে, বর্ষায় পাড় ভরিয়া, চর ঢাকা পড়িয়া গোমতী কূলে কূলে ভরিয়া উঠে। আজও নদী কূলে কূলে ভরা—বাঙলোখানির বাঁশের রঙীণ বেড়ার রঙ ধুইয়া ফুলগাছের গোড়াগুলিতে ফেমা জমাইয়া দিয়া, বহিয়া যাইতেছে।

আজ প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া মুখ ধুইতে যাইবার সময় ইন্দু বাঙলোর বারান্দায় দাঁড়াইয়া অপলক নেত্রে সেই দৃশ্যই দেখিতেছিল। শহরের মেয়ে, শহরে লালিত পালিত, শহরে বর্দ্ধিত, নদীর এমনি ভরাট, এমন বিরাট, এমন মহান্, এমন সুন্দর রূপ আর কখনও দেখে নাই, আজ দেখিয়া তাহার আশা মিটিতেছিল না। নদীর জল তর্ তর্ বেগে একদিকে ছুটিয়াছে, কোথাও স্রোত ঘূর্ণাবর্ত্তে ছুটিতেছে, কোথাও জ্যানিক্ষিপ্ত শরের মত তির্য্যক্ গতিতে ছুটিতেছে, কোথাও একটু সংঘর্ষজনিত তরঙ্গের উদ্ভব হইতেছে। পরপারের জল যেন কতকটা স্বচ্ছ, মধ্যদেশে স্বচ্ছতা কমিয়া আসিয়াছে, এপারের জল অত্যন্ত ময়লা, গিরিমাটির রঙ। স্রোতের সঙ্গে কোথায় ছোটখাট গাছপালা ভাসিয়া চলিয়াছে, বন-বিল ভাসা শ্যাওলী, শাপলাফুল কোথাও ডুবিয়া, কোথাও ভাসিয়া, কোথাও আধডোবা আঁধভাসা হইয়া ছুটিতেছে, কোথাও খড়-কুটা ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া কিছুক্ষণ ঘুরিতেছে, আবার আবর্ত্তমুক্ত হইয়া স্রোতোবেগে

ধাইয়া চলিতেছে। কোথায়ও একটি জনপ্রাণী নাই, যতদূর দৃষ্টি চলে—জল, কেবল জল। নদী-মাঠ সব একাকার হইয়া গিয়াছে। অনেক দূরে, প্রায় দৃষ্টিচক্রের শেষপ্রান্তে একখানি গ্রাম যেন দেখা যায়, হয়ত জল সেই পর্য্যন্ত ছুটিয়াছে।

বেহারা আসিয়া সেলাম করিয়া কহিল, হুজুর, চা টেবলপর্।

ইন্দু ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, সাবকো গোসল হো গিয়া?

—জী।

ইন্দু ত্বরিতপদে প্রাতঃকার্য্যাদি সমাপন করিয়া যখন ভোজনকক্ষে উপস্থিত হইল, প্রণয়ের এক প্রস্থ চা-পান হইয়া গিয়াছিল।

ইন্দু হাসিমুখে কহিল, শুধু চা খাওয়া হল বুঝি?

প্রণয় বলিলেন, ওটা বেড-টী'রই সামিল।

ইন্দু এগ্-ফিলিপ্ করিয়া, টোষ্ট সাজাইয়া, আবার চা ঢালিয়া দিল, প্রণয়কুমার সুখভোজন করিতে করিতে বলিলেন, আজ যাচ্ছ ত?

ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, কোথায়?

—ওয়েষ্টের ড্যান্স-ডিনারে।

—না।

—না কেন?

—সেদিনই ত বললুম, আমার ভাল লাগে না।

কি ভাল লাগে না, কেন ভাল লাগে না, এ সকল প্রশ্ন প্রণয়ের মনেই আসিল না; তিনি বলিলেন, যাওয়া কিন্তু উচিত।

কেন? ভাল না লাগলেও যেতে হবে?

—নিজের ভাল লাগাটাই যারা বড় করে দেখে, তাদের কথা তাই বটে ; কিন্তু অন্যের ভাল লাগাটাও দেখতে হয়।

ইন্দু নিজের কাছে যেন নিজেই কৈফিয়ৎ দিতে বলিল, অন্যেরই বা কি যে ভাল লাগে তা ত জানি নে। সেন সাহেবের বাড়ীর নাচে আমাকে গোড়ার দিকে সবাই টানাটানি করেছিল বটে, তারপর আমি যখন রাজী হলুম না, সবাই ত জোড় বেঁধে বেঁধে বাঁদরামী করতে লাগল। আমার জন্য কেউ ত বসে রইল না।

প্রণয় গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন, তুমি ওকে বাঁদরামী বল ?

—বলিই ত !

—তা হ'লে আমিও বাঁদর ?

ইন্দু তাঁহার গম্ভীর মুখভাব দেখিয়া ও গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া হাসিয়া ফেলিল, বলিল, বাঁদরেই কেবল বাঁদরামী করে না, কখন কখন মানুষেও করে।

প্রণয় বলিলেন, সমস্ত সভ্য সমাজটাই তা হ'লে বাঁদর সমাজ ?

ইন্দু এই প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়া, চায়ের বাটীতে চামচ ডুবাইয়া আস্তে আস্তে নাড়িতে লাগিল। তাহার অধরে হাসির রেখা স্ফূর্ত্ত ছিল কি ছিল না বলা যায় না, প্রণয় হাস্যরেখা কল্পনা করিয়া মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিলেন। যুক্তিতর্কের পথ ছাড়িয়া দিয়া এবার স্পষ্ট ভাষায় আদেশ জ্ঞাপন করিলেন ; বলিলেন, আজ তোমায় যেতে হবে।

ইন্দু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, উঁহুঁ।

প্রণয় কঠিনকণ্ঠে কহিলেন, আমি কথা দিয়েছি, তুমি যাবে।

—আমায় না জিজ্ঞেস করে তুমি কথা দাও কেন ?

—যাওয়া উচিত, যেতে হবেই, তাই কথা দিয়েছি।

—আমি যাব না। আমার ভাল লাগে না, আমি যাব না, এই শেষ কথা।

প্রণয় ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। এতক্ষণ পর্য্যন্ত বাহিরে তাহা অপ্রকাশিতই ছিল কিন্তু আর সম্ভব হইল না, কহিলেন, আমারও এমন অনেক কাজ করতে হয়, যা আমার ভাল লাগে না।

কথাগুলা বলিয়া নিজের কাণেই খাপছাড়া ও অসম্পূর্ণ বোধ হইল, তাই সম্পূর্ণ করিবার মানসে কহিলেন, নিজের ভাল লাগে না, তবু অন্যের মুখ চেয়ে অনেক কাজ আমাকেও করতে হয়।

ইন্দু সহাস দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, কর কেন?

প্রণয় বলিলেন, অন্যের ভাল লাগে বলে।

ইন্দু বলিল, আমি হলে তেমন কাজ কখনও করতুম না। আমার যা ভাল লাগবে না, তা আমি করব না। কারুর মুখ চেয়েও করব না।

প্রণয় ক্ষণকাল কঠোর দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কঠিনতম কণ্ঠে কহিলেন, সেই ভ্যাগাবণ্ডটার মা'কে কাশীতে টাকা পাঠাতে আমার ভাল লাগে না, তবু—

'ভ্যাগাবণ্ড' কথাটা ইন্দুর বুকে বিঁধিয়াছিল, কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। আপনাকে সে ক্ষণেকের জন্য হারাইয়া ফেলিয়াছিল, পর-মুহূর্ত্তেই সংযম ফিরাইয়া আনিয়া কহিল, সে টাকা ত তুমি দাও না, দিই আমি।

—টাকা আমার।

—যে মুহূর্ত্তে আমায় দাও, সেই মুহূর্ত্ত থেকে সে টাকা তোমার নয়।

—তুমি নষ্ট করছ দেখলে আমি টাকা বন্ধ করতে পারি।

—তা পার।—বলিয়া ইন্দু অভুক্ত চায়ের পেয়ালাটা সরাইয়া দিল। বোধ হয় মন চঞ্চল হইয়াছিল, হাতের গতিতেও চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইয়াছিল। তাহাকেই তাহার ক্রোধ কল্পনা করিয়া প্রণয়কুমার অধিকতর কঠিন হইয়া উঠিলেন। অধিকতর কঠিন আঘাত করিবার জন্য ভাষা খুঁজিতে লাগিলেন। কামরার জানালা দিয়া পরিপূর্ণদেহা নদীটি দেখা যাইতেছিল, ইন্দু সেই দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। তাহার এই অসাধারণ নির্লিপ্ততা ও ঔদাসীন্য দর্শনে প্রণয়কুমার আরও জ্বলিয়া উঠিলেন; বলিলেন, লোফারটার জন্যে তোমার যত দরদ—

ইন্দু ধীরকণ্ঠে কহিল, তুমি তাঁর নাম ত জান! নাম ধরে কথা বললেই ভাল হয় না কি?

প্রণয় অধীরভাবে কহিলেন, না, নাম জানিনে, জানবার দরকারও নেই।

—আজ দরকার না থাকতে পারে, যখন তাঁর মা'কে কাশী পাঠিয়েছিলে, তখন দরকার ছিল নিশ্চয়। তখন সে দরদ দেখাতে আমি বলি নি। তা'তে যে খরচ হয়েছিল, তা করতেও আমি বলিনি।

—মনুষ্যত্ব—

ইন্দু হাসি চাপিয়া বলিল, তাই হবে।

প্রণয় চীৎকার করিয়া বলিলেন, তাই হবে! তার মানে?

ইন্দু নীরব।

প্রণয় পুনরায় চীৎকার করিয়া বলিলেন, তার মানে?

—না-ই বা শুনলে?

—না, আমি শুনতেই চাই।

ইন্দু ধীর সংযত কণ্ঠে কহিল, কি হবে শুনে? অপ্রিয় কথার যত কম আলোচনা হয়, ততই ভাল নয় কি?

প্রণয় পূর্ব্ববৎ কহিলেন, ভাল-মন্দর বিচার থাক্, আমি শুনতে চাই।

কথাটা কি তাহা জানি না, তবে ইন্দু কথাটা বলিতে উদ্যত হইয়াছিল, প্রায় যেন বলিয়া ফেলিয়াছিল, কি ভাবিয়া বলিল না, কহিল, থাক্।

প্রণয় চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া জলদগম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, তুমি বলবে কি না, তাই আমি জানতে চাই।

ইন্দু নম্রস্বরে কহিল, চেঁচাচ্ছ কেন? চাকর-বাকরেরা কি ভাবছে বল ত?

—ভাবুক। আমি শুনতে চাই।

—কিন্তু আমি বলতে পারব না।

দুই ঘূর্ণায়মান রক্তচক্ষুতে চাহিয়া প্রণয় বলিলেন, বলতেই হবে, না বললে আমি ছাড়ব না।

ইন্দু এক মিনিট কি ভাবিল, তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, বলব, কিন্তু এক সর্ত্তে।

প্রণয় বলিলেন, কি?

ইন্দু বলিল, তুমি কথা দাও, তারপর আর আমার মুখ দর্শন করবে না।

প্রণয়কুমার নির্ব্বাক বিস্ময়ে ইন্দুর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। সাপ যেমন ঈশের মূলের গন্ধ পাইলে স্তব্ধ ভাব ধারণ করে, তাঁহারও সেই অবস্থা ঘটিল।

ইন্দু বলিল, তোমাকে ভয় দেখাইবার জন্যে ও কথা আমি বলি নি।

কথাটা খুবই তুচ্ছ, দোষেরও হ'ত না, যদি না তুমি আমাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জানা কথাটা বার করতে চাইতে।

প্রণয় বিস্মিতের মত কহিলেন, জানা কথা? কার জানা কথা?

ইন্দু বলিল, তোমারই জানা কথা? তোমার মনে যা আছে, থাকত; আমারও মনে যা আছে থাকত। এ হলে কথাটা তেমন দোষের হ'ত না; কিন্তু আমায় বলতে হলে কথাটা নোংরা হয়ে দাঁড়াবে।

প্রণয়কে নির্ব্বাক দেখিয়া ইন্দু বলিল, শুনতে চাও?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু এখানে নয়, ঘরে চল। দোর বন্ধ ক'রে, ঘর অন্ধকার ক'রে বলব।

—তার মানে?

—তার মানে এই যে, সে কথা বলতে হলে আমার নারীত্বকেও ধিক্কার দিতে হবে। আর সে কথা বলার পরে কোন ভদ্রনারী ভদ্রনারী থাকতে পারে না। চল, বলছি। কিন্তু তুমি আমার সর্ত্তে রাজী?

ইন্দুর অধরকোণে তখনও হাসির রেখা; তাহার খঞ্জন-গঞ্জন নয়ন দু'টি তখনও রহস্যালোকে উজ্জ্বল, চঞ্চল। অঙ্গের ভাবে ভঙ্গীতে, তাহার এতটুকু অধীরতা নাই, একটু চাঞ্চল্য নাই, রাগ-দ্বেষের কোন চিহ্ন মাত্র নাই। প্রণয়ের বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

ইন্দু দাঁড়াইয়া উঠিয়া, টেবিলের উপরে রক্ষিত প্যান্ট্রী, ভাঁড়ারের চাবির-তাড়াটি তুলিয়া লইয়া দ্বারের দিকে চলিতে চলিতে বলিল, কথাটা বলব কিন্তু বলার পরে—যা হবার হক্ সে ভেবে আর কি হবে! দেখ,

আজ তুমি সেই 'লোফার'টার মার কথা তুলে একটা নোংরা ইঙ্গিত করলে, তাই ; নইলে যে কথা আমি এখন বলব, সে কথাটা ভাবতে আমার আনন্দই হ'ত, সুখই হ'ত।

কথা বলিতে বলিতে ইন্দু শয়নকক্ষের দ্বারের সম্মুখে আসিয়া একহাতে পর্দাটা সরাইয়া ধরিয়া কহিল, এস।

প্রণয় আপিস-কামরার দিকে চক্ষু রাখিয়া কহিলেন, আমি ডাকটা দেখে আসছি।

—ডাক পরে দেখ, এস।

প্রণয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘরে ঢুকিতে বাধ্য হইলেন। ইন্দু দ্বারটা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল, বস।

নিজে বিছানার প্রান্তে বসিয়া বলিল, 'লোফার'টার উপর দরদ আমি দেখাই, তুমি বলেছ, কথাটা মিথ্যে নয়, সত্যিই তাঁর উপর আমার দরদ আছে। কিন্তু তোমার পয়সা দিয়ে দরদ দেখাবার প্রবৃত্তি আমার হত না, যদি না আমি জানতুম, তাঁদের দুঃস্থ অবস্থার জন্যে তুমিও দুঃখ অনুভব করছ। তাঁকে জেল তুমিই দিয়েছিলে, তিনি তাঁর মা'র একমাত্র সন্তান, সেই সন্তান জেলে গেলে তাঁর মা হয়ত অনাহারে মারা পড়বেন, এই ভেবে তুমি তাঁর মা'কে কাশী পাঠিয়েছিলে খরচপত্র দিয়ে, একথা তুমিই একদিন বলেছিলে। কিন্তু আমার কি মনে হয়েছিল জান? আমার মনে হয়েছিল, সেটুকু আমার মুখ চেয়েই তুমি করেছিলে, তুমি জানতে, তাঁদের আমি ভালবাসি—ইন্দু এক মুহূর্ত থামিয়া আবার বলিল, তাঁরা আমার আপনার লোক, তাঁদের কষ্ট দূর করেছ জানলে আমি সুখী হব, এই ভেবেই তুমি সে কাজ করেছ। এতে এক দিকে তোমার উদারতা,

অন্য দিকে আমার উপর তোমার শ্রদ্ধা ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছিল, তাতে আমি সুখী হয়েছিলুম। এখন দেখছি—

প্রণয় বলিলেন, থামলে কেন? বল, এখন কি দেখছ সেটাও বল।

—এখন দেখছি, শ্রদ্ধা ভালবাসা কিছুই নয়, পাছে তুমি তাঁকে জেলে দিয়েছ বলে আমি বিরূপ হই, উদারতাটুকু শুধু সেই জন্যেই দেখিয়েছিলে।

—তাই যদি সত্যি হয়, দোষটা হয়েছে কি?

—সে শুধু লোভ দেখিয়ে পাখীকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা বই ত নয়!

—তা হলে আমি নিজে থেকেই তোমাকে সব বলতুম। কিন্তু তুমি জান, বিয়ের প্রায় পনের দিন পরে ছায়ার সঙ্গে কথায় বিমলের জেলের কথা বেরিয়ে পড়ে, তাঁর মার কাশী যাওয়ার কথাও বার হয়। আমি ইচ্ছে করে বলি নি।

—বল নি সত্যি! কিন্তু তুমি ভেবেছিলে, তাঁর জেলের খবরটা আমি অন্য দিক থেকে জানতে পারবই; সেই ভেবেই তাঁর মাকে কাশী পাঠিয়ে তুমি সাধু সেজে বসেছিলে!

প্রণয় একটু একটু নরম হইয়া আসিতেছিলেন, এই কথায় আবার গরম হইয়া উঠিলেন। গরম হইবার অন্যান্য কারণও ছিল। ইন্দু যে তাঁহার সুকল্পিত অভিসন্ধি ধরিয়া ফেলিয়াছে, ইহা তাঁহাকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়া ফেলিয়াছিল। তাঁহার কাণ মাথা ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল, তিনি কি যে বলিবেন, কি যে করিবেন ভাবিয়া পাইতেছিলেন না।

ইন্দু বলিল, আমার দরদ, সে ত আছেই। যতদিন পর্য্যন্ত তিনি

উপার্জ্জনক্ষম না হন্ ততদিন পর্য্যন্ত তাঁর মা'র খরচ আমাকে পাঠাতেই হবে।' আমার বাবা অক্ষম ন'ন, আমার অনুরোধ হাসিমুখেই তিনি রাখবেন।

প্রণয়কুমার এতক্ষণে সশস্ত্র হইয়া বলিলেন, তবু দরদ দেখাতেই হবে? উঃ!

ইন্দু বলিল, মনুষ্যত্ব কথাটা তুমি ব্যবহার করেছ, তাই সেই নোংরা কথাটা আর আমি বলব না। আমি বলব, কর্ত্তব্যবোধ।

প্রণয়কুমার উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, ফুঃ! কর্ত্তব্যবোধটা কি সমস্ত জেলখাটা লোকের মায়েদের জন্যই জাগে, না শুধু সেই—

ইন্দুর মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, বলিল, ও সম্বন্ধে আর কোন কথাই আমি বলব না। অন্য কথা থাকে, বল।

প্রণয় বলিলেন, ওয়েষ্টের ডিনারে তোমায় যেতে হবে।

—না। কোন ডিনারেই আর না।

—তার মানে?

—মানে কি স্পষ্ট নয়?

এই সময়ে বাহির হইতে দ্বারে কে 'নক্' করিতে লাগিল। প্রণয় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, কৌন্ হ্যায়?

—হুজুর, ম্যাজিষ্টর সাব আয়া হ্যায়!

—আস্তে হেঁ।

মেজাজ ও কণ্ঠস্বর এক মুহূর্ত্তে নিম্ন পর্দ্দায় নামিয়া আসিল; তখনই দ্বার খুলিতে হইল। আপিস-কামরার বারান্দায় দাঁড়াইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট গোমতীর পানে চাহিয়াছিলেন, প্রণয় আসিতে কহিলেন,—তোমায় বিরক্ত

করিলাম, দুঃখিত। কিন্তু ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার অনেকগুলি গ্রাম প্রবল বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে, তোমাকে এই মুহূর্ত্তে রিলিফে যাইতে হইবে।

প্রণয়কুমার নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন, কহিলেন, এখনই যাইতেছি, স্যার।

সাহেব আবশ্যক দুই চারিটা কথা বলিয়া বিদায় লইলেন। প্রণয় শয়নকক্ষে ফিরিলেন। ইন্দু কোণের টেবিলে বসিয়া চিঠি লিখিতেছিল, প্রণয় পার্শ্বে দাঁড়াইলেন, ইন্দু সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না। প্রণয় চিঠি পড়িলেন—

শ্রীচরণেষু,

বাবা, বিমলদার যত দিন কাজকর্ম্ম না হয়, তত দিন তুমি তাঁর মাকে কাশীতে কিছু কিছু টাকা পাঠাইও। তাঁর কাশীর ঠিকানা নীচে দিলাম। আমি ক'মাস পঞ্চাশ টাকা করিয়া পাঠাইয়াছি, আর আমি পাঠাইতে পারিব না। এই মাস হইতেই তুমি পাঠাইও।

তোমার আদরের ইন্দু।

প্রণয় বলিলেন, আমি মফঃস্বলে যাচ্ছি।

ইন্দু কথা কহিল না।

প্রণয় হাসিয়া বলিলেন, তোমার বড্ড রাগ হয়েছে দেখছি!

ইন্দু কোন কথা কহিল না।

প্রণয় আদরের স্বরে কহিলেন, বিমলকে লোফার বলেছি বলে রাগ করেছ! বলাটা অন্যায় হয়েছে বটে! তুমি তাকে ভালবাস জেনেও কথাটা বলা আমার অন্যায় হয়েছে। কিন্তু ইন্দু, তোমারও অন্যায় আছে।

ইন্দু কথা বলিল না, নিজের অন্যায়টা জানিবার কৌতূহলও প্রকাশ করিল না।

প্রণয় বলিলেন, এখন আর তোমার হৃদয়ে অন্যের স্থান থাকা কি উচিত? তোমার ভালবাসা—

ইন্দু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিবা মাত্র প্রণয় নির্ব্বাক্ হইলেন। ক্ষণকাল পরে বলিলেন, তুমি বল তোমার মনে আর স্থান নেই, তা হ'লে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারি।

ইন্দু নির্লিপ্তের মত কহিল, সমুদ্রের তলে কি আছে না আছে কে বলতে পারে সে কথা!

প্রণয় স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন, আমি দু'তিন দিন পরে ফিরব।

ইন্দু কোন কথা কহিল না; যেমন নীরবে বসিয়া ছিল, তেমনই বসিয়া রহিল। প্রণয় কক্ষত্যাগে উদ্যত হইলে হঠাৎ উঠিয়া আসিয়া একটা প্রণাম করিয়া আবার স্বস্থানে আসিয়া বসিয়া জানালাটা খুলিয়া দিল।

বাহিরে তখন বৃষ্টি সুরু হইয়াছে। গোমতীর পরপার দেখা যায় না; এপারে গোমতীর বুক যেন আরও ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে।

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ছায়া বলিল, আজ ইন্দুর চিঠি আসবে।

বিমল জিজ্ঞাসা করিল, কিসে বুঝলে ?

ছায়া বলিল, একটু আগে তার আগের চিঠিটা বার করে তারিখ দেখছিলুম, যেদিন ডাকে দেয়, সেই দিন থেকে তিন দিনের দিন চিঠি আসে। তা হ'লে যায়ও তিন দিনের দিন। যেতে তিন দিন, আসতে তিন দিন, এই ছ'দিন লাগবে ত! আজ সেই ছ'দিন।

বিমল বলিল, তুমি বসে বসে এত হিসেব করছ ছায়া!

—আমার যে স্বার্থ রয়েছে দাদা, হিসেব না করে কি পারি ?

—তোমার আবার কি স্বার্থ ?

—গুরুতর স্বার্থ ?

বিমল হাসিয়া বলিল, শুনতে পাই না ?

ছায়াও হাসিল, কহিল, তা পেতে পার!—বলিয়া সে একটুখানি চুপ করিয়া রহিল; তারপর বলিল, সে কত ক'রে আমাকে অনুরোধ করলে, আমি যেন জেল থেকে তোমায় নিয়ে এসে আমার কাছে রাখি, যত্ন করি, সেবা করি—যেন ইন্দু না বললে করতুম না! আমার চিঠি পেয়ে সে জানবে, তুমি আমার এখানে আছ, তাতে তার কত আনন্দ হবে, কত কথা লিখবে আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে, আমি মনে মনে তার চিঠি পড়তেই পাচ্ছি।

—বল কি!

—সত্যি, পাচ্ছি। চিঠি যখন সে লিখছিল, তখনকার ছবিও আমি মন্ত্রের চোখ দিয়ে দেখতে পেয়েছি।

বিমল সহাস্যে কহিল, কি দেখলে বল ত ছায়া দিদি, একটু শুনি।

ছায়া বলিল, দেখলুম, দুটি চোখ দিয়ে তার জলের ধারা নামছে; একবার করে লিখছে, আর একবার করে চোখ মুছছে; মাঝে মাঝে চিঠিতেও ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে যাচ্ছে, আঁচলের খুঁট দিয়ে সন্তর্পণে জলের দাগগুলি মুছে ফেলছে, আবার লিখছে, যেখানে যেখানে তোমার কথা লিখছে, সেখানেই হু হু করে তার চোখের জল ঝরে পড়ছে, চিঠি শেষ করতে আর পারছে না।

বিমল বলিল, ছায়া, তোমার ভাই কবি হওয়া উচিত ছিল।

ছায়া হাসিয়া বলিল, তা বুঝি জান না দাদা! আমি প্রথম প্রথম বিলেতে কবিতায় চিঠি লিখতুম। অনেকগুলো চিঠি কবিতায় লিখেছিলুম, তারপর বেনাবনে মুক্তা ছড়ান ছেড়ে দিলুম।

বিমল ম্লান মুখে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

ছায়া পূর্ব্ববৎ কৌতুকভরে কহিতে লাগিল, একখানা চিঠিও কি ছাই কবিতায় পেলুম! সব চিঠিতেই সেই বাঁধা গন্ধ গৎ—তুমি কেমন আছ? আমি ভাল আছি! এতে কি কোন ভদ্রলোকের কবিত্ব থাকে, তুমিই বল? কিছুদিন পরে ত মূলেই হা-ভাত, চিঠিই বন্ধ!

একটু থামিয়া ছায়া আবার রঙ্গভরে কহিল, বেচারী আমার চিঠির চাপে চ্যাপ্টা হয়ে গেছল বোধ হয়, তাই চিঠিপত্তর আর লিখলে না। আমি রোজ সকালে একখানা, বিকেলে একখানা 'কাব্যি' লিখে রাখতুম, প্রত্যেক মেল্-ডে-তে পুরো চোদ্দখানা রয়েল 'কাব্যি' মেল্ ডাকে দিতুম।

—ছায়া ! শ্যা বলিল, বেলা যে

—কি ? সেরে আসি ।

বিমল বলিল, না থাক্ ! টিতে হাঁপাইতে

ছায়া ছাড়িল না, কহিল, থাকলে হবে না। দাদা, বলতে যে আমার কৌতূহল জাগিয়ে কথাটা বলবে না, আর অক্ষুধা, অনিদ্রায় আমি ছট্‌ফট্ করে করে মরব সেটি হবে না।

বিমল বলিল, নারী-চরিত্র কি অদ্ভুত, আমি শুধু তাই ভাবছি ছায়া।

—অদ্ভুত কি দেখলে ?

—অদ্ভুত নয় ? অশোকের কথা ভাবতে গেলে আমরা আড়ষ্ট হয়ে যাই, আর তুমি তাই নিয়ে রঙ্গ করছ কি করে আমি ত ভেবেই পাই না।

ছায়ার মুখে চোখে উজ্জ্বল হাসির আলো ফুটিয়া উঠিল ; বলিল, কেন, আড়ষ্ট হতে যাব কেন ? প্রভু এলেও সংসার পাততুম, এলেন না, তাতেও সংসার পেতেছি। এর চেয়ে ভালটা কি হ'ত দাদা, তুমিই বল !

হায়, সে কথা কি মুখ ফুটিয়া বলিবার, না, বলা যায় ! কথায় সে ভাব, সে ঐশ্বর্য্য, সে সুখ, সে সমৃদ্ধি রূপ পাইবে কি করিয়া ?

বিমলকে নীরব থাকিতে দেখিয়া ছায়া বলিল, ঐ ছেলেটাকে যদি মানুষ করতে পারি, আমি আর কিছু ভাবি নে দাদা ! ও চাষই করুক, লাঙ্গলই ধরুক, যাই করুক, মানুষ হ'ক এই আমি শুধু চাই। মানুষের মত মানুষ হ'ক, আর কিছু না। চিরকাল ও গরীব চাষী হয়েই থাক্, তাতে আমার দুঃখ নেই, শুধু মানুষ হ'ক।

বিমল ছায়ার মুখের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

ছায়া বলিল, মানুষের মত হ'ক। দেশকে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসুক,

—সত্যি, পাচ্ছি ...ছি পবিত্র হ'ক্, নিজের মা'কে সে ভালবাসুক, তাঁর
মন্তের চোখ দিয়ে দে... যেন কখনও একবিন্দু জল না পড়ে! গরীব হ'ক,
বিমল সহাস্যে ...া খেয়ে থাকতে হয়, তা'ও ভাল, কিন্তু যেন মানুষ হয়—
ছায়া বলি... ানুষ! আত্মসুখ আর আত্মবিলাস নিয়েই যেন তার জীবন
না কাটে।

কথাগুলা বলিতে বলিতে ছায়া যেন উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। কথাগুলার সঙ্গে প্রচ্ছন্নভাবে অশোক জড়িত ছিল, বোধ করি, তাহার নিষ্ঠুর অমানুষিকতার অনুভূতিবশেই সে উত্তেজিত হইয়াছিল, বিমলের পানে চোখ পড়িতেই লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল; আবার তখনই হাসিয়া ফেলিল। বলিল, লম্বা বক্তৃতা দিয়ে ফেললুম, না দাদা?

বিমল প্রতিবাদে বলিতে যাইতেছিল, না ছায়া, ঠিকই বলিতেছ, ছায়া তৎপূর্ব্বেই পুনরায় কহিল, জানি না পারব কি না, কিন্তু যদি ভগবান বিরূপ না হন, ঠাকুরপোকে আমি মানুষের মত মানুষই করব। হ'ক মূর্খ, হ'ক অসভ্য চাষা, মানুষ হ'ক, আমি ওকে মানুষ করে গড়ব। তোমাদের লেখাপড়া আর সভ্যতা মানুষকে যত অমানুষ করে, এমন আর কিছুতে নয়।

বিমল নিঃশব্দ, বুঝি নিস্পন্দ।

ছায়া বলিতে লাগিল, সভ্যতার আলোক যত বেশী গায়ে লাগে, মানুষ হয় তত অমানুষিক। ছেলে মাকে চেনে না, মা'র কথা মনে থাকে না; মা সন্তানের মুখ চান না, সন্তানের কথা তাঁর মনে থাকে না। এর নাম যদি সভ্যতা হয়, নাই বা পেল সভ্যতা। ঠাকুরপো আমার চিরকাল অসভ্য থাক, চিরকাল মূর্খ, চাষী থাক।

হঠাৎ উঠানের দিকে চাহিয়া ছায়া চমকিয়া উঠিয়া বলিল, বেলা যে পড়ে গেল গো! বস দাদা, আমি পুকুরের কাজগুলো সেরে আসি।

ছায়া প্রস্থানোদ্যত হইয়াছিল, পরেশ ছুটিতে ছুটিতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল, তোমার চিঠি এসেছে বৌদি!

ছায়া সোল্লাসে কহিল, নিশ্চয়ই ইন্দুর চিঠি। হ্যাঁ, এই দেখ—বলিয়া খামখানি বিমলের সম্মুখে ধরিল। বিমল দেখিল মাত্র, পরিচিত হাতের লেখা, চিনিতে বিলম্ব হইল না।

পরেশ বলিল, ডাক-পিওন কি বলছে জান বৌ-দি? বলছে, এ গাঁয়ে শুধু তোমাদের বাড়ীতেই চিঠি আছে, ছায়া দেবীর নামে, সেই জন্যেই দেড় ক্রোশ দূর থেকে তাকে এখানে আসতে হয়, সে একটা ঝুনো নারকোল চেয়েছে। দোব, বৌদি?

ছায়া কহিল, দাও গে ভাই, রান্নাঘরের কোণে ঝুনো নারকোল আছে ক'টা।

পরেশ ছুটিয়া চলিয়া গেল।

ছায়া বলিল, আমার হিসাবে ভুল হয় নি, দাদা, দেখলে ত! বলেছিলুম না, ছ'দিনের দিন চিঠি আসবে।

—দেখলুম বৈ কি! তা হ'লে আজ সাত দিন তোমার এখানে বসে আছি।

—তাতে হয়েছে কি?

—না; হবে আর কি! খাচ্ছিদাচ্ছি ঘুমোচ্ছি, বেশ আছি। সারাজীবন যদি এমনই থাকতে পারতুম!—বিমল একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

পরেশকে আসিতে দেখিয়া, ছায়া বলিল, ঠাকুরপো, দেখ ত ভাই, মা উঠেছেন কি-না! যদি উঠে থাকেন, তাঁর কাছে একটু বসগে, আমি আসছি।

পরেশ চলিয়া গেলে ছায়া বলিল, কে খুলবে চিঠি? তুমি, না, আমি?

—যার নাম লেখা আছে, সে খুলবে।

—আমি স্বাধিকার ত্যাগ করতে রাজী। তুমিই খোল, ইন্দুর চিঠি, তোমারই খোলা উচিত।

বিমল গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, ছায়া, তার সম্বন্ধে এ রকম কথা বলা আমাদের উচিত হচ্ছে না বলে আমার মনে হয়।

ছায়া সহসা গম্ভীর হইয়া বলিল, জিভকে ফাঁকী দেওয়া সহজ, মনকে নয়। মন কি বলছে অন্যায়, ঠিক ক'রে বল দাদা।—ছায়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, চুপ ক'রে রইলে যে বড়! মন অতল সমুদ্র বিশেষ, তার ভিতরকার কটা কথাই বা আমরা জানি!

ইহারা কেহ জানিল না যে, বহুশত মাইল দূরে আর একটি নারী মনের সম্বন্ধে এইরূপ উপমাই দিয়াছিল।

ছায়া চিঠিখানা বিমলের হাতের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল, খুলে ফেল।

বিমল চিঠি খুলিল। অদ্ভুত চিঠি।

"ছায়া, কাশীর ঠিকানা এই—

১৯ক ভেলুপুরা, বেনারস সিটি।

ইন্দু।"

চিঠি দেখিয়া উভয়েই স্তম্ভিত হইয়া গেল। অনেকক্ষণ কাহারও মুখে

দিয়া একটি শব্দও নির্গত হইল না। অবশেষে ছায়া "পুকুরের কাজ সেরে আসি দাদা" বলিয়া ত্বরিতপদে প্রস্থান করিল।

চিঠিখানা সেইখানেই পড়িয়া ছিল। দুইবার, তিনবার, বার বার পড়িয়াও একটি শব্দও বাড়াইতে পারা গেল না। একটি কুশলপ্রশ্ন নাই, একটি সন্তোষের বাণী নাই, একটি সম্ভাষণ পর্য্যন্ত নাই। ইন্দু জানে, সে এখানে রহিয়াছে, তাহার জন্যই ছায়া মা'র ঠিকানা চাহিয়াছে!

তবুও কেন মনে হয়, ইন্দুর এই পরিচয়ই সম্পূর্ণ ও শেষ নয়?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিমল সেই রাত্রেই চলিয়া গেল। ছায়া অনেক করিয়া বলিয়াছিল, দাদা রাতটা থাক, কাল সকালে যেও। বিমল রাজী হইল না। ছায়া অনুরোধ করিয়াছিল, দাদা, কয়েকটা টাকা সঙ্গে রাখ। কাশীই যদি যাও, হেঁটে ত যাওয়া চলবে না, গাড়ীভাড়ার টাকাটা অন্ততঃ রাখ। তাহাতেও বিমল সম্মত হয় নাই, বলেছিল, কাশী যাব না বোন্।

ছায়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কোথায় যাবে তা হলে?

বিমল বলিয়াছিল, কিছু ঠিক নেই দিদি। তবে যেখানেই যাই, আর যেখানেই থাকি, তোমার এ আদর-যত্ন ভুলব না বোন, খবর দোব।

ছায়া এদিকে ওদিকে চাহিয়া, অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, দাদা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

—অত কিন্তু কেন ছায়া ?

—যদি অন্যায় হয়, ক্ষমা করবে বল ?

—আমি রাগ করব না, ছায়া, কাজেই ক্ষমা করার কথা উঠতেই পারে না।

কথাটা তবুও ছায়ার মুখ দিয়া বাহির হইল না; অধিকতর দ্বিধার সহিত বলিল, তবু বল, ক্ষমা করবে।

বিমল ম্লানহাস্যে কহিল, বেশ, তাই বলছি। কিন্তু তুমি কি জিজ্ঞাসা করবে তা আমি বুঝতে পেরেছি ছায়া!

ছায়া বলিল, কি বল ত ?

বিমল বলিল, আমি কুমিল্লা যাব কি-না ?

ছায়া একথার কোন উত্তর দিল না, নতচক্ষুতে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিমল ম্লানমুখে মৃদু হাসিয়া বলিল, না বোন, যাব না। যেতে পারি না, যাওয়া উচিত নয়।—একটু থামিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, কোন দিন তার সঙ্গে দেখা যাতে না হয়, সেই চেষ্টাই করব ছায়া দুঃখে হোক্, কষ্টে হোক্, সুখে হোক্, স্বেচ্ছায় হোক্ বা সংস্কারের বলেই হোক্, মনকে যদি সে বাঁধতেই পেরে থাকে, আমি কেন তার সে তপস্যায় বিঘ্ন জন্মাই ভাই ?

ছায়া সাহস করিয়া বলিল, দাদা, তা কি সম্ভব ?

—কি সম্ভব ছায়া ?

—মন বাঁধা কি সম্ভব ?

—জানি না।

ছায়া বলিল, মন বাঁধা মানে ত অতীত বিস্মৃত হওয়া? অসম্ভব। পুরুষেই পারে না, তা মেয়েরা!

বিমল হাসিয়া বলিল, তুমি ত অভিজ্ঞান শকুন্তলা পড়েছিলে, ছায়া? মনে আছে, দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে একেবারে ভুলে গেছলেন।

ছায়া অবজ্ঞাভরে কহিল, একেবারে আজগুবী গল্প। হয় রাজা শকুন্তলাকে ভালবাসেন নি, না-হয় কালিদাস গাঁজাখুরী গল্প লিখেছেন।

—ঠিক বলেছ ছায়া! সত্যিকার ভালবাসা হলে কখনও ভোলা সম্ভব নয়। কালিদাস রাজা দুষ্মন্তকে অমানুষ গড়েছেন। পরীক্ষার ফলে শকুন্তলার নিষ্ঠা উজ্জ্বল হয়েছে সত্যি, দুষ্মন্ত মানুষ হন্ নি, অমানুষ হয়েছেন। কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে এল ছায়া, আমি আসি ভাই।

ছায়া জিজ্ঞাসা করিল, আবার আসবে ত?

—ইচ্ছে নেই এই কথা বলতে পারলে ভাল হত বটে; কিন্তু সেটা হত মিথ্যে কথা। মিথ্যে বলব না ছায়া, বোনের অভাব মানুষের জীবনে যে কত বড় অভাব তা আগে কখনও বুঝি নি, আজ যাবার সময় তা বুঝতে পারছি। এই শূন্য জীবন মাঝে মাঝে পূর্ণ ক'রে নিতে তোমার কাছ ছাড়া আর কোথায় যাব ভাই? তোমাদের ঐ নারকেল গাছটা কি দুষ্টু দেখলে? টুপ্ করে সূর্য্যিটিকে ঢেকে দিয়ে আমায় বলে দিলে—আর দেরী নয়। পরেশটার সঙ্গে দেখা হল না, একরকম ভালই—দেখা হলে তাকে বোঝাতে আরও আধ ঘণ্টা লাগত। তোমার শাশুড়ীকে আমি এইখান থেকেই প্রণাম করি ভাই, আমার খোঁজ করলে তুমি ব'লে দিও।

ছায়া ভূতলে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিলে বিমল হাসিয়া বলিল, এসব তুমি শিখলে কোথায় ছায়া? আমি ত দেখেছি—বলিতে বলিতে থামিয়া

গিয়া, আবার বলিল, তুমি একটি আশ্চর্য্য সৃষ্টি ছায়া! ঘোষ সাহেবের বাড়ীর ছায়া আর আজকের ছায়ায় এতটুকু মিলও নেই। আশ্চর্য্য!

—মানুষ অবস্থার দাস, দাদা।

—ঠিক বলেছ, ছায়া।

ছায়া বলিল, সেই জন্যেই ইন্দুর ঐ দু'লাইনের চিঠি দেখেও আমি আশ্চর্য্য হই নি।

বিমল বলিল, আমিও না, ছায়া, আমিও না। চললুম ভাই। আবার আসব, কবে তা জানিনে, কিন্তু জানি, আসব। তবে এর মধ্যে যদি মিঃ অশোক বোস ফিরে আসেন, আমাকে খবর দিও, আগেই চলে আসব!

ছায়া কহিল, আমি সে আশা বড় করিনে দাদা।

—কিন্তু আমি করি। আশা করি, কায়মনে কামনাও করি। এত বড় একটা মহৎ জীবন বিফলে যেতে পারে না ছায়া! ভক্তের প্রাণের নিবেদন, ভগবান গ্রহণ না ক'রে পারেন না।

ভক্তের প্রাণের নিবেদন, ভগবান কি সত্য সত্যই গ্রহণ না করিয়া পারেন না? কই, পৃথিবীতে তাহার সাক্ষ্য প্রমাণ দেখা যায় কই! মুমূর্ষু পুত্রের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া কোন্ পিতা বা কোন্ মাতা ভগবানের উদ্দেশে আবেদন-নিবেদন না করে? কয় জনের আবেদন তিনি কাণে শোনেন? কাহার নিবেদন তিনি গ্রহণ করেন? ভক্ত প্রহ্লাদের নিবেদন তিনি শুনিয়াছিলেন; ধ্রুবের আবেদনও তাঁহার কাণে গিয়াছিল; কিন্তু পুরাণের বাহিরে কোন্ ভক্তের কোন্ আবেদন, কোন্ নিবেদন তিনি গ্রাহ্য করিয়াছেন? তা যদি করিতেন, সংসারের এই হতশ্রী রূপ কি থাকিতে পারিত?

কিন্তু কাহার পুণ্যে জানি না, কাহার ভক্তির জোরে তাহাও বলিতে পারি না, ছায়ার নিবেদন তিনি গ্রাহ্য করিলেন। বিমলের কথাটা যে একটি দিনের মধ্যেই সত্য হইয়া উঠিবে, বোধ হয়, ঘটনাটা যিনি ঘটাইলেন, তিনি ছাড়া কেহই জানিতেন না।

পরেশ বাগানপাড়ায় বীজ-ধানের সন্ধানে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া শুনিল, বিমল চলিয়া গিয়াছে। শুনিয়া সে কচি ছেলের মত পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিল। তাহার কান্না দেখিয়া, ছায়া হাসিবে কি কাঁদিবে ভাবিয়াই পাইল না।

ঘরের ভিতরে জীর্ণ শয্যায় শুইয়া যে কঙ্কালসার-দেহ স্ত্রীলোকটি প্রতি-মুহূর্ত্তে যমদূতের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, পরেশের কান্না শুনিয়া বিচলিতকণ্ঠে ডাকিলেন, বৌমা, বৌমা!

ছায়া আসিলে বলিলেন, পরেশের কি হয়েছে বৌমা? অসুখ-বিসুখ করেছে বুঝি? আমি জানি, এ পোড়া বরাতে ও গুঁড়োটুকুও থাকবে না। ভয় নেই বৌমা, আমি মরব না, তুমি বল, কি হয়েছে তার।

ছায়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া, তাঁহার পায়ের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, না মা, না. অসুখ-বিসুখ কিছু নয়। দাদা চলে গেছেন, ওর সঙ্গে দেখা করে যান নি, তাইতে বাবুর পা ছড়িয়ে বসে কান্না হচ্ছে।

শাশুড়ী বলিলেন, তোমার দাদা গেলেন? কই, যাবার সময় আমার সঙ্গে দেখা ক'রে গেলেন না যে!

ছায়া বলিল, আপনার অসুখ...

—দেখা ক'রে যেতে হয়। গরীবই হই, বুড়োই হই, আমি ত

অশোক-পরেশের মা। বলিতে বলিতে অশ্রুভারে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

একটু পরে তিনি আবার বলিলেন, ভালই হয়েছে গেছেন; নইলে আমাকেই যেতে বলতে হ'ত।

ছায়া বিস্ময়ে হতবাক্, হতবুদ্ধি হইয়া গেল। যেন শুনিতে পায় নাই, এই ভাবে কহিল—মা!

—হ্যাঁ বাছা, বলতে হ'ত বৈ কি! এটা ত তোমাদের কলকাতা শহর নয়, এ যে পল্লীগ্রাম। পল্লীগ্রামে পল্লীগ্রামের মতই থাকতে হয় বাছা।

তাঁহার কথাগুলা ছায়ার কাছে হেঁয়ালীর মত ঠেকিতেছিল। কিছুই না বুঝিতে পারিয়া আকুলিত বিস্ময়ে শাশুড়ীর মুখের পানে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। প্রদীপের আলো এত মৃদু, এত মলিন যে পার্শ্বে বসিয়াও স্পষ্ট ভাবে কিছু দেখা যায় না। শাশুড়ী কি বলিতেছেন তাহার অর্থবোধ করাও যেমন দুঃসাধ্য, তাঁহার মুখ দেখিয়া বুঝিয়া লওয়াও তদ্রূপ দুঃসাধ্য।

কিছুক্ষণ নীরবতার মধ্যে অতিবাহিত হইলে, ছায়ার শাশুড়ী বলিলেন, দাদা বল এই বই ত নয়, সম্পর্ক ত আর সত্যিই কিছু নেই, পাঁচজন পাঁচ রকম কথা বলতে পারে বৈ কি!

সম্ভব অসম্ভব অনেক কথাই ছায়া কল্পনায় আনিয়া ভাঙ্গা গড়া করিতেছিল, কিন্তু এই জঘন্য কথাটা সুদূর কল্পনাতেও সে আনিতে পারে নাই। মুখে বলা ত দূরের কথা, একথা যে মনের কোণেও কোন লোক ঠাঁই দিতে পারে, তাহাও তাহার কল্পনার অতীত ছিল। ঐ কথাগুলা যে দুইটা কাণের মধ্য দিয়া গিয়াছিল, কিছুক্ষণের জন্য সে দু'টা যেন সমস্ত শক্তি-

হারাইয়া ফেলিয়া পাষাণ হইয়া গিয়াছিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার কাণের কোনরূপ শব্দানুভূতিও ছিল না। যখন শ্রবণশক্তি ফিরিয়া আসিল, তখন শুনিল, শাশুড়ী বলিতেছেন, পল্লীগ্রাম বড় বিষম ঠাঁই বাছা। এখানে পাণ থেকে চুণ খসলেই সর্ব্বনাশ। বুড়ো নরু চক্কোত্তী—আশী বছর বয়স, বার্ম্মা মুলুক থেকে বিধবা বৌটাকে নিয়ে এসে রাখ্‌লে, লোকে তাকেই বড় রেয়াৎ করলে, তা এ ত তোমার পাতান সম্পর্ক বাছা।

ছায়ার কাণ মাথা তখনও ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল, প্রদীপের ক্ষীণ আলোক-টুকুও তাহার চোখে নিবিয়া গিয়াছিল। যে মাদুরটায় বসিয়াছিল, তাহারই একটা ছিন্ন অংশের মধ্যে কয়টা আঙ্গুল পুরিয়া দিয়া সে পাথর হইয়া গিয়াছিল।

শাশুড়ী বলিতে লাগিলেন, পল্লীগ্রাম বড় সর্ব্বনেশে জায়গা বাছা, এখানকার লোকে না পারে হেন কাজ নেই। এরা জ্যান্ত মাছে পোকা পড়ায়।

ধীরে ধীরে ছায়ার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিতেছিল।

শাশুড়ী বলিলেন, সেদিন হালদার-বৌমা এসে বললেন; তার পরদিন পদ্ম নাগের মা'ও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিমলের কথাই বলতে লাগলেন; কাল মুখুজ্জে-গিন্নী ত পষ্টই বললেন, ও লোকটি নড়তে চায় না কেন গা পরেশের মা? আমি সবাইকে যা বলি, মুখুজ্জে-গিন্নীকেও তাই বললুম।

তিনি কি বলিয়াছেন জানিবার কৌতূহল যে ছায়ার মনে জাগে নাই, তাহা নহে; জাগিয়াছিল, এবং বেশী করিয়াই জাগিয়াছিল; কিন্তু ঐ জঘন্য নোংরা কথাটাকে নাড়াচাড়া করিতে হইবে বলিয়া প্রশ্ন করিয়া কৌতূহল নিবৃত্তি করিবার প্রবৃত্তি তাহার হইল না।

তাহার প্রয়োজনও ছিল না, শাশুড়ী নিজের মনেই বলিয়া চলিলেন, বললুম, ছ'মাস জেলে পাথর ভেঙ্গে এসে শরীর ভেঙ্গে গেছে, মা কাশীবাস করছেন, আত্মীয়-স্বজন আর ত কেউ নেই, বৌমা দাদার মতন দেখে, তাই দিন কতক আছে। শুনে, মুখুজ্জে-গিন্নী নাক সিঁটকে বললেন, তোমার বৌমা দাদা বলেন বই ত নয়, সত্যিকার দাদা ত আর নয়।

ছায়ার পক্ষে আর সহ্য করা দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছিল, বলিল, মা, এদেশে মানুষ থাকে ?

শাশুড়ী ত্বরিত উত্তর দিলেন, এরা কি মানুষ নয় বাছা ?

—কি জানি মা, আমার ত সন্দেহ হয়।

শাশুড়ী বোধ হয় বিরক্ত হইয়াছিলেন, বোধ হয় কেন, তাঁহার কথায় বিরক্তি সুস্পষ্ট হইয়াই প্রকাশ পাইল। বলিলেন, তোমায় ত বললুম বাছা, এ তোমাদের কলকাতা শহর নয়, এ পল্লীগ্রাম। শহরে কেউ কারও খোঁজ রাখে না, কে কি করছে কোন খবর রাখে না, পল্লীগ্রামে ত তা নয় বাছা। এখানে সকলে সকলের খোঁজ রাখে ; কে কি করছে না করছে সব খবর সবাই জানে।

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে ছায়া যে প্রশ্নটা করিয়াছিল, সেই প্রশ্নটাই পুনরায় তাহার জিভ দিয়া বাহির হইয়া আসিল, বলিল, মা, এদেশে কি মানুষ বাস করে ?

শাশুড়ী বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিলেন, তোমারই বা কি দরকার ছিল বাছা, ওকে আজ আট দশ দিন আটকে রেখে আদিখ্যেতা করবার।

এই কথা কয়টা শুনিয়া ছায়া দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়া ফেলিল। এক মুহূর্ত্তে পৃথিবীর রূপ যেন বদলাইয়া গেল। পল্লীগ্রামের যে পরিচয় অল্পক্ষণ পূর্ব্বে সে পাইয়াছে, তাহার শাশুড়ীকেও সেই পল্লীগ্রামের একজন ভাবিতে তাহার মর্ম্ম ছিঁড়িয়া যাইতেছিল।

শাশুড়ী বধূর মনের ভাব বুঝিবার কোন চেষ্টাই করিলেন না, প্রবৃত্তির ঝোঁক যেমন বাড়িয়াই চলে, তাঁহারও ঝোঁক তেমনই বাড়িতেছিল, আমার শোকতাপের শরীর বাছা, ঐ এক ফোঁটা একটা গুঁড়োকে নিয়ে দুঃখে কষ্টে এক কোণে পড়েছিলুম, কারুর কথার তোয়াক্কা ছিল না বাছা—এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি থামিলেন। বোধ হয় বধূর প্রতি ঈষৎ করুণার সঞ্চার হইল।

একটু পরে বলিলেন, যাক্, সে যখন গেছে, তখন দু'দিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

ছায়া কঠিনকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কি ঠিক হয়ে যাবে?

তাহার কঠিনকণ্ঠের কঠোর প্রশ্ন শুনিয়া শাশুড়ী যেন থতমত খাইয়া গেলেন; তারপর জড়িতকণ্ঠে কতকগুলা কি বলিলেন, তাহার একটি বর্ণও বুঝা গেল না। কথার ধরণ ধারণে শেষের দিকটায় যেন ইহাই বুঝাইল যে, পরেশের বিয়ের আগে এবাড়ীতে যখন কাহারও পাত্তা পাতিবার সম্ভাবনা নাই, তত দিনে এই একটু-আধটু ভুলচুকের কথা লোকের মনে চাপা পড়িয়াই যাইবে। পরেশ ত ঐ একরত্তি ছেলে, আগে বাঁচিয়াই থাক, তারপরে তাহার বিবাহ—ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু ছায়ার মত তেজস্বিনী মেয়ে ইহাতে সান্ত্বনা পায় না। বলিল, তারা আমার নামে মিথ্যে অপবাদ দেবে?

—যা বলবার তা'ত তারা বলেইছে বাছা।

—আমরা তাই সহ্য করব !—রাগে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

—সহ্য করা ছাড়া—

ছায়া শাশুড়ীর মুখের পানে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, তাদের কথা চুলোয় যাক্‌গে। আপনার কথা কি, তাই বলুন।

শাশুড়ী হতাশভাবে কহিলেন, আমার আবার কিসের কথা বাছা; থুতু ছুঁড়লে নিজেরই গায়ে পড়বে।

ছায়া অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল, সোজা কথা বলুন আপনি—

—ক'জন লোকের মুখে সরা চাপা দেবে বাছা ?

—সরা চাপা একজনের মুখেও দিতে বলছি নে মা; আমি তা চাই-ও না। আমি শুধু জানতে চাই, লোকের মত আপনিও কি—কথাটা সে শেষ করিতে পারিল না। কথাটা কোন নারী নিজের মুখ দিয়া উচ্চারণ করিতে পারে কি-না সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এমনই একটা সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে জনকদুহিতা সীতা অগ্নিপ্রবেশ করিয়া পরীক্ষার জ্বালা এড়াইয়াছিল।

শাশুড়ী চুপ করিয়া ছিলেন, ছায়া কণ্ঠে বল সঞ্চয় করিয়া কহিল, বলুন মা!

শাশুড়ী তথাপি স্পষ্ট করিয়া কথা বলিতে পারিলেন না, যেন উত্তর না দিলে না, এমন ভাবে কহিলেন, একটু সাবধান হলে ত কোন কথাই উঠত না বাছা। জেল থেকে বেরিয়ে এসেছিল, এসেছিল, বেশ ত, দুদিন থেকে চলে গেলে ত আর কোন কথাই উঠত না।

ছায়া বসিয়া ছিল, আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, আপনার

মনে কি আছে আপনিই জানেন, আমি তা জানিনে ; কিন্তু আমার কথা আপনাকে আমি বলছি শুনুন।

শাশুড়ী ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি কহিলেন, তুমি রাগ করছ কেন বাছা? আমি ত বলেছি তোমায়, ওসব কথা লোকে বেশী দিন মনে করে রাখে না।

—বেশী দিনের দরকার নেই, একটা দিন একটি বার মনে করলেই যথেষ্ট।

—সে আর কি ক'রবে বাছা!

—কিছুই করব না মা। তবে আমার মনে যদি কোন পাপ থাকে, তা হ'লে আমি যেন তার সাজা পাই ; আর আমার মনে যদি বিন্দুমাত্র পাপ না থাকে, তা হ'লে—

একটা কঠিন শপথের আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া বৃদ্ধা বলিয়া উঠিলেন, তুমি হয় ত কিছু বুঝতে পার নি বৌমা। সেই লোকটির—

ছায়া বলিল, না, না, না। তাঁরও মনে কোন পাপ নেই।

—কলকাতার ছেলে, বাছা, চেনা দায়।

—পল্লীগ্রামের লোকের পক্ষে চেনা দায় হতে পারে, কলকাতার মেয়েদের পক্ষে দায় নয়। বিমল দা'র মত নিষ্কলঙ্ক চরিত্র লোক কলকাতাতেও বেশী নেই মা।

শাশুড়ী বলিলেন, ভাল হলেই ভাল বাছা।

ছায়া কথাটা শেষ করিবার উদ্দেশে কহিল, শুনুন মা, আমাদের দু'-জনের কারও মনে যদি কোন পাপ স্পর্শ করে থাকে, তা হ'লে ভগবানের কাছে আমার এই অনুরোধ, সারাজীবন যেন আমার এমন কষ্টেই কাটে। আর যদি আমরা নির্দোষ হই—থাক্, এটা কলিকাল।

কিন্তু এটা কলিকাল যে নয়, অচিরেই তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল।

বাহিরে আসিয়া ছায়া দেখিল, পরেশ বাঁশের একটা খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে। পাশে বসিয়া, তাহার গায়ে হাত রাখিতেই পরেশ চমকিয়া উঠিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে কহিল, তুমি তাঁকে যেতে দিলে কেন?

হায় রে! এ বালকও ত পল্লীগ্রামের। তবে এই অস্ফুট-কুসুমে আজও পাপ-পুণ্য প্রবেশ করে নাই, এই যা!

বৌদিদিকে নীরব দেখিয়া পরেশ আবার বলিল, তুমি বললেই পারতে, পরেশ আসুক, পরেশের সঙ্গে দেখা করে তবে যেও। তোমার কথা তিনি ঠেলতে পারতেন না।

ছায়া নিজের মনেই বলিল, তা পারতেন না। কিন্তু পল্লীগ্রামে এই কথাটা যে কত দোষের, কত নিন্দার, তাহা মনে করিতেও মন অশুচিতে ভরিয়া উঠিল।

পরেশ বলিতে লাগিল, আমি কোথায় তিনখানা গাঁয়ে খবর দিয়ে এসেছি, বৌদি র দাদা এসেছেন, তিনি কত পাস্ করেছেন, কত বিদ্বান। তাদের সবাইকে আসতে বলে এসেছি—

এত দুঃখের মধ্যেও ছায়ার হাসি আসিল, বলিল, কি বলে এসেছিলে ঠাকুরপো, বৌদিদির দাদাকে দেখাবে? বৌদিদির দাদা কি বাঘ না ভাল্লুক যে দেখে যাবার নেমন্তন্ন ক'রে এলে?

পরেশ লজ্জিত ভাবে কহিল, বা রে! তা কেন? দাদা সেদিন বলছিলেন না, আমাদের ঐ খালটা যদি খুব গভীর করে কাটা যায়, সমস্ত বছর যদি ওতে অনেক জল থাকে, তা হ'লে খালের ধারের জমিতে দু'নো ফসল হবে। বলছিলেন না?

—তা হবে। আমি শুনি নি ভাই।

—তুমি তখন ছিলে না; ঠিক, ঠিক! রাত্রে শুয়ে শুয়ে আমাকে বলছিলেন। সুন্দরবনে এক সাহেব আছে, তার কাছে উনি সব শিখে-ছেন। আমি সবাইকে সে কথা বলতেই তারা বললে, বেশ ত, আমরা খাল কাটব—

ছায়া হাসিয়া বালল, তা ত কাটবে; কিন্তু যদি কুমীর আসে?

পরেশ সাশ্চর্য্যে কহিল, কুমীর আসবে কেন?

ছায়া বলিল, খাল কাটলেই কুমীর আসে। জান না, সেই জন্যই লোকে বলে, খাল কেটে কুমীর এন না।

পরেশ হাসিয়া উঠিল, বলিল, সেই কথা! ও সব বাজে কথা বৌদি!

ছায়া বলিল, কিন্তু রাত্রে কি খাবে বল ত ভাই?

পরেশ রাগ করিয়া বলিল, আমি খাব না। কেন তুমি দাদাকে চলে যেতে দিলে?

—ঘাট হয়েছে, মাপ কর ভাই। সত্যি বল, কি খাবে? ফলার করবে?

—কেন, ভাত?—বলিয়াই শিশু যেন মনে-মনে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল: পর মুহূর্ত্তেই বলিল, চাল বাড়ন্ত বুঝি?

ছায়া শিহরিয়া উঠিল, বলিল, বালাই।

ছায়া যাহাই বলুক, বালকের পক্ষে চাল বাড়ন্ত হওয়ার সংবাদ আদৌ নূতন নহে; বরং সে তাহাতে বিশেষ অভ্যস্ত ছিল। তাহার মা'ও প্রথম প্রথম তাহাকে গোপন করিতেই চেষ্টা করিত; কিন্তু ক'দিন গোপনতা থাকিত?

পরেশ ছলছল মুখে কহিল, তুমি কি খাবে বৌদি ?

—আমি আজ খাব না ঠাকুরপো।

পরেশ বলিল, আমিও খাব না।

—তুমি খাবে না কেন ?

—তুমিই বা খাবে না কেন ?

—আমার আজ খিদে নেই।

—আমারও।

বস্তুতঃ এমন অক্ষুধায় এই বালক অনভ্যস্ত ছিল না। মায়ের কাঁদ-কাঁদ মুখ দেখিলেই অক্ষুধার ওজর করিয়া বাড়ী হইতে চলিয়া যাইত এবং পাড়াগাঁয়ের বনে, বাগানে ঘুরিয়া কখনও পাকা গাব, কখনও জাম, কখনও বৈঁচি, খেজুর, তালশাঁস, কখনও বা খালের জলে উদর পূর্ণ করিয়া ফিরিয়া আসিত। যেদিন বেশী পাইত, ছিন্ন বস্ত্রের খুঁটে বাঁধিয়া মাতার জন্যও কিছু কিছু আনিত। ছায়া এই গৃহে আসা অবধি বালকের কোন দুঃখই ছিল না। উদরের ক্ষুধা অনুভব করিবার পূর্ব্বেই খাদ্য তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইত। আজ পুরাতন দিনের কথা মনে করিয়া পরেশ সপ্রতিভভাবে আবার বলিল, আমার আজ একটুও খিদে নেই।

ছায়া হাসিয়া তাহার পেটে হাত দিয়া বলিল, খিদে নেই, পেট বলে কোথায় ঢুকে গেছে, খিদে নেই, দুষ্টু ছেলে কোথাকার।

—সত্যি বলছি, এই দেখ-না। বলিয়া সে নিঃশ্বাস টানিয়া পেটটা ফুলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ছায়া বলিল, থাক্ থাক্, শেষকালে পেটটি ডুম্ ফট্ হয়ে যাবে! আর ফুলিয়ে কাজ নেই।

পরেশ হাসিয়া ফেলিল ; সে কিছু বলিতে যাইতেছিল. ছায়া বলিল, শরীরটা আজ ভাল নেই ঠাকুরপো, তাই তোমায় জিজ্ঞাসা করছিলুম, যদি তুমি ফলার খেতে পার, তা হ'লে আজ আর রাঁধিনে। দুধ আছে, গুড় আছে, হাট থেকে কাল কলা এসেছিল, কলা আছে, চিড়ে-মুড়কী আছে—খাবে ?

পরেশ বলিল, তুমিও খাবে ?

ছায়া কহিল, বললুম না, আমার শরীরটে আজ ভাল নেই !

—দু'টিখানি খেও। কেমন ?

—আচ্ছা, তাই হবে।

পরেশকে পরিপাটি করিয়া ফলাহার ভোজন করাইয়া, তাহারই পীড়া-পীড়িতে ছায়াও সামান্য কিছু খাইয়া, শাশুড়ীর জন্য দুধ-মিষ্টান্ন বাহির করিয়া, পরেশের হাত দিয়াই পাঠাইতে উদ্যত হইয়াছিল ; কি ভাবিয়া তাহার হাত হইতে লইয়া নিজেই ঘরপানে চলিল।

শাশুড়ীর সম্মুখীন হইতে সত্যই আজ তাহার পা'ও উঠিতেছিল না, মনও উঠিতেছিল না। নোংরা পথে পা দিতে মানুষের যেমন মনটা সঙ্কুচিত হয়, পা দ্বিধা করে, তাহারও সেই অবস্থা।

শাশুড়ীর শয্যাপার্শ্বে গঙ্গাজল ছড়া দিয়া, খাদ্য নামাইয়া নিব-নিব প্রদীপটাকে উস্কাইয়া দিয়া, ছায়া ডাকিল, আপনার খাবার এনেছি।

অন্যদিন ছায়া তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইয়া বসিত ; এবং যতক্ষণ না খাওয়া হইত, তাঁহার গায়ে পিঠে হাতে পায়ে হাত বুলাইয়া দিত। আজ কিছুই পারিল না। প্রদীপটার দিকে পশ্চাৎ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শাশুড়ী এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন কি না বলা যায় না, উঠিয়া

বসিয়া আহার করিলেন এবং হাত-মুখ ধুইয়া শুইয়া পড়িলেন। কেহই কোন কথা কহিলেন না।

ছায়া নিঃশব্দে বাহিরে আসিয়া, দাওয়ায় মাতুর বিছাইল। অন্য দিন সে ঘরে শাশুড়ীর কাছে শুইত, পরেশ ও বিমল এই দাওয়াটায় শুইত। আজ কোন মতেই ঘরের ভিতরে শুইবার কথাটা তাহার মনে স্থান পাইল না। যত বারই কথাটা মনে আসিয়াছে, সবলে মন হইতে কথাটাকে সে দূর করিয়া দিয়াছে। যখন বিমল আসে নাই, পরেশকে লইয়া সে ঘরের ভিতরেই শুইত। গরমে বদ্ধ ঘরে থাকিতে প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম করিয়াছে, দম বন্ধ হইতে গিয়াছে, তবুও শাশুড়ীকে ফেলিয়া আসিতে পারে নাই। আজ সে কথা যখনই মনে হইয়াছে, তখনই ভাবিয়াছে, সে সকলের এই পুরস্কার!

যাহার চোখে ঘুম নাই, তাহার রাত্রি কাটিতে চায় না। ছায়ার রাত্রিও কাটে না। প্রহরে প্রহরে পাখী ডাকিতেছে, এখানে সেখানে কুকুরের দল কলহ করিতেছে, দূরে নিকটে শিবা-রব উত্থিত হইতেছে, আকাশে তারারা বর্ণ পরিবর্ত্তন করিতেছে, স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে, অন্ধকার আকাশ কখনও আলোকে ভরিয়া যাইতেছে, কখনও বা গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে, রাত্রি যেন আর শেষ হইতে চায় না।

এই পল্লীগ্রাম, এই তাহার স্বামি-গৃহ! এর অঙ্গে এত সৌন্দর্য্য, এত বীভৎসতা এক সঙ্গে কেমন করিয়া জড়াইয়া রহিয়াছে, ভাবিতে ভাবিতে তাহার দু'চোখে অজস্র ধারা ছুটিল!

এই তীর্থের উদ্দেশে যেদিন নিঃসহায়া নারী পিতার গৃহ ত্যাগ করিয়া

হাসিমুখে স্বেচ্ছায় সকল দুঃখ-কষ্ট বরণ করিতে আসিয়াছিল, সেদিনের কথা মনে করিতে অশ্রুর উৎস রোধ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল।

সেইদিন হইতে, প্রত্যেকটি দিনের ছোট-বড় ঘটনাগুলি আলোচনা করিতে কত সুখ, কত আনন্দই না হইত, কিন্তু আজ। আজ মনে হইল, তাহার সমস্ত ত্যাগ, কষ্টস্বীকার, দুঃখবরণ সকলই ব্যর্থ হইয়াছে; এ পৃথিবীতে সে সকলের কোন মূল্য নাই, সে সকলের কোন মর্য্যাদা কেহ দেয় না। এই সুশ্রী সুন্দর আবরণের মধ্যে কুৎসিত পৃথিবী কেবল কুৎসাই দেখিয়া থাকে, কদর্য্যতাই তাহার চোখে লাগে। সে মানুষের উচ্চতা দেখে না, হৃদয়ের সন্ধান করে না, অন্তরের মর্য্যাদা বুঝে না। দুই আর দুইয়ে চার হয়, এই সংস্কারই তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে—সেই সংস্কারের মাপকাঠিতে সে পৃথিবীর পরিমাপ করে। একটা বিশেষ বয়সের নরনারীর সম্বন্ধে একটি মাত্র ধারণাই ইহার আছে—অন্য কোন ধারণা করিতেও সে যেন জানে না। এই পৃথিবীর সঙ্গে বোঝাপড়া ও সামঞ্জস্য বিধান করিয়া বাস করিতে হইবে ভাবিয়া ছায়ার মনটা তিক্ততায় ভরিয়া গেল। জীবনে এমন বিতৃষ্ণা আর কোন দিন সে অনুভব করে নাই।

অকস্মাৎ একটি কাক ডাকিয়া উঠিল। একটির পর আর একটি, তারপরে আর একটি, এমনই করিয়া অনেকগুলি কাক কলরব করিয়া উঠিল। তাহাদের কলরব থামিতে না থামিতে মধুরস্বরে অন্য পাখীও ডাকিল। তাহারাও একটির পর একটি করিয়া অসংখ্য কণ্ঠে কাকলী তুলিল। পূর্ব্বাকাশ পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করিতেছে দেখিয়া ছায়ার বক্ষের

ভার দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল। এই মুখখানা কেমন করিয়া সে ঐ গৃহশায়িতা নারীর সম্মুখে বাহির করিবে ভাবিয়া তাহার মন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া যেন বসিয়া পড়িতেছিল।

পরেশ ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, বৌদি ঘাটে যাই ?

সুকুমার বালকটিকে চাপিয়া ধরিয়া ছায়া বলিল, না।

পরেশ বলিল, আজ যে বড়-জলা বেঁধেছে বৌদি। মাছ আনব না ?

ছায়া সংক্ষেপে কহিল, না।

পরেশ ক্ষুব্ধভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া বলিল, তোমার হাতে পয়সা না থাকে, মাছ না-ই বা আনলুম, দেখে আসি-না বৌদি! যে কোটালে বড়-জলা বাঁধা হয়, উঃ, কত বড় বড় মাছ যে পড়ে বৌদি। তুমি দেখনি, তাই জান না, এই এত বড় বড় রুই, কাৎলা, মৃগেল, কালবোস্, ভেটকী। আমি দেখে আসি বৌদি। যাব ?

ছায়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া ছিল। একহাতে বস্ত্রাঞ্চল টানিয়া চক্ষু মুছিয়া, উঠিয়া বসিতে বসিতে বলিল, শুধু দেখেই আসবে ঠাকুরপো—

পরেশ সোৎসাহে কহিল, মাছ আনতে বল যদি, কিন্তু তোমার হাতে যে—

ছায়া বলিল, পয়সার কথা বলছ ? পয়সা আছে ভাই।

পরেশ দাঁড়াইয়া উঠিল, বলিল, আমি মুখ হাত ধুয়ে আসি, তুমি পয়সা বার কর।—বলিয়া বালক ছুটিয়া চলিয়া গেল।

কথায় বলে, মানুষের adaptibility. যে অবস্থাতেই পড়ুক, মানুষ যেমন মানাইয়া লইতে পারে, এমনটি আর কোন জীব পারে না। কাল রাত্রে সে ভাবিয়াছিল, এই গৃহে আর একটি দিনও সে বাস করিতে পারিবে

না, এই গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া একটি অন্নকণাও সে মুখে তুলিতে পারিবে না। অথচ এই গৃহ ছাড়া আর যে আশ্রয় নাই, যাইবার স্থান নাই, তাহাও সে জানিত; তবুও তাহার মন মানে নাই। দুঃখ-রজনীর অনন্ত দুঃখের মধ্যে এই দুঃখটাই দুর্দ্দমনীয় হইয়াছিল যে, শাশুড়ীর মুখের ঐ কথার পরেও এই গৃহেই তাহাকে রজনী অতিবাহিত করিতে হইতেছে!

পরেশ ফিরিয়া আসিয়া বলিল, ওকি, তুমি যে এখনও বসে আছ? পয়সা বার করবে না?

—পয়সা আমার আঁচলেই আছে ভাই।—বলিয়া আঁচলটা খুলিবার ছলে আর একবার চোখ মুছিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি মাছ আনবে ঠাকুরপো?

পরেশ নিরীহ শিশুর মত বলিল, তুমি যা বলবে।

ছায়া বলিল, তুমি ত রুই মাছের মুড়ো খেতে ভালবাস, তাই একটা এনো।

পরেশ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, দূর! চারা-রুইয়ের মুড়ো বুঝি খেতে ভাল হয়?

ছায়া বলিল, চারা কেন, বড় রুই আনবে।

পরেশ বলিল, বড়? বড় মাছ কে খাবে বৌদি! খেতে ত আমি আর তুমি!

একটু থামিয়া আবার বলিল, আজ কিন্তু বিমল দা থাকলে বেশ হত। বৌদি?

ছায়ার মনও তাহাই বলিতেছিল। কিন্তু ঐই পবিত্রতার আভরণে

সজ্জিত পল্লীগ্রামে মনের কথা প্রকাশ পাইলে সমূহ বিপদ, তাই চুপ করিয়া রহিল।

পরেশ রাগত ভাবে কহিল, তুমি যদি কাল তাঁকে না যেতে দিতে…

ছায়া হাসিয়া বলিল, তুমি কি আমায় বলে রেখেছিলে যে কাল বড়-জলায় মাছ উঠবে?

পরেশ এক গাল হাসিয়া, পরমুহূর্তেই মুখখানি করুণ করিয়া কহিল, তা বলিনি বটে! ঐ যাঃ, সূর্য্য উঠে পড়ল, দাও, দাও।

ছায়া আঁচল খুলিতে খুলিতে বলিল, কত দেব ঠাকুরপো?

—বড় রুই ত! চার পাঁচ আনা দাও না।

পয়সা লইয়া পরেশ ছুটিয়া চলিয়া গেল।

রজনী প্রভাত হইলে শয্যা ত্যাগ করিতে হয় এবং গৃহকর্ম্মে মনও দিতে হয়। মনের সঙ্গে দেহের কি নিবিড় সম্পর্ক, একের অনিচ্ছায় অন্যেরও গতি রুদ্ধ হয়। মনে তাহার পক্ষাঘাত হইয়াছিল, কিন্তু দেহও যে এমন বেদনাভারে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে, আগে সে বুঝিতে পারে নাই। উঠিয়া দাঁড়াইতে গিয়া বুঝিল; মনে হইল, এখনুই পড়িয়া যাইবে। একটা খুঁটি ধরিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর মাদুরখানি, বালিশ দুইটি তুলিয়া ঘরের মধ্যে রাখিতে গিয়াছে—পরিচিত প্রিয় কণ্ঠে কে ডাকিল, ছায়া!

মানুষের দেহের মধ্যে কি আছে না আছে জানি-না, তবে ঐ ডাক শুনিয়া মনে হইল, রক্ত-সমুদ্রে তুফান উঠিয়াছে। তাহার হাত হইতে মাদুর-বালিশ পড়িয়া গেল। ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, বেড়ার ধারে দাঁড়াইয়া পিতা! সৌম্য-মূর্ত্তি, হাস্যানন, প্রশান্ত নয়নে স্নেহের আহ্বান, ছায়া

নামিয়া গিয়া বেড়া খুলিয়া দুই হাতে গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার বুকের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

—বাবা!

—ছায়া!

—এত দিন কোথায় ছিলে বাবা? একটি বারও কি ছায়া বলে খোঁজ নিতে হয় না?

কন্যার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে মিঃ ঘোষ বলিলেন, খবর নিতুম না বুঝি? দিন-রাত আমার ছায়ার কথাই ভাবতুম।

ছায়ার দু'নয়নে সহস্র ধারা। বলিল, কিন্তু খোঁজ তো নাও নি। ছায়া বাঁচল কি মল?

আদরে পিঠের উপর গোটা দুই চাপড় মারিয়া পিতা বলিলেন, পাগলি! তোর শাশুড়ী আছেন ত রে?

—আছেন। এত দিন কোথায় ছিলে বাবা?

—তোর জন্যে একটি জিনিষ আনতে গেছলুম। দেখবি, আয়, গাড়ীতে আছে। চল্।

—গাড়ী কত দূরে রেখে এসেছ বাবা? কেন, এখান পর্য্যন্ত গাড়ী ত আসে।

—বড় গাড়ী কি-না, এর মধ্যে ঢুকল না। তুই আয় না।

মোড়ের উপরে গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল, দূর হইতেই দেখা যাইতেছিল। ছায়া জিজ্ঞাসা করিল, এ গাড়ী কবে কিনলে বাবা?

—নতুন কিনেছি রে। কেমন, ভাল নয়?

—সুন্দর গাড়ী

—জিনিষ আরও সুন্দর। দেখবি চল না।

গাড়ীর কাছে অনেক লোক জমা হইয়াছিল! সেই অনেক লোকের মধ্যেও একটি লোককে চিনিতে ছায়ার বিলম্ব হইল না। তাহার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য সারা দেহ উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু এ-যে পল্লীগ্রাম! অজ্ঞাতে মাথায় আঁচল উঠিয়া পড়িল, সারা দেহে লজ্জার বান ডাকিয়া গেল, ছায়া পিতার হাত ছাড়াইয়া যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে ফিরিয়া গেল।

—পাগলি! মিঃ ঘোষ হাসিলেন, বলিলেন, এস অশোক। বলিয়া তিনি জামাতার হাত ধরিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আমার কলিকাতার পাঠক-পাঠিকা! চার আনা মূল্য দিয়া পরেশ-চন্দ্র যে সুবৃহৎ রোহিত মৎস্যটি ক্রয় করিয়াছে, আপনাদের কলিকাতায় হইলে তাহার মূল্য অন্ততঃ তিনটি মুদ্রার কম হইত না। আমি হুগলী জেলার লোক, একদিন ছিল, যখন আমরা চার আনার মাছ কিনিয়া বহিয়া আনিতে গলদঘর্ম্ম হইতাম; টাকায় বিশ সের চাল, বার আনায় উপাদেয় গব্য ঘৃত আমরাই কিনিয়াছি, ত্রিশ বত্রিশ সের দুধ, আমরা খাইয়াছি। আজ এই দুর্ম্মূল্যের দিনেও আমরা যে সুবিধা ও সম্ভোগ করিয়া থাকি, আপনাদের তাহা নাই। আমাদের পল্লীগ্রামে অর্থ নাই, স্বাস্থ্য নাই, শিক্ষা নাই, সহবৎ নাই, ঔজ্জ্বল্য নাই, চাকচিক্য নাই, স্বীকার করি। কিন্তু

এই দুর্দ্দিনেও দু'বেলা দু'মুঠা খাদ্য আমরা পাই, যে খাদ্যে ভেজাল নাই।

পরেশচন্দ্র মাছটার কান্‌কোয় দড়ি বাঁধিয়া ঘাড়ে ফেলিয়া আসিতেছিল, বাড়ীর কাছে গলিটার মোড়ে মোটর দেখিয়া, মাছ নামাইয়া গাড়ীর চালকের শরণ লইল। চালক পরম গম্ভীর প্রকৃতির লোক, তারপর গাড়ীর-রাজা রোলস্ তাহার হাতে, পাড়াগাঁয়ের ভুষুণ্ডিদের সহিত বাক্যালাপ করিতেই তাহার সম্ভ্রমে বাধে ? দুই ধমক দিয়া সকলকে হাঁকাইয়া দিলেও পরেশকে কিছু বলিল না। বরং তাহার পানে চাহিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,— এ খোঁকা, মছ্‌লি কাঁহা মিলা ?

পরেশ মাছটাকে নামাইয়া রাখিয়া, এক লাফে পা-দানে উঠিয়া পড়িয়া বলিল, কিনে আনা হ্যায়। রুই মাছ জান ত ?

চালক পৃষ্ঠপোষকতার স্বরে কহিল, হাঁ হাঁ, ও ত জানতা হ্যায়। লেকিন্ কেৎনা মে লিয়া ?

পরেশ লেকিন বুঝিল না, কেৎনা মে'ও বুঝিল না, ভাবিল, মাছটা কাতলা কি না এ ব্যক্তি তাহাই জানিতে চাহিতেছে ; বলিল—কাতলা নয়, রুই। লাল দেখতে পারতা নেই ?

চালক বিজ্ঞের মত বলিল, ও ত ঠিক হ্যায়, লেকিন (আবার লেকিন ?) কেত্তা দাম ?

লেকিনে যে গণ্ডগোল বাধিয়াছিল, দামে তাহার নিরসন হইয়া গেল, পরেশ বলিল, চার আনা।

চালক তাহার দাড়ী এবং গোঁফ ফুলাইয়া বলিয়া উঠিল, চার আনামে এত্তা বড়িয়া মছলি ! এ কিয়া তাজ্জব !

পরেশ এবার সাহসভরে জিজ্ঞাসা করিল, গাড়ীতে কোন্ এসেছে হ্যায়

—জজ-সাব আয়া হ্যায়।

পরেশের বৌদিদির পিতা যে জজ-সাহেব তাহা সে জানিত। উল্লসিত হইয়া গলিটা দেখাইয়া পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল, এই দিকমে গেছেন হ্যায় ?

—হাঁ হাঁ, উধার গিয়া।

পরেশ আর দাঁড়াইতে পারিল না, মাছটাকে ঘাড়ে তোলাও আর হইল না। সেটাকে হিঁচড়াইয়া লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। ছায়া উঠানে দাঁড়াইয়া যাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছিল, অনুমানে তাঁহাকেই জজ-সাহেব বুঝিয়া লইয়া পরেশ বেড়ার ধারেই দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। ছায়া দেখিতে পাইয়া ডাকিল, ওখানে দাঁড়ালে কেন ঠাকুরপো। বাবা, এইটি আমার ঠাকুরপো। মাছ পাওনি বুঝি ?

মাছটাকে দুই হাতে প্রাণপণ শক্তিতে তুলিয়া ধরিয়া পরেশ মৃদু হাসিল। ছায়া ছুটিয়া গিয়া মাছটা লইয়া কাণে কাণে বলিল, প্রণাম করগে ভাই, আমার বাবা।

পরেশ জড়সড় ভাবে অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিতে, জজ-সাহেব বলিলেন, মাছটি কি আমাদের জন্যে এনেছ বাবা ?

জজ-সাহেব !, পরেশ সবিনয়ে বলিল, আজ্ঞে হাঁ।

—বেশ বেশ, তোমার নামটি কি বাবা ?

পরেশ নাম বলিল।

ছায়া বলিল, কত হ'ল ঠাকুরপো ?

—চার আনা। পাঁচ আনা চাচ্ছিল—

জজ-সাহেব বলিলেন—তোরা বলিস কি ছায়া! চার পাঁচ আনায় এত বড় মাছ? নাঃ, এখন থেকে তোদের দেশেই এসে থাকতে হবে দেখছি!

পরেশ ছায়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, আজ কত মাছ যে পড়েছে বৌদি! লোক নেই, বিক্রী হ'ল না। দোয়ারি জেলে কি বলছে জান?

—কি বলছে ঠাকুরপো?

—বলছে, খদ্দের নেই, বড়-জলায় মাছ আর ধরবে না।

জজ সাহেব বলিলেন, এখান থেকে মাছ চালান যায় না?

পরেশের জড়সড় ভাবটা কাটিয়া গিয়াছিল, বলিল, আমাদের যে রেল নেই। রেল হবার কথা হচ্ছে, আসছে বছর রেল হবে।—রেল হবার সম্ভাবনায় বালকের মুখে চোখে আহ্লাদের যে দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল, তাহা দেখিয়া জজ-সাহেব বলিলেন, হচ্ছে ত! বাস্, চার আনায় আর রুই-মাছ কিনে আনতে হবে না। রুই-মাছের আঁস কিনতে হবে।

পরেশ কথাগুলার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিতে লাগিল দেখিয়া, ছায়া বলিল, রেল খুললে দেশের সব জিনিষ সহরে চালান যায় কি-না, তখন দেশে আর কোন জিনিষ পাওয়া যায় না, বাবা সেই কথা বলেছেন, বুঝলে?

পরেশ যাহা বলিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহা সেই বয়সের সব ছেলেই বলে এবং সকলেই তাহা জানে। ছায়া তাহা বুঝিয়াই হাসিয়া বলিল, তুমি ঘরে যাও ঠাকুরপো!

পরেশ সচকিত হইয়া উঠিল, বলিল, মা ডাকছেন?

ছায়া সলজ্জ হাস্যে কহিল, দেখই না গিয়ে।

পরেশ বিনা বাক্যব্যয়ে ঘরে ঢুকিল।

—তুই অত বড় মাছ কাটতে পারবি না কি রে ?

—কি যে বল বাবা ! কেন পারব না ? তোমার চা-টা আগে করে দিই, দিয়ে মাছ কুটে স্নান সেরে রান্না চড়িয়ে দেব।

—চা আছে তোর ঘরে ?

—ঘর করতে সব জিনিষই রাখতে হয়। ক'দিন বিমল দা এসেছিলেন —তাহার গলাটা একটু কাঁপিয়া গেল।

—তাই বললে। কাল রাত্রে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আজ ভোরের জাহাজে সুন্দরবনে যাবার কথা। তোমার মা, আমি, কত বললুম, কলকাতায় থেকে কাজকর্ম্মের চেষ্টা করবার জন্যে। রাজী হল না, বললে, চাকরী করবে না, চাষ করবে। এম্-এ বি-এল পাস করে যাবে চাষ করতে ! চাষের তুই জানিস্ কি বাপু ?—

তিনি আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, ছায়া বলিল, মাথায় ঐ ঢুকেছে—

জজ-সাহেব বলিলেন, ওদের দোষই বা কি ! এম-এ, বি-এল পাস ক'রেও কাজ ত কেউ জোটাতে পারছে না, যা' হক ক'রে পেটের ভাত জোগাড় করতে হবে ত !

তার পর তিনি নিজের মনেই বলিতে লাগিলেন, তাই ত বলি, লেখা-পড়া শিখিয়ে হবে কি ! লোকে যদি রোজগার করতেই না পারল, পেটের ভাতই না পেল, সে লেখাপড়ার দরকার কি !

দাওয়ার উপরের মাদুরটা দেখাইয়া দিয়া ছায়া বলিল, তুমি উঠে বস

বাবা, আমি চা ক'রে আনি। চায়ের সঙ্গে নারকোলের নাড়ু খাবে ত বাবা? তুমি আগে নাড়ু বড্ড ভালবাসতে।

—এখনও বাসি। কিন্তু—

ছায়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কিছু বলছিলে?

জজ-সাহেব বলিল, বলছিলুম। তুই অশোকের সঙ্গে দেখা করলি নে যে এখনও!

—সে ত হবেই; বলিয়া লজ্জারুণ হাসিমুখে অদৃশ্য হইয়া গেল।

অশোক বোধ হয় এই সুযোগটুকুর প্রতীক্ষায় ছিল। ছায়া চলিয়া যাইতেই বাহিরে আসিয়া সবিনয়ে কহিল, একবার আসবেন, মা আপনাকে ডাকছেন?

—আসছি, বাবা, আসছি—বলিয়া তিনি দাওয়ার উপরে উঠিয়া, জুতার ফিতা খুলিতে উদ্যত হইলেন। অশোক বলিল,জুতো পায়ে দিয়েই আসুন-না।

—না বাবা, রোগা মানুষের কাছে জুতোটুতো পায়ে যেতে নেই। কত কি নোংরাটোংরা আছে, তার ঠিক কি!

জুতা খুলিয়া ঘোষ সাহেব ঘরে ঢুকিলেন। অশোক বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। আজ কত কাল পরে, অশোক ভাবিতেছিল, আজ কত কাল পরে আজন্ম-পরিচিত আবাল্যপ্রিয় জন্মভূমির পরে আসিয়া দাঁড়াইল! কত কাল পরে! কোথায় রহিল তাহার বিলাতী শিক্ষা-দীক্ষা, কোথায় রহিল তাহার সাহেবিয়ানা! দাওয়ার ধুলার উপরে বসিয়া পড়িয়া সে ভাবিতেছিল, কাহার পুণ্যে সে আবার মাতার মুখ দেখিতে পাইল, তাঁহার চরণ-বন্দনা করিতে পাইল! তাহার এমন কোন পুণ্য নাই, বরং—অশোক লাফাইয়া উঠিল।

ওদিকের চালাঘরটার দরজায় দাঁড়াইয়া অঙ্গুলি-সঙ্কেতে ছায়া তাহাকে ডাকিতেছিল। ছায়াকে দেখিয়া তাহার চক্ষু জুড়াইয়া গেল। কিন্তু ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতেও পারিতেছিল না, কেমন একটা দ্বিধা, একটা সঙ্কোচ চোখের উপরে দৌরাত্ম্য করিতেছিল। কোন মতে বলিল, আমায় ডাকছ ?

ছায়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হ্যাঁ।

বাঙ্গালীর মেয়েকে যে বেশে সুন্দরী-শিরোমণি দেখায়, সেই চওড়া লালপাড় একখানি শাড়ী ছায়ার পরিধানে, সীমন্তে সিন্দুর-রেখা, ললাটে সিন্দুরবিন্দু বেশ বড় করিয়া পরা, দু'হাতে দু'গাছি করিয়া চারগাছা চুড়ী—তাহাতেই রূপ যেন ফাটিয়া পড়িতেছে, শোভা যেন ছড়াইয়া পড়িতেছে। শরতের পদ্মবনে এত শোভা নাই, বসন্তের ফুলকাননে এত সৌন্দর্য্য নাই, শ্বেতদ্বীপেও এমন শান্ত শ্রী তাহার চোখে পড়ে নাই।

অশোক কাছে আসিলে, ছায়া বলিল, ভেতরে এস।

তখনি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিমুখে বলিল, জুতো খোল, খোল, এটা যে রান্নাঘর, সব ভুলে গেছ বুঝি ?

অশোক বাহিরে জুতা রাখিয়া আসিতে ছায়া নত হইয়া প্রণাম করিয়া, বস্ত্রাঞ্চলে অশোকের দু'টি পা মুছাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, তোমার চা এখানেই দিই, কেমন ?

অশোক বলিল, বাবার ?

—তাঁকে আর পরেশকে ওঘরে দিয়ে আসছি, তুমি এইখানে বোস ; কেমন ?

অশোক মনে মনে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। 'না' শব্দটা তাহার মনে ছিল না। বলিল, তাই বসি।

ছায়া নিঃশব্দে চা প্রস্তুত করিয়া ও-ঘরে পিতাকে দিয়া আসিয়া বলিল, তোমাকে নাড়ু দিয়ে চা দেব না; দু'খানা লুচি ভেজে দিই, কেমন ?

—দাও।

ছায়া লুচি ভাজিয়া দিতে লাগিল, অশোক খাইতে লাগিল। খাওয়া শেষ হইলে অশোক বলিল, তুমি চা খাও না ?

—খাইনে, কিন্তু আজ খাব।

বলিয়া অশোকের ভুক্ত পেয়ালাটা টানিয়া লইয়া চা ঢালিতে উদ্যত হইল। অশোক বাটীটা সরাইয়া লইয়া বলিল, অন্য বাটী নেই ?

—আছে, কেন ?

—সেই বাটীতে নাও; না-হয় এটা ধুয়ে নাও।

ছায়া হাসিয়া বলিল, খুব হয়েছে, দাও।

অশোক দিল না, বলিল, লক্ষ্মীটি, এ বাটীতে খেও না। আমার—

ছায়া বলিল, সোণা অপবিত্র হয় না, জান ? বলিয়া এক রকম জোর করিয়াই বাটীটা মুক্ত করিয়া লইল। একটু জোর করিতে হইল, একটু যে টানাটানি করিতে হইল, কে-জানে কেন, ছায়ার মনে হইল তাহার মৃত নারীত্বটি অমৃতস্পর্শে পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিল। রাজ্যের লজ্জা, বিশ্বের আদর সোহাগ, জগৎজোড়া ভালবাসার গান সব একে একে দেহে জাগিয়া উঠিতে লাগিল।

ছায়া পাশে বসিয়া বলিল, মা'কে আনতে পারলে না তোমরা ?

অশোক বলিল, তুমি না বললে মা আসবেন না। আমরা তাই পরামর্শ করেছি, কাল তোমাতে আমাতে গিয়ে তাঁকে নিয়ে আসব।

বাবার ত এখনও দশ দিন ছুটী আছে, এখানেই ওঁরা থাকবেন। অবিশ্যি কষ্ট খুবই হবে।

ছায়া বলিল, বাবার কিছু কষ্ট হবে না, তবে মার—আর—বলিয়া সে একটু হাসিল, বলিল, তোমারও হয় ত—

পরেশ আসিয়া পড়িল, তাই, নইলে, অশোক যেভাবে হাত বাড়াইয়াছিল, উনুনের অগ্নি সাক্ষ্য করিয়া পুনর্মিলনটা এখনই হইয়া যাইত।

—বৌদি, মাছ কুটবে না?

—চল না ভাই, যাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বাহিরে যাইতে যাইতে, নিম্নকণ্ঠে ছায়া বলিল, মাছ কুটে আসতে আমার দেরী হবে না! তুমি কোথাও যেও না যেন।

—না, আমি এইখানেই আছি।

—না, না, রান্নাঘরে কালি-ঝুলের মধ্যে থাকতে হবে না তা' বলে। কাছে কোথাও থাক-না, আমি ফিরে এসে ডাকব'

—আচ্ছা।

কিন্তু অশোক সেই কালি-ঝুলের মধ্যেই থাকিয়া গেল। মা'র বুকে তাহার চিরঠাঁই আছে ইহা সে জানিত; পরেশ ছেলেমানুষ, ধর্ত্তব্যই নয়। ছায়ার পিতামাতাই তাহাকে ধরিয়া আনিয়াছেন সত্য, কিন্তু ছায়ার মত এরিষ্টোক্র্যাট ঘরের মেয়ে যে অসঙ্কোচে তাহাকে আদর করিয়া লইবে,

ইহা তাহার কল্পনার অতীত ছিল। বহুকাল পূর্ব্বে অধীত একটি গল্পের একটি ভগ্নাংশ তাহার মনে ছিল। বড়লোকের ঘরের এক আদরিণী স্ত্রীর স্বামী জমিদারী দেখিতে গিয়াছেন, সেই সময়ে গ্রামের একটি বিধবা স্ত্রীলোকের নাম তাঁহার নামের সঙ্গে জড়াইয়া গেল। যেদিন স্বামীর গৃহে ফিরিবার কথা, তার আগের দিন স্ত্রী কাঁদাকাটা করিয়া শ্বশুরগৃহ ছাড়িয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছিল, স্বামি-স্ত্রীর মিলন আর হয় নাই। স্ত্রীর মৃত্যু-কালে একটি মুহূর্ত্তের জন্য স্বামী তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল। গল্পটা মোটামুটি ভাবে ঐ টুকুর বেশী তাহার মনে ছিল না. কিন্তু স্ত্রীর লেখা চিঠির একটি ছত্র তাহার মনে পাষাণে খোদিত রেখার ন্যায় সুস্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে স্ত্রী স্বামীকে লিখিয়াছিল, তুমি যত দিন ভক্তির যোগ্য ছিলে, তত দিন ভক্তি করিতাম। এখন আর করি না। তাহার মনে এই আশঙ্কাই ছিল, ছায়া তাহাকে ঐ কথাই বলিবে। বলিলেও, তাহা অন্যায় হইবে না।

সত্য কথা বলিতে কি, সে বিলাত ছাড়িয়া আসিতেই চাহে নাই। অপরাধের পর অপরাধ করিতে করিতে অপরাধী যেমন মরিয়া হইয়া উঠে, অপরাধ সম্পর্কে নির্ব্বিচার হইয়া পড়ে, সে'ও তাহাই হইয়াছিল। অপুত্রক শ্বশুরের বিপুল বিত্ত, সুতরাং কঠোর জীবন-সংগ্রামে বিনাযুদ্ধে জয়—কোন প্রলোভনই তাহাকে ছায়ার সম্মুখীন হইয়া মুখোমুখী দাঁড়াইবার সাহস দেয় নাই. বরং এই কথাটা যখনই মনে হইয়াছে, তখনই তাহার অপরাধ-প্রবণতা মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। মানুষ স্ত্রীর অবজ্ঞাদৃষ্টি সহিতে পারে না। স্ত্রী যে ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিবে, ইহার কল্পনামাত্রে মানুষ বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। অশোক বিলাতে থাকিতে ভাবিত,

এ কালামুখ আর দেশের কাহাকেও দেখাইতে পারিবে না। পরে, নানা-রকমে ব্যস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া বিলাত হইতে পলাইয়া আসিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল, ছায়াকে লিখিয়া পাথেয় সংগ্রহও করিয়াছিল; কিন্তু সে টাকা-গুলি পাওনাদারেরাই গ্রাস করিয়া ফেলে; সামান্য যাহা বাকী ছিল, তাহারই সৌরভে আকৃষ্ট আকুল মধুপদের মধু সরবরাহ করিতেই নিঃশেষিত হইয়া গেল। মধু ফুরাইল, কিন্তু মোহের অবসান হইল না। মধুমোহে আবার সে দেশ ভুলিল, আত্মীয়-স্বজনকে ভুলিল; পুরাতন ব্যাধিসমূহ আবার একটির পর একটি দেখা দিতে লাগিল। ছায়ার নিকট দ্বিতীয়বার গুরুতর অপরাধ করিয়া আবার পুরাতন সঙ্গী ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিলিত হইয়া পুরাতন প্রথায় জীবন উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

এই সময় তাহার শ্বশুর-শাশুড়ী বিলাতে আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। লণ্ডন হইতে বহু দূরে এক গ্রামে কিছু দিন থাকিয়া, তাহাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহারা কন্টিনেণ্ট টুর করিলেন। দেশে ফিরিবার কথা উঠিতে অশোক বিগড়াইয়া গেল। কয়েক দিন পর্য্যন্ত কিছুতেই তাহার মত করান গেল না। কিন্তু মিষ্টার ঘোষ যখন তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ছায়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্যই এক রকম তাঁহাদের অমতেই—তাহার মাতার ঘোর অমতে ত বটেই—অশোকদের সেই অজ পল্লীগ্রামে মেটো-বাড়ীতে বাস করিতেছে, নিজের হাতে রাঁধিতেছে, গৃহকর্ম্ম করি-তেছে, সুতরাং তাহার দিক হইতে কুণ্ঠিত হইবার কোনই কারণ থাকিতে পারে না, তখন হইতে অশোকের জেদটা কমিয়া আসিল। মিষ্টার ঘোষ আরও বলিলেন, আমার একটা পুরানো চাপরাসী একদিন কিছু জিনিষপত্তর নিয়ে গেছল, ফিরে এসে সে যা বললে, ওঁদের (দূরে উপবিষ্টা

স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া) তা বলিনি ভাই, শুনলে কেঁদে অনর্থ করতেন। সেই যে কি বলে ব্রহ্মচারিণী না কি, ছায়া তাই হয়ে গেছে। তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে অশোক, আমার ওখান থেকে কাপড়-জামা সে বড় কম পায় নি, দশ বিশটা পোর্টম্যাণ্ট বোঝাই করা যেতে পারে ; তোমাদের বাড়ী যাবার সময়, সে সবের একখানাও ছায়া নেয় নি, একখানা লালপাড় শাড়ী আর একটা সেমিজ পরে আমার মেয়ে আমার বাড়ী থেকে বিমলের সঙ্গে ট্যাক্সিতে করে চলে গেছল। বাপ-মা'র তাতে যে কত কষ্ট হয়েছিল, তা বোধ হয় তুমি বুঝতে পার। উনি অবশ্য খুবই রাগারাগি করেছিলেন, আমি কিন্তু একটিবারও 'না' বলি নি। হলই বা আমার মেয়ে, তোমার স্ত্রী ত! তোমার বাড়ীই ত তার বাড়ী, সে বাড়ী যেমন হোক্ না। তাই যেদিন সকালে একবস্ত্রে ছায়া আমার বাড়ী ছেড়ে চলে গেল, আমার চোখে জল এসে পড়লেও তাকে আমি বাধা দিই নি। ব্রাহ্মই হই, বিলেতই যাই, আসলে বাঙ্গালী ত। বাপ-মা যার হাতে তুলে দেবে, সে ছাড়া মেয়ের যে অন্য গতিই নেই, এ কথাটা ভুলতে পারি কৈ? আমি তোমায় বলছি অশোক, নিজের মেয়ে বলে বলছি, তা নয় ; তাকে দেখে তোমার চোখ জুড়িয়ে যাবে।

অশোক আজ সেই কথাগুলা ভাবিতেছিল, আর তাহার দুই চোখ দিয়া শ্রাবণের ধারা বহিয়া যাইতেছিল। অশোক রান্নাঘরের একটা কাঠের পিঁড়িতে নতমুখে বসিয়া ছিল, অশ্রুবিন্দুগুলি টপ টপ করিয়া মাটীতে পড়িয়া মাটী ভিজাইতেছিল, অশোক আঙ্গুল দিয়া সেই জলেরই দাগ কাটিতেছিল। ছায়া ঘরে ঢুকিয়া বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল, তুমি বুঝি এই গরমে আগুনতাতে বসে আছ!

অশোক কোন মতে খুব সাবধানে ও সঙ্গোপনে কাপড়ের খুঁটে চোখে মুছিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল।

ছায়া উনানে ভাতের হাঁড়ি চড়াইয়া দিল; ছোট একটা ধামায় চাল আনিয়া অশোকের পার্শ্বে বসিয়া চালগুলা বাছিতে বাছিতে বলিল, ঘি-ভাত করব, খাবে?

—কর।

—মা'র জন্যে দু'টি ঝোল-ভাত আগে করে তাঁকে খাইয়ে দিই, কেমন? তোমাদের ত বেলা হলেও ক্ষতি নেই, কি বল?

এমন সুশীলা, সেবাপরায়ণা স্ত্রীর পানে অশোক চক্ষু তুলিয়া চাহিতেও পারিতেছিল না, ম্লানহাস্যে কহিল, না, ক্ষতি কিসের!

ছায়া বলিল, আচ্ছা, সেখানে কি খেতে? ভাত নিশ্চয়ই পেতে না!

অশোক বলিল, না। তবে পোলাও এক-একদিন হোত।

—বল কি! পোলাও? কে রাঁধত?

—সে দেশের রাঁধুনীরাই রাঁধত।

ছায়া হাসিয়া বলিল, কেমন রাঁধত, ভাল?

অশোক বলিল, ভাল মন্দ বিচার করবে কে? যা পাওয়া যেত, তাই ভাল।

—সাদা ভাত খাও নি কত দিন?

—কাল খেয়েছি।

—ক'লকাতায়?

—হ্যাঁ।

—খুব ভাল লাগে নি?

—তা লেগেছে।

ছায়া বলিল, এখন তা হ'লে মাছের ঝোল-ভাতই করি। ওবেলা ঘি-ভাত বা লুচি যা খাও, তাই হবে। কেমন ?

অশোক বলিল, বেশ।

এমন করিয়া কথা টানিয়া কথা বাড়ান কতক্ষণ চলে ? যে অতি আপন, অতি প্রিয়তম, অথচ মনের পরিচয় যাহার সঙ্গে নাই, তাহার সহিত কথা কওয়া যে কিরূপ বিড়ম্বনা, ছায়া তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছিল। কত কথাই ত জমিয়া রহিয়াছে, কহিতে আরম্ভ করিলে শেষ করাই দায়, তবুও যে কত সাবধানে, কত বিচার-বিবেচনা করিয়া কথা কহিতে হইতেছে, কত আত্ম-প্রতারণাই না করিতে হইতেছে, তাহার ঠিকানাই নাই ! যে কথা মনে উদয় হইতেছে, তাহাকে চাপা দিয়া অন্য কথা বলিতে হইতেছে, যে প্রশ্ন স্বতোৎসারিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাকে দূরে সরাইয়া অন্য প্রশ্ন করিতে হইতেছে, এ যে কি বিড়ম্বনা, তাহা বলা যায় না। অথচ উভয়ে স্বামি-স্ত্রী।

অশোকের সে কষ্ট কষ্ট নয়। সে সমস্ত কথার সত্য উত্তর দিবার জন্য মনকে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। তাহার শুধু শঙ্কা হইতেছিল, ছায়ার কথার ভাণ্ড শেষ না হয় !

তাহার শঙ্কাই সত্য হইল। ছায়া আর কি বলিবে, কোন্ কথা নির্দ্দোষ ও অতীতের চিহ্ন-লেশশূন্য তাহা ছায়া ভাবিয়াই পাইতেছিল না। অথচ চুপ করিয়াও থাকা যায় না ; তাই অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিল, বাবা ত ঠাকুরপোকে নিয়ে বার হোলেন, মাঠ দেখতে, খাল দেখতে, চাষা-ভুষোদের ঘর-বাড়ী দেখতে। বললেন, ফিরতে দেরী হবে। আমি কত বললুম, রোদ্দুরে হাঁটতে কষ্ট হবে—

—হেঁটে গেলেন না কি ?

—হেঁটে ছাড়া আর কিসে যাবেন ? মোটর ত এই বড় রাস্তাটাতেই কোন রকমে চলে, তাও আবার বর্ষার আগে পর্য্যন্ত ; বর্ষার পরে আর চলে না।

অশোক উঠিতে উঠিতে বলিল, তা হ'লে ত খুবই কষ্ট হবে। দেখি, কোন্ দিকে গেলেন।

ছায়া হাসিয়া বলিল, পাড়াটা অমনি বেড়িয়ে আসাও হবে, বোধ হয়।

অশোক বলিল, না, এখন আর বেড়ান হবে না। বাবার সঙ্গেই যাই, একটু ঘুরিয়ে তাঁকেও ফিরিয়ে আনব।—অশোক চলিয়া গেল। যত দূর দেখা যায়, ছায়া দ্বার-সন্নিধানে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

অশোক আগের চেয়ে দেখিতে সুন্দর হইয়াছে। রং তাহার চিরদিন ফর্সা, এখন তাহাতে লাল আভা পড়িয়া আরও সুন্দর করিয়াছে। আগে তাহার দেহটি একটু অধিকমাত্রায় মাংসল ছিল, তাহাকে মোটা বলাও চলিত ; এখন অতিরিক্ত মাংস ঝরিয়া গিয়া দেহটি ঋজু সুঠাম হইয়া কি সুন্দরই দেখাইতেছে ! দেখিয়া যেন আশ মিটে না ! কত কথাই মনে জাগে, ঐ যে দীর্ঘ ঋজু সুগঠিত সবলদেহ লোকটি, সে তাহার, তাহার, তাহার ! একমাত্র তাহার কি-না এই প্রশ্নটা তাহার মনে জাগিতেই মনের আকাশে মেঘের সঞ্চার হইল, কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। পাছে মনের কোণের এই মেঘ মুখের প্রফুল্লতা নষ্ট করে, পাছে বিরস আনন অঘটন ঘটায়, ছায়া সবলে মনকে সংযত করিয়া ফেলিল। হায়, অপ্রত্যাশিত ভাবে কামনার যে দুর্লভ সামগ্রী তাহার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সে কি তাহার মনের কালিমার বাষ্পমলিন মুখে তাহাকে বিদায় করিবে ?

আজ স্বল্পপরিসর ভাঙ্গাচোরা ধোঁয়ায় অন্ধকার রান্নাঘরটির যেখানটায় বৃষ্টি পড়ে, মনে হয় অপরূপ রূপ ধারণ করিয়া অহা যেন হাসিতেছে; সমস্ত তৈজসপত্র আজ ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করিতেছে; সমস্ত জিনিষ আজ যেন নূতন জীবন লাভ করিয়াছে। ছায়ার হাসি পাইতেছিল। তাহার মনের সঙ্গে আজ যে ঘর-সংসারেও এত নূতনত্বের সঞ্চার দেখিতেছে. ইহা মনে করিতেও হাসিতে তাহার মুখ ভরিয়া উঠিতেছিল।

আরও একটা কারণে সে হাসি চাপিতে পারিতেছিল না। আজ কেন প্রতি কাজে প্রতি পদে তাহার এত ভুল হয়! ডালের দরকার, ছায়া মসলার পুঁটলী খুলিয়া বসিয়াছে; ভুল বুঝিয়া হাসিতে হাসিতে মসলার পুটলী তুলিয়া রাখিয়া ডালের হাঁড়ী নামাইয়াছে। কড়ায় মাছ চড়াইয়াছে, মাছ সাঁৎলাইয়া রাখিবার জন্য দরকার একখানা থালার, সে লইয়া আসিল উঠান হইতে আঁসবটীখানা। দুঃখে কষ্টে অন্যমনস্ক থাকিলে ভুল হয় জানা কথা, আনন্দের আতিশয্যেও কি তাহাই হইয়া থাকে?

উঠানের এক কোণে আঁসবটী রাখিয়া ফিরিতেছে, দেখিল কাপড়ের খুঁটটা মাথায় জড়াইয়া অশোক আসিতেছে, ছায়া দাঁড়াইল। অশোক কাছে আসিলে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, এখুনি কি! ফিরলে যে!

—বড্ড রোদ, পারলুম না।

—পেরে দরকার নেই; বসবে এস।

দু'জনে আসিয়া রান্নাঘরে বসিল। ছায়া বলিল, আজ আমার এত ভুল হচ্ছে কেন বলতে পার?

অশোক তাহার মুখের পানে চাহিয়া ঘাড় নাড়িল।

ছায়া হাসিতে হাসিতে বলিল, সত্যি এত ভুল হচ্ছে, আজ কি বলব!

মায়ের ঝোলে দেব নুন, দিলাম তেঁতুল গুলে, আবার সব ফেলে দিয়ে নতুন করে চড়াই। কাঁচা মাছে নুন-হলুদ মাখায় ত, আমি মাখিয়ে বসলাম জিরে-বাটা।

অশোক হাসিতে লাগিল।

ছায়া বলিল, আজ ত ভুল হবার কথা নয়, তবু কেন এত ভুল—বল ত!

অশোক বলিল, কি জানি!

ছায়া কৃত্রিম কোপের সহিত বলিল, তুমি যেন কি! কিছু জান না!

অশোক চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ছায়া আপন মনে রান্না করিতেছে; মাঝে মাঝে হাসিমুখটি তুলিয়া অশোকের পানে চাহিতেছে; অশোক হাসিতে হাসি মিলাইবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু সে চেষ্টাকৃত হাসি প্রাণ পাইতেছে না।

অনেকক্ষণ এইভাবে কাটিল। বিজ্ঞজন বলিয়া থাকেন, স্বামি-স্ত্রী নির্জ্জনে বসিয়া আছে, অথচ তাহাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা নাই—এ লক্ষণ ভাল নয়। মনে মনে দু'জনেই তাহা বুঝে, দু'জনেই প্রতিকার চায়, কিন্তু প্রতিকারটিই বা কই!

এক সময়ে অশোক মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, ছায়া!

ছায়ার কাণের ভিতর দিয়া কত মধু যে প্রবেশ করিল তাহা বলা যায় না। তাহার সকল অঙ্গ যেন নৃত্য করিয়া উঠিল। চন্দ্রোদয়ে সাগর-তরঙ্গের মত, দক্ষিণ বায়ে পুষ্পলতার মত, নবারুণরাগে ধরিত্রীর মত নারী-দেহ পলকে পুলকে যেন বিকশিত হইয়া উঠিল। যে কণ্ঠস্বরে পাখী প্রথমে প্রভাতী গাহে, যে কণ্ঠস্বরে নবোঢ়া বধূ ফুলশয্যার রাত্রে কথা বলে,

যে কণ্ঠস্বরে লজ্জা মাধুর্য্যের গলবেষ্টন করিয়া থাকে, যে স্বরে অনুরাগ ঝঙ্কার দিয়া উঠে, সেই কণ্ঠস্বরে ছায়া বলিল, বল ।

কিন্তু অশোক আর মুখ তুলিতে পারে না।

ছায়া সাগ্রহে কহিল, চুপ করে রইলে যে !

অশোক নতমুখেই কহিল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।

ছায়ার ভিতরটা ভয়ে কাঁপিতেছিল ; বাহিরে তাহা যথাসাধ্য গোপন রাখিয়া হাসিমুখেই কহিল, মোটে একটা !

অশোক বলিল, এখন থাক।

ছায়া সহজ স্বাভাবিক স্বরে কহিল, থাকবে কেন, বল না !

অশোক বলিল, না, রাত্রে বলব !

ছায়া হাসিয়া ফেলিল ; বলিল, এখনও যা রাত্রেও ত তাই ! এখন বলতেই বা ক্ষতি কি !

ক্ষতি কিছুই নয়, তবু যতটা বিলম্ব হয় ততই ভাল। অশোক তাহাই ভাবিতেছিল।

ছায়া অন্য কথা ভাবিতেছিল ? সে ভাবিতেছিল, কঠিন পরীক্ষা সম্মুখাগত। অধীর ছাত্রের মত যত শীঘ্র পরীক্ষা শেষ হইয়া যায়, সে তাহাই কামনা করিতেছিল। হাসিমুখে বলিল, রাত্রে কোথায় শোবে বল ত ?

অশোক উৎকণ্ঠিত ভাবে নীরবে মুখ তুলিল।

ছায়া কতকটা লজ্জা কতকটা রাগভরা কণ্ঠে বলিল, বল না গো কোথায় শোবে ?

উত্তর ছিল—এবং সে উত্তরে স্ত্রী মাত্রেই সুখানুভব করিতে পারে—

সে উত্তর যে অশোকেরও জানা ছিল না তা নয় ; কিন্তু সে উত্তর দিতে মনের যে বলের দরকার, অশোকের তাহা ছিল না এবং কেন ছিল না অশোকের মত অন্যেও তাহা বুঝিত। কিন্তু ছায়া তাঁহা বুঝিয়াও বুঝিল না, অথবা বুঝিতে চাহিল না, অথবা চিন্তাটাকে সে আমলই দিল না।

ছায়া পুনরায় বলিল, বললে না ত কোথায় শোবে!

একটু থামিয়া আবার বলিল, একটি ত ঘর, মা রোগা মানুষ, মাকে ত নড়ান যাবে না, বাবাই বা কোথায় শোন, তুমি—বলিয়াই সে হাসিয়া ফেলিল, বলিল—তুমি আমিই বা কোথায় শুই বল ত!

অশোক কোন কথা বলিল না, মুখ তুলিয়া চাহিলও না।

ছায়া একটু পরে বলিল, এ পাশে একখানা ঘর না তুললেই নয়। কি বল?

অশোক তথাপি কথা কহে না দেখিয়া ছায়া উদ্বিগ্ন মুখে বলিল, কি হল, অমন চুপচাপ যে!

অশোক বার দুই ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, তুমি বিলাতের কথা জানতে চাও না?

ছায়া উৎসুকভাবে কহিল, বিলাতের গল্প?

অশোক নীরবে চাহিল।

ছায়া মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, না।

না! আশ্চর্য্য! অশোক বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল।

ছায়া বলিল, দেশ-বিদেশ দেখতে আমার খুব ভাল লাগে, দেশবিদেশের গল্প শুনতে কিন্তু একটুও ভাল লাগে না।

অশোক যেন বাঁচিয়া গেল। সব কথা বলিবার জন্যই সে নিজেকে

প্রস্তুত করিতেছিল, কিন্তু তাহা যে কত কঠিন, তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলেও ছায়ার কাছে অকপটে মুক্ত হৃদয়ে সব কথা বলিবার সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিল। ছায়া সে কাহিনী শুনিতে অস্বীকার করায় এক-দিকে সে যেমন পরিত্রাণ লাভ করিল, অন্যদিকে মনের ভারটা যেন আরও ভারী হইয়া উঠিতেছিল। সেই ভারী বোঝাটাকে নামাইতে পারিলেই যেন সে সত্যকার মুক্তি পায়

ছায়া উনানে কি একটা চড়াইয়া এক মনে তাহাতেই খুন্তি চালনা করিতেছিল, অশোক অপলক নেত্রে চাহিয়া তাহাই দেখিতে লাগিল! ছায়ার মুখের একটা দিকই দেখা যাইতেছে, সেই একটা দিকে যাহা দেখা যাইতেছে, তাহা অতীব স্পষ্ট, তাহাতে কোনরূপ ভেজাল নাই। কোমল আননের প্রত্যেকটি কমনীয় রেখা স্বচ্ছ প্রফুল্ল হৃদয়ের প্রতিবিম্ব ধারণ করিয়া রহিয়াছে। দেখিলেই মনে হয়, ইহার কোথাও একটু মেঘ নাই, শরতের সুপ্রভাতের মত সকলই সুনির্ম্মল। অশোক তাহাতেই ভরসা পাইয়া বলিল, আমি কিন্তু সব কথা বলে তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে চাই।

ছায়া খুন্তিটাকে নামাইয়া রাখিয়া, একগাল হাসিয়া বলিল, আমি শুনলে ত!

—তার মানে?

—আহা! মানে আবার বোঝ না!

অশোক বলিল, আমি যে কত বড় পাপিষ্ঠ—

ছায়া হাসিয়া বলিল, ওগো মশাই, এটা আপনার কনভেণ্ট নয়, আপনি অবিবাহিতা কুমারী ন'ন, আমিও তোমার খুড়ি, আপনার পাদ্রী সাহেব

নই যে তোমার—ঐ যুঃ, আপনার কনফেসন শুনে ক্ষমা করে আপনাকে স্বর্গের ছাড়পত্তর লিখে দোব। আমার কাছে আপনার অত বক্তৃতা করতে হবে না। বুঝলেন ?

অশোককে নীরব দেখিয়া হাসি মুখে আবার বলিল. হ্যাগা, আমি কি তোমার জজ-সাহেব না ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব !

—কিন্তু তুমি—

—কি আমি ?—তখনই উচ্ছ্বসিত হাস্যে প্রায় লুটাইয়া পড়িয়া কহিল, তোমার স্ত্রী ! প্রভু নই, বিচারক নই, দাসী নই, বাঁদীও নই, শুধু স্ত্রী ! বুঝলে ?

—স্ত্রীর ক্ষমা না পেলে—

ছায়া মসলার পাত্র হইতে গোটাকতক লঙ্কা-ফোড়ন হাতে তুলিয়া বলিল, শীগগির চুপ কর, নইলে এই ফোড়নগুলো সব কড়ায় ছেড়ে দেব. হাঁচতে হাঁচতে সারা হবে।

—কিন্তু আমি যে না বলে নিশ্চিন্ত হতে পারছি নে !

—কে তোমায় নিশ্চিন্ত হতে বলছে ! কাজের অন্ত আছে না কি ? ঐ যে ঘরটার কথা বললুম, তার ব্যবস্থা কর'না ! টাকা আমার কাছে আছে। কিন্তু লোকজন জিনিসপত্তর ঠাকুরপোকে সঙ্গে নিয়ে যোগাড় করে ফেল দেখি !—থামিয়া একটু হাসিয়া বঙ্কিম নয়নে ছোট্ট একটি কটাক্ষ হানিয়া বলিল, আলাদা আলাদা থাকতে কি ভাল লাগে !—বলিয়াই মুখটা ফিরাইয়া লইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া কড়ায় তরকারী নাড়িতে মন দিল।

অশোক তখনও বসিয়া ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া ছায়া রাগতভাবে কহিল, প্রথম রাত্রিটি ত বিফলেই গেল—লজ্জায় আড়ষ্ট ও রাঙা হইয়াও

কথাটা শেষ করিল, দেখ না গো, ঘরটা যাতে আজ-কালের মধ্যে হয়ে যায়।

হঠাৎ বাহিরে অনেকগুলি লোকের কণ্ঠস্বর শুনিয়া রান্নাঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়া দেখিয়া লইয়া ছায়া হাসিমুখে বলিল, গাঁয়ের লোক সব তোমাকেই দেখতে এসেছেন। যাও

অশোক বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলে, ছায়া তাহার পাশে আসিয়া চুপে চুপে বলিল, আমার কথাটা ভুল হয় না যেন।—বলিয়া রাঙা মুখে হাসিয়া সরিয়া গেল। আবার কাছে আসিয়া বলিল, ঘরটা, বুঝলে?

বাহিরে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই গ্রামের লোক। অশোক কাহারও চরণ স্পর্শ করিয়া. কাহাকেও শুধ হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া নতমুখে দাঁড়াইল, কুশল-প্রশ্নাদি ও অশোকের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা উঠিয়া পড়িল। অশোক তাঁহাদিগকে দাওয়ায় উঠিয়া বসিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাহারা উঠিলেন না; অথচ যে-স্থানটিতে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, সেই স্থানটি রৌদ্রে পুড়িয়া যাইতেছিল। তাঁহারা সরিয়া গিয়া কাঁঠাল গাছটার ছায়ায় দাঁড়াইলেন।

তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে যে খুব সঙ্গোপনে একটা আন্দোলন চলিতেছিল, তাহা অশোকও বুঝিতেছিল, কিন্তু সেটা যে কি. তাহা সে অনুমান করিতে পারে নাই।

বয়োবৃদ্ধ একজন অন্য সকলকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, নরু ত আর আমাদের পর নয়। ওর কাছে ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড় করা কেন? খুলে বললেই ত হয়। তোমরা না পার, আমি বলছি।

সকলেই স্মিত নয়নে তাঁহাকে সমর্থন করিল।

তিনি বলিলেন, বাবা নরু, একটা কথা বলি, এদিকে একটু এস ত! —বলিয়া তিনি অশোককে সঙ্গে লইয়া কাঁঠাল গাছটার ওদিকে যাইতে-ছিলেন, ইঁহারা আপত্তি করিয়া বলিলেন, বলতে হয় এখানেই বল না, সরকার। ছেলেমানুষকে আবার রোদে টানা-হেঁচড়া করে নিয়ে যাওয়া কেন।

তখন সেই লোকটি কহিলেন, শোন বাবা নরু! আমাদের সকলেরই ইচ্ছে, তুমি দুটো প্রায়শ্চিত্ত করে ফেল, তা হ'লে তোমার সঙ্গে চলা-ফেরা করতে কারও কোন অমতই আর থাকে না।

অশোক সবিস্ময়ে কহিল, প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে!

—তাতে দোষ কি বাবা।

—একটা নিয়ম আছে, বুঝলে না নরু।

—এমন হাঙ্গামার কাজও সে কিছু নয়।

—গ্রামশুদ্ধ সকলেরই ইচ্ছে, বুঝলে নরু।

অশোক বলিল, কিন্তু দুটো কেন?

—একটা হচ্ছে বিলেত যাওয়ার। আর—

—আর একটা!—বক্তা একটু এদিক-ওদিক দেখিয়া লইয়া বলিলেন, পাড়াগাঁয়ে ওটা এখনও চলে নি কি না, বুঝলে না বাবা।

—কি চলে নি?

—ঐ যে কেরাশ্চান মেয়ে বিয়ে।

অশোক বলিল, খৃশ্চান! কে বলেছে আমি খৃশ্চান বিয়ে করেছি?

—ব্রহ্ম, কেরাশ্চান, মুসলমান—ও তিনই এক।

—বলেন কি পার্ব্বতী কাকা। ব্রাহ্ম আর খৃশ্চান, মুসলমান এক!

—এক বৈ কি বাবা !

—সকলেই বলে—

—আমরাও জানি—

—ওরা তিনই গরু খায়।

—নইলে সনাতন হিন্দু সমাজ ওদের বার করেই বা দেবে কেন, বল !

অশোক বলিল, কিন্তু আপনারা বোধ হয় জানেন না, হাইকোর্টের জজেরা পর্য্যন্ত রায়ে স্বীকার করেছেন, ব্রাহ্মরাও হিন্দু।

—ওদের কথা ছেড়ে দাও না বাবা ! আদালত চিরকাল মিথ্যে কথা বলে ; ওখানে মিথ্যেরই জয়-জয়কার। যে যত বেশী মিথ্যে বলতে পারবে, তারই জিত, বুঝলে না ! আইন-আদালতের কথা ছেড়ে দাও। যে যত ঘুষ খাওয়াতে পারবে, যে যত সত্যকে মিথ্যে করতে পারবে, মিথ্যেকে সত্য করতে পারবে, জজরা তার গোড়েই গোড় দেবে !

হঠাৎ পরেশের সঙ্গে অপরিচিত, দীর্ঘকায় একজন প্রৌঢ় বয়স্ক সুপুরুষ ব্যক্তিকে বেড়া ডিঙ্গাইতে দেখিয়া বক্তার বক্তৃতা থামিয়া গেল এবং জনতা সাগ্রহে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

আগন্তুক দীর্ঘ এক মিনিট কাল ললাটে যুক্তকর স্থাপন করিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন, আপনারা নিশ্চয়ই গ্রামের লোক। আপনাদের গ্রাম বেড়িয়ে এলাম। বেশ গ্রাম !

সমগ্র জনতা নকুর মুখের পানে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া আগন্তুকের পরিচয় জানিতে চাহিলেন।

অশোক বলিল, আমার শ্বশুর-মহাশয়।

জনতা সম্ভ্রমে বিনয়াবনত হইয়া পড়িলেন।

জজ-সাহেব বলিলেন, আপনাদের জেলাতেই আমি আসছি ওমাস থেকে।

জনতা এবারে ভূম্যবলুণ্ঠিত হইলেন।

—তা আপনাদের সব কিসের পরামর্শ হচ্ছে, বলুন।

—ও কিছু না, কিছু না। নরুর সঙ্গে দেখা—

অশোক বলিল, ওঁরা বলছেন আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে

সমগ্র জনতা একেবারে ডিঙ্গি মারিয়া উঠিয়া বলিলেন, আরে, ও একটা কথার কথা—

অশোক বাধা দিয়া বলিল, ওঁরা বলছেন, ছুটো প্রায়শ্চিত্ত না করলে—

—ছুটো। ওঃ। বুঝেছি। তা প্রায়শ্চিত্তটা আধুনিক প্রথায় হবে, না—

—আপনি ধর্ম্মাবতার। আপনি যেমন আদেশ করবেন। পাড়াগাঁ স্থান, বুঝতেই ত পারছেন। তা ছাড়া—

—বাবা!

কোমল নারীকণ্ঠে আহ্বান আসিল, বাবা!

জজ-সাহেব বলিলেন, আপনারা একটু দাঁড়ান, আমার মেয়ে কেন ডাকছে, শুনে আসি। 'কোথা রে ছায়া?

অশোক রান্নাঘর দেখাইয়া দিল।

রান্নাঘরে আসিয়া জজ-সাহেব যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মনে হইল, ছায়া বোধ হয় এখনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে। তাহার মুখ-চোখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে; কপাল দিয়া দর দর ধারে স্বেদ ঝরিতেছে; দেহটি

যেন থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। জজ-সাহেব ভাবিলেন, রান্না-ঘরের উত্তাপে এইরূপ ঘটিয়াছে। অবিলম্বে একটি পাচক বা পাচিকার ব্যবস্থা করিতে হইবে ভাবিয়া লইয়া, বলিলেন, কি বলছিস?

ছায়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, ওঁরা যা বলছেন, তাতে কি তোমার মত নেই?

—না।

ছায়া একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, কিন্তু করাই ভাল।

—কে বললে ভাল? কি দোষ করেছে যে, প্রায়শ্চিত্ত করতে যাবে, গোবর খাবে? কেন, কিসের জন্যে—

—কিন্তু ওঁরা যখন বলছেন—

—দেখ্ না, আমি ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি। পাড়াগাঁয়ের লোক, দম দিয়ে কিছু বার করে নিতে এসেছে বুঝলি নি! এখন শুনেছে আমি এই জেলার জজ হয়ে আসছি, অমনি সুর কোমলে নেমে গেছে, দেখছিস না?

ছায়া সকাতরে বলিল, না বাবা, তুমি করতে বল ওকে?

জজ সাহেব অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, তোর এত ভয় কেন বল ত?

—সে আমি তোমায় বলতে পারব না, কিন্তু তুমি অমত ক'র না বাবা, আমার এই কথাটি রেখ। বলিতে বলিতে তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল।

—আচ্ছা, আচ্ছা। সে আমি দেখছি। তুই বাইরে একটু হাওয়ায় গিয়ে বস গে দিকিন।

—তুমি ওঁদের সঙ্গে তর্ক ক'র না বাবা, ওঁরা যা বলেন, তাইতেই মত কর।

—আচ্ছা, আচ্ছা—বলিয়া জজ-সাহেব চলিয়া গেলেন। কন্যার এতখানি ব্যগ্র আকুলতার কোন কারণই তিনি বুঝিলেন না। কাল রাত্রি হইতে যে কথাটা কালভুজঙ্গের মত ফণাবিস্তার করিয়া ছায়ার মনের মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে, অন্যে তাহা কিরূপে জানিবে?

জজ-সাহেব ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ—তা হলে আমার মতেই আপনাদের মত ত?

—নিশ্চয়, নিশ্চয়, আপনি হুজুর, ধর্ম্মাবতার।

—বেশ, তা হলে শুনুন। অশোক প্রায়শ্চিত্ত করবে কিন্তু ও আধুনিক ছোকরা, আধুনিক মতে প্রায়শ্চিত্ত করলে আপনাদের আপত্তি হবে না ত?

—আপনি যখন বলছেন, কার সাধ্যি আপত্তি করে।

—উত্তম। শুনুন, গ্রামসুদ্ধ সমস্ত লোককে ও খাওয়াবে, আর প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ প্রত্যেককে পাঁচটা করে টাকা দেবে। তার বেশী কিছু ও করবে না। আপনারা রাজী?

—এ ত খুবই সমীচীন প্রস্তাব হুজুর।

—এতে আর আপত্তি করবার আছে কি?

—হুজুর যখন বলছেন—

—তা শুভস্য শীঘ্রম্।

কেবল একজন বলিল, একটু গোময়—

জজ-সাহেব বলিলেন, সেটা আপনারা কেউ ওর হয়ে খেয়ে নেবেন। তার জন্যে দশটাকা বেশী। কেমন রাজী?

রাজী কি-না, তাঁহারা যে জবাব দিলেন, তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইবার কথা নহে। আগামী পরশ্ব শুভকর্ম্মের দিন স্থির করিয়া তাঁহারা প্রস্থান করিলেন বটে, কিন্তু গোময়-ভক্ষণ-সৌভাগ্য-সমস্যা লইয়া সেই দীপ্ত দ্বিপ্রহরে মাঠের মাঝখানে দাঁড়াইয়া যে কাণ্ড করিতে লাগিলেন, তাহা লিখিতে আমার এই মসী-অঙ্গ লেখনীও লজ্জায় মরিয়া যাইতেছে। আমি সে লজ্জা হইতে তাহাকে অব্যাহতি দিলাম। অতঃপর আপোষে স্থির হইল, কাজটা তিন চার জনেই করিবেন। জজ-সাহেব দরাজ-হাত লোক, তাহাতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

জজ-সাহেব রান্নাঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া বলিলেন, কেমন রে, হয়েছে ত?

মেয়ে বাপের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, ঠিক হয়েছে বাবা।

—কিন্তু কেন বল দেখি তোর এত—

—সে তোমায় অন্য সময়ে বলব বাবা। পাড়াগাঁয়ের লোক যে কি ভীষণ! কিন্তু অনেক বেলা হয়েছে, চান করবে না বাবা?

—ঐটি বাদ। শেষে কি তোমার শ্বশুরবাড়ী থেকে ম্যালোয়ারি নিয়ে যাব?

—আমার দেশে ম্যালোয়ারি নেই। বেশ চান না কর, না করবে, একটু জিরিয়ে হাত-পা ধোও, রান্না হয়ে গেছে। আমি শাশুড়ীকে ছুটো খাইয়ে আসি।

ছায়ার শাশুড়ী নির্জীবের মত পড়িয়াছিলেন। ছায়াকে দেখিয়াই ডুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন; ডাকিলেন—বৌমা!

ছায়ার চোখেও জল আসিয়া পড়িয়াছিল, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, কেন মা?

—বুড়ো মাকে ক্ষমা কর মা, তুমি আমার সতীলক্ষ্মী, তোমার সিঁদুরের জোরেই আমার বাছা ফিরে এসেছে।

ছায়া ভূতলে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, উঠুন মা, ভাত এনেছি।

শাশুড়ী বলিলেন, বল মা, কোন কথা মনে রাখবে না?

ছায়া তাঁহার পায়ে মাথা ঠেকাইয়া বলিল, না মা, না! পুরাণো কোন কথা আমার মনে নেই; সব আমি ভুলছি! আপনি উঠুন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বৃষ্টি! বৃষ্টি! বৃষ্টি!

কয় দিন হইতে অবিরল বৃষ্টির ধারা নামিতেছে, একটি বারের তরেও বিরাম নাই। আকাশ যেন সর্বস্ব নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া দেউলিয়া হইবার সঙ্কল্প করিয়াছে। দিন ও রাত্রির মধ্যে একটি বার পাঁচ মিনিটের জন্যও ধারাবর্ষণ ক্ষান্ত হয় নাই। সহরের রাস্তার উপর এক-কোমর জল, কোন বাড়ীর একতলার একটি ঘরও বাসযোগ্য নাই। অনেক বাড়ীঘর পড়িয়া গিয়াছে, ভাসিয়া গিয়াছে, নদীর জলস্রোত তাহাদেরই ভগ্নাংশ বহিয়া অবিরাম ছুটিয়া চলিতেছে।

ইন্দুর বাঙলোখানিও জলে ভাসিতেছে, ঘরের ভিতরে এখনও জল ঢুকে নাই বটে, তবে দেরীও বিশেষ নাই। আজ রাত্রি নাগাদ এ বাঙলো

অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িবে। উদ্যানে ফুলগাছ, লতাপাতা জলে ডুবিয়া আছে, কেবল দীর্ঘ দেবদারুগুলি এখনও গর্ব্বভরে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। নদীর দিকে বেড়ার ধারে দুইটা প্রাচীন কাঁঠাল গাছ ফলভারে যষ্টিবুড়ী হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল; আজ সকালে তাহাদেরও পতন হইয়াছে, একটি নাচিতে নাচিতে নদীর বুকে পড়িয়া ভাসিয়া কোন দূর দেশে চলিয়া গিয়াছে, অপরটি একটু একটু করিয়া নামিতে আরম্ভ করিয়াছে, আর খানিক পরে সেও নদীর বুকে গিয়া পৌঁছিবে এবং প্রেমিকা গোমতী তাহাকে বুকে ধরিয়া উল্লাসে শত বাহু বিস্তার করিয়া ছুটিয়া চলিয়া যাইবে। আউট্-হাউস্টা ধ্বসিয়া জলশায়ী হইয়াছে, দরোয়ান তাহার পুঁজি-পাটা, লোটাকম্বল, তুলসীদাসী রামায়ণ হইতে খড়ম জোড়া, সমস্ত লইয়া সাহেবের অফিস-কামরায় আস্তানা গাড়িয়াছে; প্যান্ট্রির ভিতরে এক-বুক জল; বেয়ারা, বাবুর্চ্চি, মশালচী দরোয়ানের সঙ্গী হইয়াছে। দরোয়ান নিষ্ঠাবান্—গোঁড়া হিন্দু, আর তিন ব্যক্তি মুসলমান, তবে গোঁড়া নয়—কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে কেহ কোন দিন অন্য জাতির ছোঁয়া জল খায় নাই ও এক ঘরে বসবাস করে নাই। আজ তাহারা আপিস ঘরে ছাতু ও মুরগীর আণ্ডার সংমিশ্রণ ঘটাইয়াও বেশ আছে।

ইন্দু সেই সকালে শয্যাগৃহের জানালায় আসিয়া বসিয়াছে, সমস্ত দিনের ভিতর আসন ত্যাগ করে নাই বলিলেও চলে। কর্ত্তব্যপরায়ণ বেয়ারা, বাবুর্চ্চি কয়েক বার মেমসাহেবের খবরদারী করিতে আসিয়াছিল, তিরস্কৃত হইয়া প্রস্থান করিয়াছে, আর আসিতে সাহস করিতেছে না।

জানালা খোলা।—যত দূর দৃষ্টি চলে, জল আর জল। পৃথিবী দেখা

যায় না, জলে ডুবিয়া আছে ; আকাশ দেখা যায় না, আকাশ হইতে কেবলই জল নামিতেছে। যে জানালাটায় মুখ রাখিয়া সে বসিয়া আছে, তাহার নীচেও জল। হাতটি অল্প একটু ঝুলাইলেই জল স্পর্শ করিতে পারা যায়। জল যদি আর একটু বৃদ্ধি পায়, তবে এই ঘরও জলে ভাসিবে। ইন্দু যেন সোৎসাহে, সোল্লাসে, সাগ্রহে সেই ক্ষণটির প্রতীক্ষা করিয়া আছে। ঘন ঘন হাত বাড়াইয়া দেখিতেছে, আর কত বাকী? জল আর কতটুকু উঠিলেই এই জানালা দিয়া প্লাবন ঢুকিয়া পড়ে! সে যেন সেই বিশ্বধ্বংসী প্লাবনকে সাদর সংবর্দ্ধনা করিবার জন্যই ঘরের সমস্ত দরজা-জানালা খুলিয়া দিয়া বসিয়া আছে।

করুগেটেড সীটে তৈরী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চাল স্রোতে পড়িয়া ছুটিতেছে! কোন হতভাগাকে নিরাশ্রয় করিয়াই যে তাহারা উন্মত্তের মত পৈশাচিক উল্লাসে ছুটিতেছে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। চালে আবদ্ধ কাষ্ঠখণ্ডগুলা বন্ধনমুক্ত হইয়া আগে আগে ছুটিতেছে—নক্ষত্রবেগে ছোটা কাহাকে বলে, নদীর উত্তাল স্রোতে এই ধাবমান কাষ্ঠখণ্ডগুলিকে না দেখিলে তাহা বুঝা যায় না।

কতকগুলি গরু-মহিষ প্রাণপণে বিরুদ্ধতা করিতে করিতেও ছুটিতেছে; হাঁড়ী-কলসী, পিতলের ঘড়া, ঝুড়ি, মাদুর, সতরঞ্চি—গৃহের আসবাব-পত্রও ছুটিতেছে। আবার এক পাল গরু-মহিষ। একখানা খড়ের চালাঘর, তাহার বাঁশের খুঁটি, বাঁশের কড়ি-বরগা, কঞ্চির বেড়া, ঝাঁপ সমেত চক্ষুর পলক ফেলিতে না ফেলিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

একটি মানুষের মৃতদেহ—বোধ হয় পুরুষের দেহ—উপুড় হইয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া গেল; আর একটা, আরও একটা, একটি নারী-দেহ

সম্পূর্ণ উলঙ্গ, দেহটি ফুলিয়া ঢোল হইয়া উঠিয়াছে, চিৎ হইয়া ভাসিতে ভাসিতে জানালার নিকট দিয়াই চলিয়া গেল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, দূরে আর দৃষ্টি চলে না; নেহাৎ জানালার নিকট দিয়া যাহা যায়, তাহাই দেখা যাইতেছে। একটা মহিষের গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার পিঠের উপর শুইয়া পড়িয়া একটি জীবন্ত বালক তারস্বরে চীৎকার করিতেছে। তাহার চীৎকারে ভয় পাইয়া মহিষটি আর্ত্তনাদ করিবার চেষ্টা করিতেছে বটে, কিন্তু সে অবসর তাহার মিলিতেছে না, স্রোতোবেগ নিঃশ্বাসটুকু ফেলিবার অবসরও দিতেছে না। ইন্দু তাড়াতাড়ি আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, ভাবিল, বেয়ারা-বাবুর্চ্চিদের ডাকিয়া ছেলেটাকে উদ্ধার করিতে বলে, কিন্তু উদ্ধার-চেষ্টা যে কিরূপ অসম্ভব, তাহা বুঝিতে পারিয়া আবার সে চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল। যে দুর্দ্দান্ত স্রোতোবেগে দুরন্ত মহিষ তৃণখণ্ডের মত ভাসিয়া চলিয়াছে, মানুষ সে স্রোতের মুখে চূর্ণ হইয়া যাইবে!

সন্ধ্যা আসন্ন বুঝিয়া বেয়ারা আলো জ্বালিয়া আনিয়া টিপয়ের উপর রাখিয়া দিল। বাবুর্চ্চি সঙ্গে আসিয়াছিল, বিনীতকণ্ঠে কহিল, মেমসাব খানাকা কুছ—এই পর্যন্ত বলিয়াই সে চুপ করিল।

কিন্তু কোন উত্তর আসিল না দেখিয়া আর একবার সাহসে ভর করিয়া কহিল, মেম[illegible]—

[illegible] তাহার [illegible]

—নেহি ম[illegible]

প্রভুভক্ত বেটারা পুনরপি আবেদন জানাইতে ইন্দু বিরক্ত ভাবে কহিল হিঁয়া কোই মেমসাব নেহি হ্যায়, যাও।

বাবুর্চ্চি চলিয়া গেল; বেয়ারাটাকে ইন্দু স্নেহ করিত; তাহার বালু

বাচ্চার জন্য নানা সময়ে নানা দ্রব্য দিত ; মাঝে মাঝে তাহারা কে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করিত ; সময়ে সময়ে দুই একটা টাকাও তাহাদের জন্য দিত। সে ডাকিল, মা—

ইন্দু মুখ ফিরাইয়া চাহিল।

বেয়ারা যাহা বলিল তাহা এই—আজ কিছু খানা হয় নাই, ঘরে নাই-ও কিছু বাজার, হাট, দোকান, পশরা সব ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, শুধু একটি লোকের বাড়ী হইতে কয়েকটা ডিম সে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে, তাহাই সম্বল। মা আজ্ঞা করিলে তাহারই আমলেট্ বা পোচ বানাইয়া দিতে পারে।

ইন্দু স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, আমার খেতে ইচ্ছে নেই।

বেয়ারা বলিল, বড় সাহেবের চাপরাসীর সঙ্গে তাহার পথে দেখা হইয়াছিল, তাহারই কাছে সে খবর পাইয়াছে, আমাদের সাহেব আজ রাত্রির মধ্যেই গন্তব্য স্থানে নিরাপদে পৌঁছিবেন।

কথাগুলা গুছাইয়া বলিয়া চতুর লোকটি এই ভাবে উপসংহার করিল, যে, তবে, মা, আপনি খাইবেন না কেন ?

হায়, সে বেচারা যাহা ভাবিয়াছে, তাহা যদি সত্য হইত, তবে নারীর পক্ষে সে কত-না সুখের, কত-না তৃপ্তির উপবাস বলিয়া বিবেচিত হইত ! যে নারী তেমন উপবাস করে, তাহার মত সৌভাগ্[illegible]না [illegible]?

বেয়ারা ভরসা পাইয়া আবার বলিল, সাহেবের [illegible] পাঁচ সাতদিন দেরী হইতে পারে, তত দিন কি আপনি খাইবেন না মা ?

ইন্দু বিরক্ত ভাবে কহিল, তুমি যাও এখান থেকে।

বেয়ারা চলিয়া গেল।

তথন গাঢ় অন্ধকার নামিয়াছে, বৃষ্টির ঝুপ-ঝুপ শব্দই শুধু শুনা যাইতেছে, চোখে আর কিছুই দেখা যায় না। ঘরের আলোটা না থাকিলেই ভাল হইত, কিন্তু উঠিয়া গিয়া নিবাইবার বা কমাইয়া দিবার ইচ্ছাও হইল না। ইন্দু আগের মতই বহিঃপ্রকৃতির পানে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

বেয়ারা আবার আসিয়া ডাকিল, মা—

ইন্দু পরুষকণ্ঠে কহিল, নেহি মাংতা, চলা যাও!

বেয়ারা ভয়ে ভয়ে জানাইল, বড় সাহেবের কেরাণীবাবু দেখা করিতে আসিয়াছেন।

—কাহে?

—আমাকে বলেন নাই।

ইন্দুর মনে হইল, মফঃস্বলের কোন খবর ঐ লোকটা আনিয়াছে; তাহাই জানাইতে চায়।

বলিল, পুছো ক্যা কাম?

বেয়ারা চলিয়া গেল এবং ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্ববৎ শুদ্ধ ভাষায় নিবেদন করিল, বড় সাহেব পাঠাইয়াছেন।

বড় সাহেব অর্থে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট। ইন্দু অনুমান করিল, নিশ্চয়ই মফঃস্বলের খবর। [illegible]র অন্ত্রে রন্ধ্রে অনুসন্ধান করিয়াও সেই সংবাদের জন্য অনুমাত্র কো[illegible]হার [illegible]সন্ধান সে পাইল না।

বলিল, বো[illegible]জ ভেট নেহি হোগা।

বেয়ারা চলিয়া গেল।

পাছে আবার ফিরিয়া আসে, আবার বিরক্ত করে, ইন্দু জানালা ছাড়িয়া

উঠিয়া আসিয়া প্রবেশ-দ্বারের পর্দাটা টানিয়া দিয়া আবার সেইখানে গিয়া বসিল। পর্দা ঠেলিয়া না ডাকিলে, কেহই ঢুকিবে না জানিয়া সে কতকটা আশ্বস্তি বোধ করিল।

দিগন্ত-আচ্ছাদিত গাঢ় অন্ধকারের পানে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার বাল্য, কৈশোর, যৌবনকালের রমণীয় চিত্রগুলি একটির পর একটি মনের চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। প্রত্যেকটি সুন্দর, কিন্তু প্রত্যেকটি চোখে জল আনিয়া দেয়। যে চিন্তা সুখের, তাহাই আবার দুঃখের হয় কেন? যে দৃশ্য দেখিতে এত সুন্দর লাগিতেছে, তাহাই আবার চোখের জলে ভাসায় কেন? না, সে চোখের জল ফেলিবে না। কেনই বা ফেলিবে?

তাহার মাকে সে সুখী করিয়াছে এবং সুখী হইবে বলিয়াই জীবনের সঙ্গী সে নিজে বাছিয়া লইয়াছে। মা এই নির্ব্বাচনে সুখী, সুতরাং তাঁহার দায় ও দেনা সে শোধ করিয়াছে তাঁহার মনোমত কার্য্য করিয়া; আর, নিজে? কি যায় আসে! একটা নারী-জীবন বৈ ত' নয়! এমন কত শত শত নারীজীবনই ত বৃথায় যাইতেছে, বিফলে যাইতেছে, একটা বাড়িলে বা একটা কমিলে কাহার কি আসে যায়!

কিন্তু তবু কেন, মন এমন সব তত্ত্ব-কথায় সান্ত্বনা পায় না! কেন মা'র উপর তীব্র কঠোর অভিমানে মন ভরিয়া যায়, না [illegible] করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হয়! কিন্তু কাঁদিবারও উপায় নাই; কাঁ[illegible] ঝাঁ[illegible]র ভার লাঘব করিবে সে উপায়ও যে তাহার নাই! তাহার [illegible]খ তাহা অন্তরের ভিতরে বাসা বাঁধিয়া উই-পোকার মত ভিতরটা কুরিয়া কুরিয়া খাইলেও তাহার কাঁদিবার উপায় নাই। যে দুঃসহ বেদনায় তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া

পড়িতেছে, কেই বা তাহার পরিমাপ বুঝিবে, আর কেই বা তাহার দুঃখে সান্ত্বনা দিবে ?

আলিপুরে প্রণয়ের বিদায়-ভোজ হইতে ফিরিয়া সে যদি না নিজেই মা'য়ের কথায় সায় দিয়া ফেলিত, এ দুর্ঘটনা কখনই ঘটিতে পারিত না। তাহার ইচ্ছা বুঝিয়াই পিতা নীরব ছিলেন। বিবাহের দিন বাবাকে কোথায়ও দেখা যায় নাই। কেন, তাহা সবাই না জানুক ইন্দু জানিত। স্নেহময় পিতার নিকট স্বেচ্ছাকৃত ভুলের জন্য মাপ চাহিয়া লইবার অবকাশটুকুও হইল না!

আজ একটিবার যদি তার স্নেহময় পিতার দেখা পাইত! তিনিও যে তাহারই মত সুখী নহেন, মনে মনে সে তাহা বুঝে ; তাই আজ সকল দুঃখ অবসানের সময় একবার যদি তাঁহার দেখা পাইত! একবার তাঁহার গলা ধরিয়া কাঁদিতে পাইত! তাহাতেই বা কি সান্ত্বনা সে পাইত ?— কিছু না, কিছু না! পৃথিবীতে তাহার কোন সান্ত্বনা নাই।

তবুও, তবুও ইচ্ছা করে একবার প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া লইতে। হিন্দুর মেয়ের আজন্মের সংস্কারের উচ্চ প্রাচীর ভেদ করিয়া একবার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করে। ভারতের নারীত্বের মহোচ্চ আদর্শ যদি ক্ষুণ্ণ হয়, হোক, তবু একবার স্বামী ছাড়া আর এক জনের উদ্দেশে প্রাণের অফুরন্ত কান্না [illegible]র অসংযত রশ্মিগুলিকে ছুটাইয়া দিতে সাধ হয়! আজ শুধু তাহা[illegible]শে বলিতে ইচ্ছা করে, যে-ভুলের প্রাসাদ রচিত হইয়াছিল, তাহা [illegible] আরম্ভ করিয়াছে, নিঃশেষ হইতে আর বড় দেরী নাই।

বাহিরে বৃষ্টির তেজ বৃদ্ধি পাইতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে গোমতীর গর্জ্জনও

ঝাড়িতেছিল। মনে হইল, জলের ঢেউগুলি জানালায় আসিয়া আছাড় খাইতেছে। ইন্দু উঠিয়া দাঁড়াইয়া জানালায় মুখ রাখিয়া দেখিল, জল জানালার খুব কাছেই উঠিয়াছে, আর একটু পরেই ঘরেও জল ঢুকিয়া পড়িবে।

তারপর, সে উল্লাস অথবা অবসাদ, হর্ষ কিংবা বিষাদ, আনন্দ না আশঙ্কা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া ইন্দু একবার সমস্ত ঘরটা দেখিয়া লইয়া যেখানে বসিয়াছিল, আবার সেইখানেই আসিয়া বসিল।

মুহূর্ত্তের জন্য মনে হইল, ঐ বন্যার জল যদি ঘরে আসিয়া ঢোকে, যদি সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে?

তাহা হইলে, কিছুক্ষণ পূর্ব্বদৃষ্ট দৃশ্যটি তাহার মনে ভাসিয়া উঠিল, ভাবিল, মন্দ কি! সেও স্রোতে ভাসিয়া চলিবে। কোথায়, কত দূরে, কে জানে! কোন দিন কূল পাইবে কি না তাই বা কে জানে! না-ও যদি পায়, তাহাতেই বা কি?

কেবল একবার যদি···না, চিন্তার উদয় হইবামাত্র সে তাহা মনের গোপন কোণেই দমন করিয়া ফেলিল। যাহা অসম্ভব, একান্তই অসম্ভব, তাহাকে মনোমধ্যে স্থান দিয়া ভাঙ্গা-গড়া করার মত বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে? মানুষের কত সাধ, কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, কত বাসনাই ত' হৃদয়মধ্যে উত্থিত হইয়া জলবুদ্বুদের মত বিলীন হইয়া যায়, তাহার জীবনের এই শেষ কামনাটিরও না হয় সেই ভাগ্যই ঘটিল, তাহাতেই বা কি! এই কামনা—যাহাকে সে স্পষ্ট করিয়া চিন্তা করিতে পারিতেছে না, যে সুপ্রিয় বাসনাটির কণ্ঠরোধ করিয়া হত্যা করিবার প্রবল আগ্রহ সত্ত্বেও মমতাবশে তাহাকে বিনষ্ট করিতে পারিতেছে না, মাতার বক্ষঃলগ্ন ক্ষুদ্র

শিশুটির মত জড়াইয়া রহিয়াছে, মরণকালে যদি সেটি অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অতি সন্তর্পণে বসতি করিয়াই থাকে, এবং তাহার সহিত সহমরণেই যায়, তাহা হইলে কোন্ প্রাণেই বা ইন্দু তাহাকে নিরাশ করিতে পারে? করিবেই বা কি করিয়া? না, সে তাহা করিবে না। কোন্ দেশের কোন্ এক প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী নারী এক কালভুজঙ্গকে বুকের উপর ধরিয়া হাসিমুখে মৃত্যু বরণ করিয়াছিল, সেও সেই অতিপ্রিয় অতি অবাধ্য বাসনাটিকে বুকের ভিতরে পুষিয়াই চলিয়া যাইবে এবং অন্তিমকালে মৃত্যুদাতার নিকট এই কামনাই করিবে, তাহার জীবনের সঙ্গে যেন সেই বাসনারও অবসান হয়, সেই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহাকে যেন সেই বিষধর বাসনার সুখসঙ্গচ্যুত হইতে না হয়। বিধাতার নিকট ইহাই তাহার অন্তিম প্রার্থনা।

বিধাতা কে, কেমন তাঁহার রূপ, কিছুই সে জানে না, কাহারও করুণ প্রার্থনায় তিনি কর্ণপাত করেন কি না এবং মানুষের শেষ অভিলাষ পূর্ণ হয় কি না তাহাও সে জানে না; কিন্তু সেই অজানা অদেখা বিধাতার কাছে যদি তাহার কিছু বলিবার থাকে, কিছু চাহিবার থাকে, তাহা ঐ! তিনি কি তাহার সে কামনা পূর্ণ করিবেন না?

লোকে বলে, ভগবান্! ভগবান্ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই রক্ষা ও পালন করেন এবং সংহার-কর্ত্তা তিনিই। যিনি সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তাঁহার কর্ণে নারীর ক্ষুদ্র কামনাটি কি পৌঁছিবে না? লোকে বলে, তাঁহাকে যদি কেহ মনঃপ্রাণ ভরিয়া ডাকিতে পারে, কেহ যদি অবিচলিত বিশ্বাসে তাহার নিকট কোন প্রার্থনা করে, তিনি তাহা অপূর্ণ রাখিতে পারেন না, সেই জন্যই লোকে বলে, ভক্তের ভগবান, ভক্তবৎসল ভগবান্!

জানালা দিয়া দেখা যাইতেছে; প্রচণ্ড জলরাশি ভীমগর্জ্জনে জানালার চৌকাঠ স্পর্শ করিয়া ছুটিতেছে, প্রাচীরগাত্রে আঘাতোৎক্ষিপ্ত জল-কণা-সমূহ যেন অঙ্গস্পৃষ্টও হইতেছে, বাড়ীটা যেন থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, এই সময়,—ইহার পরে হয় ত সে সময় আর আসিবে না, এই সময় কেহ যদি তাহাকে বলিয়া দিত, কেমন করিয়া তাঁহাকে ডাকিতে হয়, কোন্ ভাষায় তাঁহার নিকট আবেদন জানাইতে হয়, কেমন করিয়া অটল বিশ্বাসভরে যাচ্ঞা করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার কোন দুঃখ থাকিত না। কিন্তু কে এমন আছে, কে বলিয়া দিবে, কে তাহাকে শিখাইবে? তাহার নিকট দূরে কে এমন বন্ধু আছে যে শেষ দিনে শেষ মন্ত্রটিতে তাহাকে দীক্ষা দিবে? ঐ উত্তুঙ্গ উন্মত্ত জলরাশি আর তাহারই ভীম নির্ঘোষ ছাড়া আর ত কাহাকেও সে দেখিতে পাইতেছে না; তার কিছুই সে পাইতেছে না। তবে কি ঐ ক্ষিপ্ত বারিস্রোতই তাহাকে বন্ধুর আলিঙ্গন দিতে আসিতেছে?

আসুক, প্লাবনের রূপ ধরিয়া মৃত্যু তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করুক। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার সময় সে শুধু বলিয়া যাইবে, যেখানে, যত দূরে যে অবস্থাতেই থাক না কেন, তাহার চিরদিনের, চিরজীবনের সঙ্গী যেন জানিতে পারে, মৃত্যুকালে ইন্দু তাহাকে চাহিতে চাহিতেই শেষ নিশ্বাসটি ফেলিয়াছে। ভগবান, কখন কোন পাপ সে করে নাই, কাহারও অনিষ্ট করে নাই, স্বেচ্ছায় কাহারও মনঃকষ্টের কারণ হয় নাই, শেষ কালের এই বাসনার ফলে যদি তাহার অনন্ত নরকও হয়, অম্লান বদনে সে তাহা সহ্য করিবে, শুধু তুমি, ভগবান্, শুধু তুমি, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বান্তর্যামী, শুধু তুমি তাহাকে ক্ষমা করিও। জীবনের শেষ দিন, শেষ মুহূর্ত্ত বলিয়াই প্রাণের

কামনা সে নিজের কাছে ব্যক্ত করিতে পারিয়াছে, অন্য কোন সময় হইলে নিজের কাছেও সে তাহা বলিতে পারিত না।

পর্দ্দার ভিতর হইতে শব্দ আসিল—মেম সাব!

ঘৃণায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ রি-রি করিয়া উঠিল, ইন্দু সাড়া দিল না।

পুনরায় আহ্বান আসিল, মায়িজি!

ইন্দু পর্দ্দার এ পাশে দাঁড়াইয়া বলিল, কেয়া মাংতা?

—হুজুর, বড়া সাব আয়া!

—ম্যাজিষ্ট্রেট সাব?

—জী!

মনে হইল সাহেব প্রণয়ের সংবাদ দিতে আসিয়াছেন, সে সংবাদের জন্য তাহার কৌতুহল নাই বলিয়া বিদায় করিয়া দেওয়া যাক; কিন্তু কি ভাবিয়া বলিল, হাম আভি আঁতে হেঁ!

সাহেব বলিলেন, আপনাকে এই মুহূর্ত্তে এই বাড়ী পরিত্যাগ করিতে হইবে।

—কেন?

সাহেব বিস্ময়াতিশয্যে দশ সেকেণ্ড কথা বলিতেও পারিলেন না, তার পর বলিলেন, বাড়ীটির অবস্থা আপনি দেখেন নাই, বুঝি? আর পাঁচ ছয় ইঞ্চি জল বাড়িলেই—

তাঁহার বক্তব্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই ইন্দু বলিল, কথার মাঝে কথা বলিতেছি, মাপ করিবেন। দেখিয়াছি।

—তবে যে জিজ্ঞাসা করিলেন বাড়ী ছাড়িতে হইবে কেন?

—বাড়ী ছাড়িয়া যাইবার কোন কারণ দেখি না।

—আপনি আমাকে অবাক করিলেন! এ বাড়ী কাল সকাল পর্য্যন্ত থাকিবে বলিয়া আমার মনে হয় না।

—নাই বা থাকিল!

সাহেব ক্ষণকাল নীরবভাবে বিস্ময়ে এই দুঃসাহসিনী নারীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন; পরে মৃদু হাসিয়া শুষ্ককণ্ঠে কহিলেন, আপনার স্বামীকে এই দুর্য্যোগে দূরে পাঠাইতে হইয়াছে, আপনি কি সেই জন্য আমার উপরে ক্ষুব্ধ হইয়াছেন? আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন, কোন সরকারী কর্ম্মচারীই সদরে নাই, আমি ছাড়া! আমিও থাকিতাম না, কেবল সহরের গুরুতর দায়িত্ব স্কন্ধে লইয়াই আমাকে থাকিতে হইয়াছে। জানি না, এত বড় সহর আর তার অগণিত অধিবাসীদিগকে রক্ষা করা সম্ভব হইবে কি না—একমাত্র ভগবানই জানেন, কি হইবে, কিন্তু আমি ত' কোন উপায়ই দেখিতেছি না।

ইন্দু বলিল, আপনি আমার বাচালতা ক্ষমা করিবেন। আমাকে আপনি কোথায় যাইতে বলিতেছেন?

—আমার বাসায়। সৌভাগ্যক্রমে আমার বাসাটি উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত। আজিকার বিষম রাত্রিটা সেখানে নিরাপদে থাকিতে পারিবেন, তার পর কাল যাহা হয় ব্যবস্থা করা যাইবে। বলিয়া সাহেব মাথা নীচু করিয়া আবার বলিলেন, আমার স্ত্রী ভারতবর্ষে নাই, কিছুদিন হইল স্বগৃহে গিয়াছেন; তিনি এখানে থাকিলে অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই আপনাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেন। আমি নানা কাজের ভিড়ে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম, তাই এতক্ষণ পর্য্যন্ত সময় করিয়া আসিতে পারি নাই বলিয়াই দুঃখিত।

—ধন্যবাদ! আপনার দুঃখিত হইবার কারণ নাই; কারণ, আগে আসিলেও আমি যাইতাম না, এখনও—

—সে কি, আপনি যাইবেন না?

—না!

—কেন?

—আপনি সজ্জন ও দয়ালু বলিয়াই কথাগু… বলিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া দোষ লইবেন না। সাহেব, আপনি কি শহরের সমস্ত নারীকে আপনার বাসায় লইয়া যাইতে পারিবেন?

—তাহা কি সম্ভব হইতে পারে?—অসম্ভব

—তাহা আমিও জানি। যে ব্যবস্থা সকলের জন্য করিতে পারিবেন না, একজনের জন্য তাহা না করাই ভাল।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বলিলেন, তাহারা পাড়াগেঁয়ে লোক, পূর্ববঙ্গের অধিবাসী, এরূপ বিপদ্ তাহাদের অপরিচিত নয়, বরং তাহারা সম্পূর্ণ …ভ্যস্ত; তাহারা এরূপ বিপদের সঙ্গে লড়াই করিতে জানে।

—আমিও জানি।

—এ আপনি কি বলিতেছেন? আমি ত আপনাকে ছাড়িয়া যাইব না।

—আবার ধন্যবাদ। কিন্তু আমার যাহাই হউক, এইখানেই আমি থাকিব।

—তার মানে—নিশ্চিত মৃত্যু।

ইন্দু হাসিয়া বলিল, নিশ্চিত … না … যায় না. জল না বাড়িতেও …র; কমিতেও পারে।

…জিস্ট্রেট বলিলেন … আশা। পাহাড় হইতে বিপুল বেগে চল… মি…ছে, সংবাদ পাইয়াছি। বৃষ্টির প্রখরতাও দেখিতেছেন, জল কমিবার

আশা নাই। জল বাড়িবে এবং রাত্রির মধ্যে এই গৃহেরও পতন হইবে আপনি চলিয়া আসুন।

ইন্দু করযোড়ে বলিল, আমাকে মাপ করুন।

সাহেব দেখিলেন, মহা বিপদ্‌। এই অল্পবয়স্কা, ক্ষীণকায়া নারী কথা-বলার ও চলনীর ভঙ্গীতে সাহেব ইহাও বুঝিতেছিলেন, ইহার ক নড় চড় হইবার নয়। ইহার কণ্ঠ মৃদু কিন্তু দৃঢ়তাব্যঞ্জক; দৃষ্টি স অথচ তেজঃপূর্ণ। স্বভাবকোমলা বঙ্গনারীর মধ্যে যাহা কখনও দেখা যায় সেই তেজঃপূর্ণ নির্ভীকতা, সাহেব তাহা দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলেন; মনে ম প্রশংসা করিলেন। তার পর, বলিলে



কোন বাঙ্গালী পরিবারের ম

রূপ দারুণ বিপদে ফেলিবেন

গ্রাম সকাতরে আজ সন্ধ্যার দিকে কতগুলি গৃ

যে পতন হইয়াছে, ভাসিয়া গিয়াছে, এ

পর্যন্ত সংখ্যা গণনা



ইন্দু মৃদু ন নাই ত?

সাহেব কাতর গিয়া অনেক

মৃত্যুমুখে পতিত হই ঠের নাম জানেন

তাহারা সেবাকার্য ক কয়েক জনের

সংবাদই পাওয়া যাই ল সন্ন্যাসী

আমার এক বিশিষ্ট করেন, তিনি